বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ

২০৩/৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৬৯ সাল

প্রকাশক :
শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
২০৩।৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিক চন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট অঙ্কণ :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

মূল্য : ছয় টাকা।

প রি শো ধ

বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

(দ্বারভাঙ্গা)

উৎসর্গ

স্নেহের রাধারমণ ও ছবির হাতে,
আশীর্বাদ সহ।

"মেজোকাকা"

[এক]

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও যোগ দিতে এ'টেল মাটির রাস্তা আরও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল। জীপগাড়ির চাকা ষ্টীয়ারিং মানছে না, পিছলে এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছে। ব্রেক কষেও ফল নেই, ঝড়ের ধাক্কায় কয়েক ঝোঁক ঠেলে-ঠেলে নিয়ে গেল গাড়ি। এটা বাড়বে, ঝড়-বৃষ্টি যেভাবে বেড়েই চলেছে, এবং তাহলেই দুর্ঘটনা অনিবার্য; খানা-খন্দর, গাছের গু'ড়ি—কোথায়, কিসের ওপর যে ছিটকে পড়বে গাড়ি কিছুই ঠিক নেই। অন্ধকার রাত, হেডলাইট থেকেও না থাকার সমান।

তাড়াতাড়ি ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলতে হবে। ফেললও করে প্রশান্ত, গাড়িটাকে তার অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়তে হবে। ব্রেক একটু আলগা করে ঝড়ের সঙ্গে রফা করতে যাচ্ছিল, আবার কষে দিয়ে ক্লাচ টিপে গাড়ি একেবারে থামিয়ে ফেলে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে, ওর ত্বরিত নির্দেশ মতো গোপেশ আর্দালিও উঠে পড়েছে, এমন সময় অনিবার্যটা যেন এসেই পড়ল। ঝড়ের একটা প্রবলতর ধাক্কায় জীপটা প্রায় ডিগবাজি খাওয়ার মতো হয়ে, একটু সামলে নিয়েই, একটা ঢালু পথ বেয়ে পিছলে ছুটল। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত। গোপেশকে লাফিয়ে পড়তে বলে নিজেও দেবে লাফ, এমন সময় জীপটা হঠাৎ একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু কাৎ হয়ে। অন্য সময় যেটা ছিল বিপদ সেটা সম্পদে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার মাঝখানেই, একটু ডানদিক ঘেঁসে একটা পাঁকে-ভর্তি খানা। যাওয়ার সময় এটার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছিল, নোট করেও নিয়েছিল প্রশান্ত, জেলাবোর্ডকে চিঠি দেবে, এখন এটাই বাঁচিয়েছে, মোটরের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি গিলে ফেলেছে। প্রায় মেসিনের ওপর পর্যন্ত। কিন্তু সে পরের ভাবনা পরে।

আপাততঃ একটা আশ্রয় দরকার। পকেট থেকে টর্চ বের করে চারিদিকে আলো ফেলে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; বৃষ্টি ভেদ করে চার-পাঁচ হাতের ওদিকে নজর যায় না। অগত্যা জীপই আশ্রয়। তাও টেঁকল না। একটা দমকা হাওয়ায় ওপরের আচ্ছাদনটা ছিঁড়ে খানিকটা উড়িয়েও নিয়ে গেল। ঠিক এই সময় কড়া একটা বিদ্যুতের ঝলকে কতকটা এই ধরনের একটা দৃশ্য গেল চোখে পড়ে। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে বাঁদিকে একটা ঘরের আধখানা চাল তুমড়ে অপর আধখানার ওপর কর্কশ আওয়াজ তুলে উলটে পড়ল। বিদ্যুতালোকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের আবছা দেখা; কিন্তু একটা বাড়ি যে রয়েছে কাছে এটুকু আবিষ্কার হোল। প্রায় কলম্বসের আবিষ্কারের মতোই; সব জিনিসের মূল্যই তো আপেক্ষিক, অবস্থা আর পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

বাড়ি মানেই আশ্রয়।... কিন্তু যার চালা উড়ে মাথার ওপর পড়েছে?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যেও এক ঝলক বিদ্যুৎ—কোনও অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে তো বাড়িটাতে! এক মুহূর্তে ঝড়, বৃষ্টি, নিজেরা, জীপ, সব যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল। সবই তো আপেক্ষিক। মনে পড়ে গেল জীপের মধ্যে একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আছে। "গোপা, নেমে পড়্" বলে সেটা তুলে নিয়ে নিজেও লাফিয়ে পড়ল বাঁ-দিকে। পড়ল রাস্তার ওপরেই। পাঁকের প্রায় সমস্তটাই ডানদিকে। একটু পিছলে যাওয়া, কি, জামা-কাপড় ভিজে মণখানেক ওজন বেড়ে যাওয়া—ওসব আর ধর্তব্যের মধ্যে নেই।

টর্চের হাত পাঁচেকের আলোর ঝাপসা রেখা সামনে করে চলল দু'জনে। গোপেশ একবার আছাড়ই খেল ছোটখাট গোছের। একবার টর্চটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে প্রশান্ত চলতে-চলতেই বলল—"উঠে আয় ঝট করে।"

একটা পায়ে-হাঁটা, শরু পথ রাস্তাটার ওপর উঠে এসেছে।

লাইট ধরে নামতে গিয়ে নিজেও আছাড় খেতে-খেতে কোন রকমে নিল সামলে। পথটা প্রায় বিশ-পঁচিশ গজ রাংচিতের একটা বেড়ার পাশে-পাশে ভেতরের দিকে চলে গেছে। ঘাসে ঢাকা, লোকের চলাচল কম নিশ্চয়। সুবিধা হোল, আর এত পেছল নয়, পা চালিয়ে দিল প্রশান্ত।

ছোট্ট বাড়ি, মনে হোল ওই একখানা ঘর নিয়েই, যার আধখানা চাল গেছে উল্টে; হয়তো এতক্ষণ উড়েই গিয়ে থাকবে, ঝড়ের গর্জন আর বৃষ্টির ডাকে বোঝবার তো জো নেই, কোথায় কি হোচ্ছে। হয়তো লোকও নেই; আলোর তো কোনও নিশানাই নেই এদিকটায়। কিন্তু তালা দেওয়া নয়, ভেতর থেকে বন্ধ। মানুষ থাকার লক্ষণ বলেই মনে হয় শেষ পর্যন্ত, অবশ্য থাকেই তো কি রকম আছে, কে বলবে?

ঘরের সংলগ্ন একফালি একটা বারান্দা। ঘরের একটা অংশ দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। দুটো সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে তার ওপর গিয়ে উঠেছে দুজনে; তারও আধখানা চাল নেই। হঠাৎ বড় নাভার্স হোয়ে উঠেছে, উগ্ররকম একটা কিছু দেখবার মুখে বলেই বোধহয়। না ডেকে আগে কড়া নাড়াই দিল, জোরে, আরও জোরে। ডাকল—"কেউ আছেন ভেতরে?" গোপেশকে বলল—"দেখ্ তো, অন্য কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায় কিনা?"

গোপেশ চলে গেলে বন্ধ দরজার মাঝখানে মুখ দিয়ে আবার ডাকল—"কেউ আছেন বাড়িতে!" ঝড়-বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ডাকল, তারপর একটা কান জোড়ের মুখে ধরল চেপে।

"কে?"—হাওয়ায় দোল খেয়ে একটা আওয়াজ ভেসে এল। এঘর থেকে নয়। আরও ওদিকে কোথা থেকে। জোড়টুকুতে মুখ লাগিয়ে প্রশান্ত বলল—"কে আছেন একবার দোরটা খুলুন।"

ও একরকম শেষ করার আগেই এই ঘরের সংলগ্ন পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হোল। একটু আলোও এসে পড়ল জোড়ের মুখে, সঙ্গে-সঙ্গে খড়ম খট-খট করে একটি লোক এগিয়ে

আসার শব্দ। তারপরেই হঠাৎ একটা বিরতি। ওপর থেকে চাবুকের মতো বৃষ্টি এসে পড়ছে। প্রশান্ত দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল —"খুলুন না দোরটা একটু, কে আছেন।"

হুড়কো টেনে দিতে পাল্লা দুটো হাওয়ার দমকে পাশে আছড়ে পড়ছিল, লোকটি দুহাতে ধরে নিয়ে আধখোলা রেখেই প্রশ্ন করলেন —"কি দরকার?"

অদ্ভুত প্রশ্ন ঝড়ের রাতের অতিথিকে। চেহারাটাও একটু অদ্ভুতই। এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় বড়-বড় উস্ক-খুস্ক চুল। সবচেয়ে অদ্ভুত চোখের দৃষ্টিটা, কোটরের ভেতর থেকে যেন তীব্র কি একটায় জ্বলছে—আক্রোশ কিংবা…

থতমত খেয়ে গিয়ে আন্দাজ করার মুখেই প্রশান্তর খেয়াল হোল সদ্য শোকও তো হতে পারে—যেমন আশঙ্কাই করেছে সে। উত্তর করল—"না-ইয়ে—জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কোন রকম অ্যাকসিডেণ্ট—মানে, দুর্ঘটনা হয়নি তো এই ঝড়ে?"

"কোথা থেকে এসেছেন জিজ্ঞেস করতে—ঝড় মাথায় করে?"

একটু যেন উত্তরের সময় দিয়ে, "না, অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি কিছু", বলে আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন দরজা, পেছন থেকে একটা আওয়াজ এল—"বাবা"।"

দোর চেপেই দাঁড়িয়েছিলেন লোকটি, ঘুরে দেখতে যে একটু ফাঁক পাওয়া গেল, তার মধ্যে দিয়ে প্রশান্ত দেখল, ও-ঘরের দরজায় একটি মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে, লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় ছায়ার মতোই দেখাচ্ছে। এগিয়েই এল মেয়েটি, বাপের শরীরের আড়ালে-আড়ালে নিজের কাঁধ-পিঠের কাপড় টানতে টানতে। পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে নরম করে বলল—"আসতে দাও ওঁকে, ভিজছেন।"

লোকটি ঘুরে চাইলেন প্রশান্তর দিকে, সামান্য একটু পরিবর্তন দৃষ্টিতে। কপাটের একটা পাল্লা ছেড়ে দিয়ে বললেন—"আসুন।"

ভেতরে পা দিয়ে প্রশান্ত বলল—"আর একজন আছে।"

"আরও একজন!"—বেশ একটু বিরক্তভাবেই মেয়েটির দিকে চেয়ে অনুযোগের স্বরে বললেন লোকটি।

গোপেশ এসে গেছে। মেয়েটি কণ্ঠস্বর আরও নরম করে বলল—"আসুন; কী রকম দুর্যোগ দেখছ না?"

নিষ্প্রয়োজন হলেও আতিথ্যের গ্লানিটুকু যেন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করল প্রশান্তকে—"আর কেউ নেই তো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশ্নের মধ্যেই লোকটি দোর বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছেন, মেয়েটি সেইভাবেই বাপের কতকটা আড়াল থেকেই সামনে হাত দেখিয়ে প্রশান্তকে বলল—"চলুন ঘরে।"

[দুই]

বাপের একটু আড়ালে আড়ালে থাকার কারণটা খেয়ালও করেনি প্রশান্ত, এ ঘরে আসতে সেটা আপনা হতেই ওর নজরে এসে পড়ল।

ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর পাতা, একপাশে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রাখা খানকতক বই। তারই ওপর বসতে বলে, হাতের টিপে একটা ইশারা করে বাপকে নিয়ে ঘরের আর একটা দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি, বেশি জড়সড় হয়ে যাওয়ার জন্যই প্রশান্তর নজরটা গেল পড়ে। শাড়িটা মলিন তো বটেই, কয়েক জায়গায় এমনভাবে ছেঁড়া-সেলাই-করা যে, লণ্ঠনের স্বল্প আলোকে স্পষ্ট চোখে পড়ে যায়। তাই থেকেই এতক্ষণে ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য গেল প্রশান্তর। ঐ রকমই উৎকট দারিদ্র্যের ছাপ চারিদিকে। ও ঘরের মতো এটাও ওপরে গোলপাতায় ছাওয়া। ইটের দেয়াল, তবে তার পলস্তারা চারিদিকেই গলে-গলে পড়ছে। মেঝেটাও সিমেন্টের, তবে এত ভাঙাচোরা যে মাদুর পাতার জায়গা যেন ওইটুকুই আছে ঘরের

মধ্যে। দুটি ছোট ছোট জানলা, দুটিরই একখানা করে পাল্লা নেই, তার জায়গায় ক্যানেস্তারা কেটে ফ্রেমে কাঁটি দিয়ে বসানো। তার একটাতে জং ধরে মাঝখানে কয়েকটা ফুটো হয়ে গিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। খুব তোড়ের মুখে শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে। আসবাবের মধ্যে ঘরের দুদিকে দুখানা চৌকি। একখানার একটা পায়া ভাঙ্গা, একখানির তিনটে; ইটের থাক পায়ার কাজ করছে। দুটোরই একধারে একটা করে বিছানা গোটানো। ঘরের এক কোণে দুখানা পুরোনা ট্রাঙ্ক, একটার ওপর একটা করে রাখা। নীচেরটায় একটা শাড়ি-ছেঁড়া নেকড়ার ঢাকনা। উল্টো কোণে একটা মাঝারি সাইজের আলমারি। কোণাকুণি করে দেওয়ালে খাটানো দড়ির আলনায় একটা ধুতি, একখানা শাড়ি আর একখানা কামিজ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখছিল প্রশান্ত, ও-অবস্থায় মাদুরে বসার প্রশ্নই আসে না। দেখা শেষ হয়ে যায় এক নজরেই, তবে দৃষ্টি যায় আটকে আটকে। এই উৎকট দারিদ্র্যের চিত্রটির মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্য এনে দিয়েছে দুটি জিনিসে—একটি খুব দামী ফ্রেমে বাঁধানো বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, ঝড়ের জন্যই নামিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা, আর প্রায় এক ফুটেরও ওপর ব্রোঞ্জের একখানি আবক্ষ প্রতিমূর্তি—রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হয়।

ওর দেখার মধ্যেই লোকটি একলাই ঘরে একবার প্রবেশ করলেন। একবার প্রশান্তর ওপর সেই বিরূপ দৃষ্টি হেনে নীচেকার ট্রাঙ্কটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন।

শুধু দারিদ্র্য নয়, বিড়ম্বিত দারিদ্র্যের একটা অ্যাপীল যেন চারিদিকে—তাইতে জানালার ছিদ্রপথে হাওয়ার সেই শব্দটা যেন কান্নার মতো শোনাচ্ছে। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হঠাৎ আরও উগ্র হয়ে উঠেছে মনে হয়। সেটা হয়ত এই জন্য যে, মনটা এইদিকে আটকে ছিল, হঠাৎ একটা সংকল্পে আবার বাইরে গিয়ে পড়েছে—বেরিয়েই যাবে প্রশান্ত একটা ছুতো করে—যত বড়ই দুর্যোগ হোক না কেন।

নিরুপায়ভাবে, না জেনে এসে পড়েছে, কিন্তু এ লজ্জা আর বাড়ানো চলবে না। অজ্ঞাতেই আসা, কিন্তু আর থাকলে সেটা হবে বড় নিষ্ঠুর, তার যেন ক্ষমা নেই।

একটা অজুহাত মনে মনে গড়ে নিচ্ছিল, এ অবস্থায় সহজও তো নয়, দুজনে এসে আবার প্রবেশ করল। মেয়েটির পরণে এবার একটা ডুরে শাড়ি, একটু বেশি ভাল যেন, তাইতে মনে হয় তোলা শাড়িই, পালে-পার্বনে হয়তো ঐ একখানিই আছে। বলল—"বাবা তুমি কামিজটা পরে নেবে না? বাদ্‌লে হাওয়া।"

—এ যেন আরও করুণ, চাপা পড়ছে না জেনেও চাপা দেওয়ার চেষ্টা। খুবই একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। প্রশান্ত বুঝছে, কিন্তু কোনও উপায় হাতড়ে পাচ্ছে না। বুঝছে, ওর দিক থেকে অন্তত গোপেশ্বর আর্দালিকে এ ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু কোথায় সরাবে? অপর পক্ষে, মেয়েটি ঘরে না থাকলেও একরকম করে সামলে যায়, কিন্তু সেখানেও যেন মস্ত বড় একটা কিছু বাধা আছে। হয়তো আর ঘর নেই, কিংবা, যা বেশি সম্ভব, কোন কারণে বাপকে একা বসিয়ে রাখা সমীচীন মনে করছে না। একটু যেন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ রয়েছে এইরকমই মনে হয় তো।

অন্তত একটু কথাবার্তা আরম্ভ হলেও বাঁচা যায়। হঠাৎ যেন একেবারে ফুরিয়ে গিয়ে অস্বস্তিটা আরও বাড়িয়েছে। শেষে লোকটিই আরম্ভ করলেন। কামিজটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন—"তা আসছেন কোথা থেকে আপনারা?"

স্বরটা অনেক নরম এবার। প্রশান্ত একটা জায়গার নাম করল, বলল—"দেখুন না বিপদ, আসতে আসতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়ে মোটর বাধ সাধল। দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়, এইসময় বিদ্যুৎ চমকে উঠতে এই বাড়িটা চোখে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি শরণাপন্ন হোতে হোল আপনাদের।"

সুবিধা পেয়ে যেন অপরাধ স্খালন করে নেওয়ার ভাব। ক্ষণ

হয়েছে। মুখের ভাবটা আরও নরম হয়ে এসেছে লোকটির। প্রশান্তর নজরটা একবার মেয়েটির দিকেও গিয়ে পড়ল কি মনে হতে। এক দৃষ্টে বাপের দিকে চেয়ে কি যেন লক্ষ্য করছিল, যেন কতকটা সাহস পেয়েই বলল—"তা বাবা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না চৌকিটার ওপর। আপনারাও বসুন এসে।"

প্রশান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলল—"বিছানা রয়েছে তো·····"

"তা থাক না।" মেয়েটি বলল। বাপও যোগ দিল—"হ্যাঁ, আসুন, বিছানা তো একধারে রয়েছে।"

ওদের প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন দেখে, প্রশান্তকে এগিয়ে গিয়ে বসতেই হোল। গোপেশ্বর অবশ্য দাঁড়িয়েই রইল।

বেশ সহজ ভাবটা ফিরে আসছে একটু একটু করে। সেইজন্যই মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশান্ত বলল—"আপনিও বসুন না·········ঐ চৌকিটায়।"

মেয়েটি একবার পেছনটা দেখে নিয়ে তিন-ঠ্যাং-ভাঙ্গা চৌকিটার একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল। নিশ্চয় ঘরের সহজ ভাবটা ফিরে আসবার জন্যেই বলল—খুব অল্প একটু হেসেই বলল—"শরণাপন্ন! ····· যাক, বৃষ্টিটা তো মাথায় এসে পড়ছে না।"

বাপের দিকে চেয়ে বলল,—"কি বলো বাবা?"

"তা বৈকি। তবে······"

"বুঝেছি, তুমি যা বলতে চাও।"—আবার হঠাৎ সতর্ক হয়েই কথাটাকে যেন ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মেয়ে। একটা কথা যে আগেই আসা উচিত ছিল, ইচ্ছা করেই চাপা দিয়ে রেখেছে, সেটা যে ওর নিজের মন্তব্যেই একেবারে সামনে এসে পড়বে, ভাবতে পারেনি। দৃষ্টিতে রাজ্যের জড়তা এসে পড়লেও জোর করেই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"বাবা বলতে চান, আপনারা তো সেই ভিজে পোশাক-আশাকেই রয়েছেন······একখানা করে শুকনো কাপড় হোলেও হোত, কিন্তু বাবারগুলো সব ঐ ঘরে ছিল তো······."

"উড়ে গেছে ঝড়ে?" —বাপেরই প্রশ্ন; মুখটা আবার থমথমে

হয়ে গেছে। বেশ বিদ্রূপের টোন। মেয়ে বলল—"উড়ে যাবে কেন? ······তবে ভিজে গেল না? সেই কথাই বলছিলাম ওঁকে। নৈলে······"

প্রশান্ত বুঝলো মিথ্যা দিয়ে মানিয়ে নিতে প্রাণান্ত হচ্ছে মেয়ে। আলনায় একটা শুকনো ধুতি রয়েছে সেটা কিন্তু দেওয়া চলবে না—এ কথাটাও তো পড়ছে এসে। দুজনের কথাই হালকা করে দেওয়ার জন্য একটু হেসেই বলল—"কিন্তু উনি মিছেই সে কথা ভেবে অশান্তি পাচ্ছেন।"

বাপের পানে চেয়ে বলল—"কাপড় শুকনো থাকলেও তো আমাদের কাজে আসত না।"

"কেন?" —সহজ বিস্ময়েই প্রশ্ন করলেন বাপ।

"আমাদের তো বেশিক্ষণ বসলে চলবে না।"

"সে কি, এই দুর্যোগ!"

মেয়েও অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—"এই দুর্যোগে বাইরে থাকে? তবু তো যেমন হোক একখানা চাল মাথার ওপর আছে।"

একটা যে অজুহাত খুঁজছিল, হঠাৎ পেয়ে গেছে প্রশান্ত, মিথ্যার ওপর মিথ্যাই। তবে একটা দুর্লভ, সঙ্কটত্রাণ মিথ্যা। বেশ গুছিয়েও বলল প্রশান্ত—ওকে একটা বিশেষ সরকারি কাজের জন্য ফিরে যেতেই হবে। মোটরটা একটু বিগড়ে গেছে, বোধহয় ভেতরে জল ঢুকে। ড্রাইভার আর একটা লোক দেখছে, ও ভাবল, অবশ্য, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠে বাড়িটা নজরে পড়তেই ভাবল, তাহলে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে না থেকে ততক্ষণ···

বাপ মেয়ে দুজনেরই ভ্রূ কুঁচকে গেছে, প্রশ্ন জেগে উঠেছে দৃষ্টিতে। তাইতেই মনে পড়ে গেল প্রশান্তর, সামলে নিয়ে বলল—"ঠিক এই সময় চালাটাও গেল উড়ে। দোমনা হয়েই ভাবছিলাম—যাই কি না যাই, এখুনি হয়তো ঠিক হয়ে যাবে মোটর, আর দাঁড়ানো গেল না। কোনও দুর্ঘটনা হোয়ে গেল না তো ভেবে তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম।"

গোপেশের দিকে ঘুরে চেয়ে বলল—"যা তো, দেখে আয় তো

গোপা, এতক্ষণ হয়তো হয়েও গেছে ঠিক।" পেছন দিকেই দাঁড়িয়েছিল, চোখ টিপে দিতেও অসুবিধে হোল না।

গোপেশ্বর বেরিয়ে যেতে খানিকটা চুপচাপই গেল, সবাই নিজের নিজের চিন্তা নিয়ে রয়েছে। শেষে আবার বাপই বললেন—"তাই বা কেমন করে হয়, হ্যাঁ মা? না হয় ঠিকই হয়ে গেল মোটর, কিন্তু এই দুর্যোগ মাথায় করে যাবেন কি করে?

অনেকখানি কথা এবার। মেয়ে কিন্তু যেন বেশি অন্যমনস্ক ছিল। তা'ভিন্ন বাইরের গর্জন আর ছিদ্রপথের ঘোঙানিতে ছিঁড়ে ছিঁড়েও তো যাচ্ছে কথা, প্রশ্ন করল—"কি যেন বললে বাবা?"

কথাটা আবার বলতে হোল বাপকে। শোনার পরও একটু যেন অন্যমনস্কই রইল মেয়ে, তারপর বলল—"কিন্তু বিশেষ কাজ যে বলছেন উনি। বড় কোনও অফিসই তো।"

সুযোগ বুঝে ভদ্রভাবে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টাটুকু বড় যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর সঙ্কোচটা চাপা দেওয়ার জন্যই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"শুনলেন তো বাবা কি বলছেন? সত্যি না গেলেই নয়?"

গোপেশ আর্দালি বেশ চতুর। অবস্থাটা উপলব্ধি করেছে, এবং সঙ্কেতটাও বুঝতে পেরেছে। বোকার মতো মোটরের কাছে যায়নি, সময়ের আন্দাজ করে বারান্দা থেকেই ফিরে এল এবং খবরটাও দিল বুদ্ধিমানের মতোই, মনিবের যা দরকার। বলল—"মোটর ঠিক হোয়ে গেছে অনেকক্ষণ ড্রাইভার হর্ণও দিয়েছিল, নিশ্চয় ঝড়ের জন্যই শুনতে পাওয়া যায়নি।"

ঠিক এই সময় ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় জোর করাঘাত হোল এবং এরা কিছু ভেবে ওঠাবার আগেই চিৎকার ঠেলে এল—"মা-মণি! দোর খোল শীগিগ্‌র!"

"অনাথ-কাকা এসেছে!' —বলে মেয়ে উল্লসিত হোয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাপও উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

[তিন]

অনাথ-কাকা কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ধরে কাকা নয়। পুরোনো চাকর বা ঐ ধরনের যে একটা কিছু, দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কালো, নিম্নশ্রেণীর লোকের, পাকাটে, কর্মঠ শরীর, একটা ছোট কাপড় কোমর বেঁধে পরা, তার ওপর একটা গামছা জড়নো, গায়ে কিছু নেই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। মোটা, কাঁচাপাকা গোঁফ এক জোড়া।

ঘরে ঢুকেই ঝড়ের ওপর আওয়াজ তুলে বলতে বলতে আসছিল—"উঃ, কী তুজ্জোগ! রাস্তায় আবার এক কাণ্ড দেখে এলুম—'একটা মোটরগাড়ি পাঁকে গেঁথে গেছে—জনমানব কেউ কাছেপিঠে নেই—তাদেরও উড়িয়ে নে' গেল কি'......"

—এ ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চুপ ক'রে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি দরজা এঁটে দিচ্ছে, বাপকেই প্রশ্ন করল—"এনারা?"

বাপ বললেন—"এঁদেরই মোটর তো।"

ভ্রূ-তুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ততক্ষণে মেয়েও খিল এঁটে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু আপনার লোক এসে যে বলল কারা নাকি......"

"তাইতো!"—মাঝখানেই ওর কথাটা থামিয়ে দিয়ে প্রশান্ত গোপেশের দিকে ঘুরে চাইল। বলল—"তাহলে কি ওরা তুজনে আবার খুঁজতে বেরুল আমাদের?"

—মিথ্যেটুকু সঙ্গে সঙ্গে জুগিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার আবরণটা এতই স্বচ্ছ যে গোপেশের দিক থেকে মুখ ফেরানো শক্ত হ'য়ে পড়েছে।

"অবশ্য এক কাজ করা যায়......"

—মেয়েটিই বলছে। প্রশান্ত ঘুরে চাইতে বলল—"আপনারা গিয়ে যদি হর্ণটা বাজান তো যেখানেই থাকুক এসে পড়বে ওরা......"

ঠোঁটের কোথাও কি অতি-সূক্ষ্ম একটু হাসি লেগে আছে? মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাওয়ার মতো বলেই বোধহয় সন্দেহটুকু হোল প্রশান্তর, নিজের মনের যে কুণ্ঠা তার প্রতিচ্ছায়া; তবে এটা খুব স্পষ্ট যে অনাথের আওয়াজ পাওয়া পর্যন্ত মেয়েটি বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে। যেন এতক্ষণে অনেকটা সাহস পেয়েছে। যদি কৌতুক-বশেই এসে গিয়ে থাকে হাসিটুকু তো সেটা বেশ ভালোভাবেই সামলে নিয়ে বলল—"তা বলে কিন্তু এ অবস্থার মধ্যে আপনাদের বাইরে যাওয়া চলবে না, ওরা খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লেও না।"

বাপের দিকে চেয়ে সমর্থন চাইল—"কি বল বাবা?"

বাপের পরিবর্তনটা আরও বেশি। সেই যে উগ্র কী একটা ভেতর থেকে অপ্রসন্ন ভাব জাগিয়ে রেখেছিল। সেটা একেবারে গেছে। বেশ সহজভাবেই হেসে বললেন—"তা কি করে হয়?……. আমার কি মনে হয় জান স্বাতি? —ঘর-দোরের অবস্থা দেখে ওঁরা সরে পড়তে চাইছেন।"

অনাথের দিকে চেয়ে বললেন—"শুনছিস ওঁদের কথা?……"

"কথাটা কি?"—অনাথ প্রশ্ন করে চারজনের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল।

"মোটরটা এঁদেরই তো? বলছেন চলে যাবেন; এক্ষুণি।"

"হেতুটা?"—প্রশ্নটা কর্তাকেই করে প্রশান্তর দিকে চাইল।

"একটা বিশেষ কাজ ছিল।"—বেশ জড়িত কণ্ঠে উত্তরটা দিল প্রশান্ত।

"কাজ! এ-দুর্যোগে!" একটু স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল অনাথ। বলল—"বুঝলুম না হয় আছে কাজ, কিন্তু যাবেন কি করে? মটোর রাস্তার পাঁকে দেখে এলুম, গিয়ে দেখবেন রাস্তাটাই ডুবে গেছে।"

সেকেণ্ড কয়েক উত্তরের আশায় থেকে বলল—"না, যাওয়া হতে পারে না এ পেল্লয়ের মধ্যে।"

বেশ জোরের সঙ্গে কথাটা বলে ঘাড়টা গুঁজে গরগরই করছে

লাগল—"সে হবে না—গেরস্তর অকল্যেণ—একে তো কসুর নেই অকল্যেণের·······"

"কষ্ট হচ্ছে—ঘরের যা অবস্থা·······" কর্তা আরম্ভ করেছিলেন, ঘুরে চেয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল—"মানলুম হচ্ছে, বালাখানা নয় তো, কুঁড়ে ঘরই ; কিন্তু খোলা আকাশের চেয়ে তো ভালো?······আর, এ ছাপ্পর উড়বে না—নিকিয়ে নিন আমার কাছে—আমি পরশুই বাঁধন দিয়েছি—আমার হাতের বাঁধন। মোটকথা বেরুনো চলবে না এই ঝড়-বাদলে। ঐ তো বললুম—গেরস্তর অকল্যেণ। আমি তো অন্য কারুর কথা ভাবছিনে।" ওদিককার হুকুমে যেন শিলমোহর বসিয়ে স্বাতির দিকে ঘুরে বলল—"তা আমার একটা উপায় করো, কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে যে, যাহোক একখানা······"

স্বাতি কুণ্ঠিতভাবে বলল—"এসো, দেখি, ট্রাঙ্কটা ওঘরে রয়েছে।"

ওকে অনুসরণ ক'রে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল ; প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু এনারা যে······"

কর্তা জড়িত কণ্ঠে বললেন—"দেখছি তো, কিন্তু ওর উপায় আর কি করি ? চাল নেহাৎ মাথার ওপর একখানা আছে······"

"শুকনো খান দুই কিছু হলেই তো হয়।······এই তো একখানা······"

—আলনার দিকে এগুচ্ছিল, কর্তা অতিমাত্র কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন—"লজ্জার ওপর লজ্জা দিচ্ছিস অনাথ ?"

"ত্মাখো, বলেন লজ্জা দিচ্ছি। বাপ-মেয়ের কোমরে দিব্যি শুকনো কাপড়, অতিথি তারা ভিজে কালিয়ে রয়েছে—একটা অলুক্ষণ······বেশ, দাঁড়াও দেখছি·······চলো তো মা-মণি।"

দোর খুলে বেরিয়ে গেল দুজনে। ফিরতে একটু দেরি হোল, ফিরলও একলাই। তার কারণটা বোঝা যায়। দু-খানা শাড়ি নিয়ে এসেছে। ওদের সামনে গিয়ে এগিয়ে ধ'রে বলল—"পরতে হবে দুজনকে।"

হুজনেই হতচকিত হয়ে চেয়ে আছে। কর্তা খলিত কণ্ঠে বললেন—

"শাড়ি···পরবেন ওঁরা ?"

"বেটাছেলের পরবার নয় জানি। কিন্তু অসুখটা তো আর হতে পারবে না। রাতটা তো সহজ নয়। আর, চলবে ও এরকম বরাবর। কাঁপতেছেন তো দেখছি।"

কর্তা প্রশান্তর দিকে চেয়ে সেইভাবে বললেন—"কথাটা তো মিছে বলছে না। থামবার কোন লক্ষণও তো দেখছি না।"

লোকটাকে যেমন নাছোড়বান্দা গোছের দেখাচ্ছে, প্রশান্ত সভয়ে শাড়ি ছুটার দিকে চেয়েছিল, বলল—"কিছু ক্ষতি নেই তাতে; আমাদের ঘোরা-ফেরারই কাজ তো, বৃষ্টিতে ভেজা অব্যেস আছে।"

অনাথ হাত বাড়িয়ে এগিয়েই এল, বলল—"নেন্ তো; আছে ক্ষেতি। এমন পেল্লায়ে বিষ্টি হলোই বা ক'টা যে অব্যেস থাকবে? ······তুমিও নেও গো পেয়াদা সাহেব। তুমি আবার যেমন তাল-পাতার সেপাই দেখছি—অসুখ নিয়েই তো ঘোরাফেরা করতে হয়।"

"হ্যাঁ, তুই বরং নে গোপা" ভয়ে ভয়ে একটু হেসেই সায় দিল প্রশান্ত। বলল—"একটা পরে নে, একটা গায়ে জড়িয়ে নে।"

"তা কি পারে? মনিব রইল ভিজে—জামা-কাপড় · বেশ, শাড়ি পরতে নজ্জা তো আপনি বরং এক কাজ করো।"

এগিয়ে গিয়ে আলনা থেকে ধুতিটা টেনে নিয়ে বলল—"আমার এই ধুতিটা কোমরে জড়িয়ে নেও আপনি। রোসো, দোপাট করে লুঙ্গি ক'রে দেই। আনকোরা বেনারসী চেলি তো, আমার মতন গুচিয়ে পরতে পারবে না।"

"আর তুই?"—কর্তা প্রশ্ন করলেন।

"হচ্চে, হচ্চে"—বলে তাঁকে যেন একটু শাসনের ভঙ্গিতেই নিরস্ত করে ছেঁড়া ধুতিটা পাট করে প্রশান্তর হাতে তুলে দিল। ওর পরা শেষ হলে একখানা শাড়ি পাট করে নিজেই ওর গা, মাথা ভালো ক'রে মুছিয়ে দিল, তারপর সেটা গোপেশকে পরে নিতে বলে, গায়ে

জড়িয়ে নেওয়ার জন্যে শুকনো শাড়িটা প্রশান্তকে দিয়ে কর্তার দিকে চেয়ে বলল—"বললুম অত ক'রে বর্ষা-বাদলের দিন—তা আজকের হাটে দিলে তখন কিছু কিনে রাখতে? লবাব খাঞ্জাখাঁর মতন কোমরে শুকনো কাপড় জড়িয়ে তামুক টেনে শরীলের তোয়াজ করলে চলবে আমার এখন?"

উত্তরের জন্য প্রশ্ন নয়, প্রতীক্ষাও করল না; "মা-মণি একটু এসে বোস গো, আমি যাব আর এসব।...দোরটা দিয়ে দেও ভাই তাল-পাত্রো।" গোপেশের দিকে চেয়ে শেষের কথাটা ব'লে বেরিয়ে গেল।

ঢাকা দিতে গিয়ে দারিদ্র্য যেন আরও জোরের সঙ্গে ঢাকনা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাপকে একা বসিয়ে রাখার বিপদ জেনেও স্বাতির ঘরের ভেতর আসতে বিলম্বই হোল। এলও, সে যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর মানুষ যেটা এড়িয়ে যেতে চায় সেইটেই তো পায়ে এসে পড়ে, দরজা খুলতে দৃষ্টিটাও প্রথমে গিয়ে প্রশান্তর মুখের ওপরই পড়ল। চোর নয়, তবু যেন চোরের বাড়া সঙ্কোচ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল স্বাতি।

যাই বলুক, কাপড়-শাড়ির শুষ্ক স্পর্শ ভালই লাগছে, তারপরে, বোধহয় অনাথ না থাকার জন্যই জড়তাটাও আপাততঃ গেছে অনেকখানি, প্রশান্ত বলল—"আপত্তি করছিলাম বটে, কিন্তু দেখছি অনাথ-কাকার ব্যবস্থাটাই ঠিক। ঠাণ্ডায় জ'মে আসছিলাম রীতিমতো।"

ঘরের পরিবেশটা আবার সহজ ক'রে আনার জন্যেই বলা, কথাক'টা কর্তার মুখের দিকে চেয়ে আরম্ভ ক'রে স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে শেষ করল। কর্তার সে ভাবটা একেবারেই গেছে, এখন যেন খানিকটা অপ্রতিভই; এ অবস্থায় সহজ মানুষের যেমন হওয়া স্বাভাবিক। স্বাতি অপ্রতিভ রীতিমতোই, ওর দিকে চেয়ে বললেও কোন একটা উত্তর দিতে পারল না কিছুক্ষণ পর্যন্ত, তারপর একটু হাসির চেষ্টা করেই বলল—"এও কষ্টই, তবে তার চেয়ে ভালো বৈকি। অসুখে পড়ে যেতেন।"

বাইরের তাণ্ডব একইভাবে চলেছে। জানলার রন্ধ্রপথে সেই গোঙানি, কার যেন কাতর আশ্রয়-ভিক্ষা। স্বাতি সেই-দিকেই মুখটা ফিরিয়ে বলল—"থামবে না নাকি আর আজ?"

আলোচনাটা আকাশের কথায় এসে পড়তে বেশ সাবলীল হয়ে এল। ঘরের দৈন্যের ব্যাপারটা ক্রমে পেছনে পড়ে গিয়ে যেন দু পক্ষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। স্বাতির হয়তো মুছে যাওয়া নয়, ধুতির কথায়, হাটের কথায়, সব প্রকাশ পেয়ে গিয়ে গা-সওয়াই হ'য়ে গেছে। সেইজন্যই, প্রশান্ত যখন বলল অনাথের এ দুর্যোগে বেরুনোটা ভুল হয়েছে, অন্যায়ই বলা ঠিক, ও ম্লান হেসে উত্তর করল—"না, ঠিকই করেছে, এত ভেজার ওপর উপোষ করে থাকা চলবে না তো।"

যেন মরিয়া হয়ে দারিদ্রের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো, যেভাবেই সামনে আসুক তার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

তবু একটু পর্দার চেষ্টা করেই যাচ্ছে, বলল—"শুধু চাল-ডালে তো হয় না! তা হ'লে না হয়...."

শেষ করবার আগেই দরজায় দ্রুত করাঘাত পড়ল, হাওয়ার ওপর অনাথের গলার আওয়াজ উঠল—"মা মণি; দোর খোল গো!'

[চার]

আশ্বিনের শেষ ঝঞ্ঝাবৃষ্টি ছিল ওটা। কয়েকদিন থেকে আকাশ বেশ পরিস্কার রয়েছে। ক্বচিৎ দু'একটা সাদা মেঘের স্তূপ উদ্দেশ্যহীন অলসগতিতে একদিক থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে ভেসে। হেমন্তের অপরাহ্ণ বেলা, একটা হিমেল ভাব এসে গেছে বাতাসে, আর কেমন যেন একটা মন-উদাস-করা সুর। তার খানিকটা হয়তো প্রশান্তর মনের প্রতিভাসই। সেদিনকার বর্ষার সেই দুর্ভোগ রেহাই দেয়নি।

বেশ ভালো রকমই অসুখে পড়ে গিয়েছিল ; বুকে সর্দি বসে গিয়ে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া। দিনবারো ভুগে আজ চারদিন হোল পথ্য পেয়ে বাসার কম্পাউণ্ডের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছে ডাক্তারের কাছ থেকে। তারই সদ্ব্যবহার করে একটু ক্লান্ত হয়েই বারান্দায় আরাম-চেয়ারটায় এই এসে বসল।

প্রশান্ত রেলের কর্মচারী ; ইঞ্জিনিয়ার। একটা নূতন পুল তৈয়ার হচ্ছে, তারই চার্জ নিয়ে এসেছে। নূতনটা চালু হয়ে গেলে পুরানোটা ভেঙ্গে ফেলা হবে, সব মিলিয়ে বছর তিনেকের কাজ, ছোটখাট একটা কলোনি গড়ে উঠেছে—কুলিদের লাইন, কেরাণীবাবুদের লাইন, পোষ্টঅফিস, হাসপাতাল ছোটখাট একটা বাজার। একটু তফাতে অফিসার স্তরের লোকেদের বাসা ; ও নিজে, ওর একজন সাব-ওভারসিয়ার, একজন বিজলী-ঘরের ইনচার্জ ; বাসাসুদ্ধ পোষ্ট-অফিসটাও এইখানেই। হাসপাতালটা আরও একটু দূরে উল্টো-দিকে। তার ডাক্তারের বাসাও সেখানেই। তবে ডাক্তার এই পাড়াতেই এসে রয়েছে। প্রশান্তর অসুখের জন্যে নয়, আগে থেকেই। ডাক্তার চৌধুরী, পুরো নাম রজত চৌধুরী, প্রশান্তর পুরানো বন্ধু। ও কাজে ভর্তি হয়ে এলে তুই বন্ধুতে একসঙ্গে থাকবার জন্যে সাব-ওভারসিয়ারের সঙ্গে বাসাটা বদল করিয়ে নিল প্রশান্ত।

বারান্দায় একাই আছে বসে। একাই আছেও এখানে। অসুখের চিঠি পেয়ে মা এসেছেন, আর একটি ছোট বোন, ঊষা। মেয়ে নিয়ে তিনি ডাক্তারের বাসায় গেছেন বেড়াতে। ডাক্তারের বাসায় তাঁর বিধবা পিসি, বর্ষীয়সী ; একটি বোন, বয়স সতের আঠার। নাম বিশাখা। ওদিকে নিজেকেই নিয়ে থাকতে হয়েছিল, তু'দিন থেকে সেই রাত্রের কথাটা বড় মনে পড়ে পড়ে যাচ্ছে। এখন যেন আরও বেশি করে ; কেউ কাছে-পিঠে নেই, বিকালের আকাশটাও ওরই মতো কেমন যেন রোগ-পাণ্ডুর, গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে তারই দিকে চোখ তুলে ভাবছিল প্রশান্ত।

ঝড়-বৃষ্টির প্রত্যক্ষ দিকটা কেটে গিয়ে বাকি যা তার সবটুকু

যেন আজকের এই সুরে বাঁধা। কী নিদারুণ দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্য আবার কী একটা লজ্জাতেই না জড়িয়ে পড়ল! মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ছে—স্বাতির,—এক-একটা ঝোঁক আসছে আর লজ্জায় এক-এক ঝলক রক্ত এসে মুখখনাকে ছাই করে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। একেবারে গোড়া থেকে। বাপের রূঢ়তা—ঐ রকম জীর্ণ ঘরে নিয়ে আসা—কাপড় ছাড়ার কথা বলতেও পারছে না মুখ ফুটে—অনাথ এসে সামলাতে আরও বেপর্দা, আরও নিষ্করুণই হয়ে উঠল যেন ব্যাপারটা। শাড়ি এগিয়ে দেওয়ার লজ্জা—স্বাতি হয়তো ভেতরের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ঝড়-বৃষ্টির ছাটে—দেখছিল পরিণামটা কি হয়—অনাথ অবশ্য সামলেই যাচ্ছে, বাপের ছেঁড়া কাপড়টা নিজের বলে চালিয়ে পাট করে লুঙ্গি করে বানিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, কিন্তু সেই আপনার-হাতে-আপনি-ধরা-দেওয়া মিথ্যের জন্যে তো আরও আসতে পারছে না স্বাতি। তারপর যখন এল —চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনে।

বেচারি নামটাও কি পেয়েছে তেমনি করুণ!·······স্বাতি একটি নক্ষত্র—অশ্রু ছলছল। যখন ঢুকল ঘরে বাইরে থেকে—বারান্দাই হোক বা যাই হোক—ছলছলই করছিল যেন চোখদুটি—বৃষ্টির ছাটই হয়তো, অত ম্লান মুখে সেটাও তো অশ্রু হয়েই দেখা দেবে—আর, লজ্জার ওপর লজ্জা বেচারির—একেবারেই কি সামনাসামনি হয়ে পড়তে হয়।

অনাথও অত সামলেও শেষরক্ষা করতে পারল না। স্বাতি ওর কথা ধরে আর একটু সামলাবার চেষ্টা করেছিল—শুধু তো চাল-ডালে হবে না,—একটু পরেই অনাথ যখন ফিরল—গামছায় তরিতরকারি বাঁধা, দেখা গেল কাপড়ের খুঁটে যে জিনিসটা বাঁধা সেটা ডালই—অড়র-মুসুরি, যাই হোক; ভিজে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তার রংটা ফুটে বেরুচ্ছে। দু'মিনিটও হয়নি চাল-ডালের কথাটা বলেছে স্বাতি; অর্থাৎ ও-দুটো তো আছেই ভাঁড়ারে। কী যে হয়ে গেল মুখখানা!

কিন্তু এত দারিদ্র্য কেন ? প্রশ্নটা আসে এই জন্য যে, ওদের দু'জনকে দেখে মনে হয় ওরা, শুধু একটু নয়, যেন অনেকখানিই ওপরের স্তরের মানুষ। শুধু চেহারাতেই নয়। আরও কটা নিদর্শন পেল প্রশান্ত। প্রথমত সেই চিত্র আর ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি। তারপর সেই যে কয়েকখানা বই ছড়ানো ছিল মাছুরে। অনাথ বাইরে থেকে ফিরলে রন্ধনের আয়োজনের জন্য দুজনেই এ ঘর থেকে চলে গেল। বাপ রইলেন শুধু, কিন্তু নির্বাক হয়েই। কথার অভাবেই একখানা বই তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাবে প্রশান্ত, অনাথ এসে তাঁকেও ডেকে নিয়ে গেল। নিশ্চয় একলা ছেড়ে রাখতে চায় না স্বাতি। উনি চলে যেতে বইখানি খুলে দেখল প্রশান্ত। একখানি সংস্কৃত বই। দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা। সংস্কৃত একেবারেই জানে না, দেবনাগরীও এক রকম তাই-ই। কুঁতিয়ে-কাঁতিয়ে নামের পাতার যেটুকু পাঠোদ্ধার করতে পারল তাতে জানতে পারল ভবভূতির উত্তররাম-চরিত। বেশ মোটা বই, চামড়ায় বাঁধানো। বাইরে নামটা মেলাবার জন্যে বই মুড়ে দেখল পুটে শুধু ভবভূতি নামটাই লেখা রয়েছে, ইংরাজীতে, সোনার জলে ; আর ভল্যুম ১। তার অর্থ, কবির কয়েকখানি বই একসঙ্গে বাঁধানো। তার নীচে ইংরাজীতে লেখা রয়েছে এম. এন. লাহিড়ী। নিশ্চয় স্বত্বাধিকারীর নাম।

টের পেল তাই-ই। সমস্ত রাতই কাটাতে হোল ওখানে, ঝড়-বৃষ্টি শেষের দিকে কমে এলেও বেরুবার মত অবস্থা ছিল না। সমস্ত রাত জেগে তিনজনে গল্প করতে করতে বেশ একটা স্বচ্ছন্দতা এসে পড়েছিল, তাইতে খুব সন্তর্পণে পরিচয় জানতে গিয়েছিল প্রশান্ত, বইয়ের ঐ নামটা দিয়েই কথাবার্তা বেশি স্বাতির সঙ্গেই হচ্ছিল, বাপ মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন একটু আধটু। এক সময় একটু সুযোগ পেয়ে ওঁর নামটা কি জানতে চাইল। স্বাতির কাছেই।

গল্পের ছন্দটা হঠাৎ যেন কেটে গেল। স্বাতি মুখ নীচু করে বাপের দিকে চাইল। বাপও যেন একটু থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে বললেন—"তা বলো না মা, জানতে চাইছেন।"

একটু হেসে বললেন—"খুনী আসামী তো নয়। আমার নাম হচ্ছে…"

"না, থাক্।" —কুণ্ঠিতভাবে বাধা দিল প্রশান্ত। বলল—"বইয়ের পুটে দেখলাম এম. এন. লাহিড়ী…তাই…"

স্বাতি মুখ তুলে বলল—"ও আমার দাদুর নাম।"

চিন্তাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে প্রশান্তর। যে প্রশ্নটা নিয়ে আরম্ভ করেছিল তাইতেই আবার ফিরিয়ে আনল মনটাকে।

কথাটা হচ্ছে, ওরা যে স্তরে রয়েছে এখন, নেমে এসেছে বলাই ঠিক, সে-স্তরের নয়। আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে, তার সঙ্গে কৃষ্টির। ……বইগুলো নাড়াচাড়া করেছিল প্রশান্ত ব'সে ব'সে, দু'খানা আনকোরা নূতনও, একটা বাঁধানো খাতা, স্বাতির নাম লেখা। স্বাতি যেন পড়ছে কিছু, যেন কোন পরীক্ষার প্রস্তুতিই, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষাই হয়তো। এম-এ হতেই বা বাধা কি?

ওদিকটায় খুব চাপা দিয়ে গেছে। একবার বাপ বললেন—"মা, তোমার বইগুলো পড়ে রয়েছে।" ওদের খেতে দেওয়া হয়েছে। স্বাতি জড়োসড়ো হয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা দেবদারু কাঠের বাক্সয় তুলে রাখল বইগুলো, যেন সন্ধ্যা থেকে এইটেই সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে।

এ-স্তরের যে ওরা নয় এটা ঠিক। কি করে নেমে পড়েছে? বড় যেন করুণ। বড় উদাস করে দিচ্ছে মনটা।

কর্তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্যও নয়। তেমন কিছু নেইও মনে হোল। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে বসে গল্পগুজব করে যে রাত কাটাল তাতে এইটেই টের পাওয়া গেল যে, মানুষটি অল্পভাষী, তবে মাঝে মাঝে যে একটু-আধটু যোগ দিচ্ছিলেন তার মধ্যে বেখাপ্পা একটি কথাও বলেননি। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হোল আসবার সময়। উনি বরাবরই এক রকম এই ঘরেই ছিলেন, শুধু এক-একবার এক-আধ মিনিটের জন্য যাচ্ছিলেন বেরিয়ে। রান্না হয়ে যাবার পর গোপেশ্বর আর অনাথ উনানের আগুনে পোশাক-আষাকগুলো

শুকিয়ে নিচ্ছিল, মোটা খাকি টুইল, দেরি হচ্ছে, দেখে দেখে আসছিলেন ; শেষের দিকে ফিরতে একটু বেশিই দেরি হচ্ছে দেখে স্বাতি খানিকটা ইতস্ততঃ করে স্খলিত কণ্ঠে বলল—"একটা কথা আছে।"

একবার দরজাটার দিকে চকিতে চেয়ে নিয়ে বলল—"ইয়ে—মানে—আমাদের মার্জনা করবেন আপনি।"

বিস্মিত হয়েই চাইল প্রশান্ত। স্বাতি বলল—"বাবা একটু রূঢ় হয়ে পড়েছিলেন—যখন এলেন আপনি।"

হঠাৎ এ ধরনের কথা, তার ওপর কথাটা সত্যও, সঙ্গে সঙ্গেই মুখে কিছু যোগালো না প্রশান্তর। তারপর কিছু একটা বলবার আগেই যেন তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা সেরে ফেলবার জন্যে স্বাতি বলল—"উনি ও রকম নন, মোটেই নন, শুধু একটা ব্যাপার হয়ে···সে থাক্, মানে এই রকম অবস্থায় কেউ হঠাৎ এসে পড়লে—এই রকম দুর্যোগের মধ্যে······"

এই পর্যন্তই বলতে পেরেছিল। এই সময় উনিও দোর খুলে ঢুকলেন ঘরে। হাতে প্রশান্তর শুকনো পোশাকগুলো, হ্যাট পর্যন্ত। তুলে দিয়ে বললেন—"নিন, ছেড়ে ফেলুন শীগ্‌গির। দুর্ভোগ একটা।"

প্রশান্ত হাত থেকে নিয়ে হেসে বলল—"হতে দিলেন আর কই ?"

উত্তর করলেন—"তা বটে কিছুই তো নয়।"

তারপর হেসে, একবার মেয়ের দিকেও চেয়ে নিয়ে বললেন—"ওঁর সেই কথা স্বাতি—নাম্নে সুখমস্তি।"

স্বাতি প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে উঠল।

ওরা বেরিয়ে পড়ল সকাল হতে, ঝড়-বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। জীপ রইল পড়ে, লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেবে, মাইল দুয়েক পথ, হেঁটেই এল। বেরুবার সময় উনি বেশ একটু জড়ো-সড়ো হয়েই রাস্তা পর্যন্ত এলেন। কারণটা প্রকাশ পেল একেবারে শেষ দিকে। প্রশান্ত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠেছে, উনি ওর ডান হাতটা দুহাতে

ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ-দুটি ছলছল করে উঠেছে; কিছু বলতে পারছেন না বলেই বলছেন না।

স্বাতি বলল—"আমি সে-কথা বলেছি বাবা ওঁকে।···কিছু মনে করেননি উনি।"

চেয়ে রইলেন মুখের দিকে প্রশান্তর। বললেন—"ও রকম ঝড়-বৃষ্টিতে কেমন যেন মাথার ঠিক থাকে না। মাথার ওপর থেকে কুঁড়ের চালা-টুকুও তো সব যেতে বসেছিল।"

—ওসব কিছু নয়, পরিহাসে সৌজন্য-আলাপে দেখা গেল মাথা বেশ পরিষ্কারই আছে। তবে কুঁড়ের চালার পেছনে একটা কাহিনী আছেই। সেটুকু কি হতে পারে।

[পাঁচ]

অসুখের ক'টা দিনে কাজ বিস্তর পেঁছিয়ে গেছে, বিশেষ করে অফিসের কাগজ-পত্র সম্পর্কীয় যা কাজ; আরম্ভ করবার পর যেন নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত রইল না। তবু তারই মধ্যে, দুর্বলতার জন্য যখন ক্লান্তি এসে পড়ে, অফিসের ফাইল থাকে খোলা, শরীরটা চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়ে, সে সময় মনটা আবার সেই রাতটিতে যায় চলে। ছবিগুলি মনের সামনে ফুটে ফুটে ওঠে,—আর গুটিকয় প্রশ্ন—কেন এ রকম? কিছু করা যায় না? · ···কে ওরা?

—যে-ক'টি প্রশ্ন সেদিন থেকেই উঠছে মনে, কিন্তু যাদের উত্তর জেনে নেওয়ার কোন সুযোগই যায়নি পাওয়া। তার কারণও ছিল। ও গিয়ে প'ড়ে এতই বিড়ম্বিত করে তুলেছিল ওদের দারিদ্র্যকে, ওদের মর্যাদায় এমন আঘাত দিয়ে বসেছিল যে নিজের দিক থেকে আর ও-ধরনের প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি। ওরা নিজে হ'তে তোলবার মানুষ নয়। শুধু তাই নয়, পাছে প্রশান্ত প্রশ্ন করে বসে কোন, তাই—ও কে, কি কাজ করে, কোথায় থাকে সে সম্বন্ধে কোন

কৌতুহলই প্রকাশ করেননি। না বাপ, না মেয়ে। পরিচয় নয়, শুধু নামটুকু একবার জানতে চেয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হোল তাতে আরও যেন ও-পথটা বন্ধ হয়ে গেল প্রশান্তর কাছে।......যেখানে এই অবস্থা, সেখানে আবার নিজে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথাই আসে না। শরীর সেরে আসতে লাগল, তার সঙ্গে কর্মচঞ্চলতা গেল বেড়ে। নদীর গর্ভের মধ্যে দিয়ে নতুন রেল টেনে গাড়ির চলাচল সাধিত করা হচ্ছে। পরের বছরের বর্ষা নামার আগেই পুলের কাজ সেরে ফেলতে হবে, তার জন্যে এ-কয়টা মাস এমন কিছু বেশি নয়। ধীরে ধীরে মিলিয়েই আসতে লাগল সেদিনের স্মৃতি।

অগ্রহায়ণের কয়েক দিন গেল, বেশ শীত পড়ে এসেছে। রবিবার। বাসার সামনের বারান্দায়, রোদে একটা আরামচেয়ারে গা এলিয়ে অফিসের কাগজপত্র দেখছিল প্রশান্ত, রোদ চলে যাওয়ার পরও একটা চুরুট ধরিয়ে সেই ভাবেই পড়ে রইল। কয়েক দিন হোল বোনটিকে নিয়ে মা চলে গেছেন বাড়ি, বাসার ভেতরটা বড় শূন্য মনে হচ্ছে, বিশেষ করে, অফিস না থাকায় আজ বাসাতেই কাটাতে হয়েছে বলে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসতে গোপেশকে ফাইলগুলো সরিয়ে রেখে ড্রেসিং-গাউনটা এনে দিতে বলল। নিয়ে এলে গায়ের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সেইভাবেই চুরুট টেনে যেতে লাগল। আলস মনটাকে অফিসেরই একটা ছোট রকম সমস্যা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে।

সন্ধ্যাটা অরেও গাঢ় হয়ে এল। উঠব-উঠব করছে, রাস্তায় একটা লোকের ওপর দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল। রাস্তার দু'ধারে চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছে যেন কোন বিশেষ একটা বাড়ির খোঁজেই। শীতের জন্য সব বাসাই অবরুদ্ধ, এগিয়ে আসতে আসতে প্রশান্তকে বাইরে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল, যেন গৃহস্বামীর হাতের চুরুট আর বিলাতী ঢঙের পরিচ্ছদ দেখে প্রশ্ন করবে কিনা একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে।

প্রশান্তই প্রশ্ন করল—"কি চাই ?

উত্তর হোল—"ডাক্তারবাবুর ড্যারাটা খুঁজচি। হাসপাতালের

উদিকে গেছন্থ, বললে নাকি ইদিক পানে চলে এসেছেন·····
সম্প্রতি।"

শেষের শব্দটা একটু থেমে গিয়ে জুড়ে দিলে, যেন ভাষায় একটু আভিজাত্য আনবার জন্যই খুঁজেপেতে বের করেছে।

"তুমি এক কাজ করো—সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরবে, তারপর বাঁদিকের প্রথমে যে রাস্তাটা পড়বে সেটা ছেড়ে···"

এইখানেই হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রশান্ত উঠে পড়ল ; ড্রেসিং গাউনটা পরতে পরতে বলল—"তুমি বরং দাঁড়াও, আসছি।"

বাসার সামনে একটু বাগান, তারপরে রাস্তাটা বারান্দার আলোটাও জ্বালায়নি, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে, তবে হঠাৎ খেয়াল হোল, গলাটা ছিল যেন চেনা। নেমে গিয়ে কাছাকাছি হতেই দেখল ঠিকই আন্দাজটা। বলল—"তুমি হঠাৎ।"

কণ্ঠস্বরে বেশ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। লোকটি স্বাতিদের সেই ভৃত্যটি ; অনাথ।

বোধহয় নূতন পরিবেশ বলেই অনাথের চিনতে একটু সময় লাগল। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরেই হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বলল—'মশায় ? গড় করি।"

"কি ব্যাপার ? কারুর অসুখ নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তার।"

"তাই নাকি ? অসুখটা ?"

"ডিপথিরিয়া।"

চমকে উঠল প্রশান্ত। বলল—"ডিপথিরিয়া !······কখন্ টের পাওয়া গেল ?··· ··চলো তুমি আমার সঙ্গে, যেতে যেতে শুনি।"

পাচক-ঠাকুর চাটুজ্যেকে হাঁক দিয়ে, বেরিয়ে যাচ্ছে জানিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। হন হন করে পা চালিয়ে দিয়ে বলল—"এসো, পাশে পাশে চলো। ডিপথিরিয়া বলছ—তা········"

"যে রকম অবস্থা তাতে ডিপথিরিয়া ভেন্ন অন্য কিছু তো হতে

পারে না। মা-মণিও তাই বলছে—কর্তার অবিশ্যি চাপা দেওয়ার চেষ্টা—ঘাবড়ে যাবে তো মেয়েটা—কাল তো বেরুতেই দিলেন না আমায়—আজ মা মণি নাকি নেহাৎ হেদিয়ে পড়েছে·······”

“উফ্! একটা দিন দেরি করে ফেলেছ এর ওপর! রোগীর কথায়!”

“কতকগুলো যে দোষ রয়েছে আবার—সহজ রোগী হয় তবে তো এঁটে উঠবে মানষে······”

বেশি দূর নয়, রাস্তাটা শুধু কয়েকটা মোড় ঘুরে গেছে। রজত বাসাতেই ছিল, তাড়াতাড়ি ব্যাগে প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। প্রশান্ত আর ভেতরেও গেল না। জীপটা গ্যারেজ থেকে বের করে স্ট্যাণ্ডেল পায়েই উঠে পড়ল রজত আর অনাথকে নিয়ে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে এসে পড়ল ওরা।

স্বাতি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল; প্রশান্তর উপর দৃষ্টি পড়তে ভ্রূদুটা একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু আর চেয়ে না থেকে ভেতরে নিয়ে গেল দুজনকে।

রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে পরীক্ষা করে রজত স্বাতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—“আগে কে দেখেছে?”

“আগে?”—প্রশ্নটা করেই একটা ঢোক গিলল স্বাতি। ভয়ে গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে কথাটা আটকে গেছে। উত্তর দিল অনাথ, বলল—“আগে কাউকে আর আনতে দিলেন কই? দেরি করে বাড়াবাড়ি হতেই না মনে করন্ তাহলে পুল-কলোনি থেকে একেবারে বড় ডাক্তারকেই······”

ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে রজত আবার পরীক্ষা নিয়ে পড়ল। ঘরটা নিঃশব্দ; এবার যেন নিজের নিজের নিঃশ্বাসটুকুও সবাই বন্ধ করে ফেলেছে। প্রথমে হাঁ করিয়ে জিভ, গলা নিয়ে শুরু করেছিল, এবার বুক-পিঠ ভালো করে দেখে, আর একবার গলাটাও দেখে

নিয়ে স্টেথোস্কোপটা হাতে মুড়ে নিয়ে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—
"ডিপথিরিয়া তোমায় কে বললে ?"

"নয় ?" উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"ধারে কাছে দিয়েও যায় না। ফ্লু, যা চারিদিকেই হচ্ছে এখন, তাও এমন কিছু নয়, বুক-পিঠ ভালই আছে।........গলাটা বোধহয় একটু বেশি খুস খুস করছে ?"

শেষের প্রশ্নটা করল কর্তাকেই। তিনি শুয়েই ছিলেন, একটু উগ্রভাবে চেয়ে বললেন—"উঠতে পারি আমি তাহলে ?"

"তা পারবেন না কেন ? তবে......"

"তাহলে উঠে ও হারামজাদার কানটা ধরে দুটো চড় কসিয়ে মনের জ্বালা মেটাই।" ঘাড় উল্টে অনাথের দিকে চেয়ে একটু হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন কর্তা, পরীক্ষার বহরে নিশ্চয় নিজেও একটু ঘাবড়েই গিয়ে থাকবেন। বলেই যেতে লাগলেন—"বলছি কিছু নয়, তা একেবারে বড় ভিন্ন ছোটখাট রোগের নাম তো আনবে না মুখে। মেয়েটাকেও ঐ করে ভয় পাইয়ে পাইয়ে এমন দলে টেনে নিলে যে......"

রজত বুকে বাঁ হাতটা চেপে বলল—"চুপ করুন আপনি, খানিকটা কাহিল তো রয়েছেনই।"

স্বাতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"জ্বর কত ? দেখা হয়েছিল ?"

অনাথই একপা সামনে এসে উত্তরটা দিল, বলল—"পাড়ায় নিয়ে গেছে থারমেটার যন্তোরটা—এই জ্বর তো ঘরে ঘরে।"

—ধমক খেয়ে এতটুকু সঙ্কোচের ভাব নেই। ভবিষ্যৎ বাঁচিয়ে জুড়েও দিল—"নিয়ে গিয়ে ভেঙ্গেও দিয়েছে।"

রজত নিজের থারমোমেটারটা বের করে লাগিয়েই দিয়েছিল, বের করে লণ্ঠনের আলোয় দেখে নিয়ে বলল—"নিরানব্বই পয়েন্ট দুই। টেম্পারেচারও বেশি নেই।"

"ছেল বেশি। আমি যখন নাকি বেরুই।" —বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল অনাথ।

"হ্যাঁ, একশ, পাঁচ ডিগ্রি!" দাঁতে পিষে মন্তব্যটুকু করে কর্তা উঠে বসলেন বিছানায়। রজতের দিকে চেয়ে বললেন—"মিছে খানিকটা হয়রানি আপনার ; এই শীতের……" তারপরেই ওঁর দৃষ্টিটা প্রশান্তর ওপর গিয়ে পড়ল। পাশ ফিরে শুয়েছিলেন বলে এতক্ষণ টের পাননি। একটু চেয়ে থেকে বললেন—"আপনি?…… আপনাকে যেন……"

প্রশান্ত হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল, বলল— "আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছেন আমায়। সেই ঝড়ের রাতে আমিই এসেছিলাম। পুল-কলোনিতেই রয়েছি। এর সঙ্গে আচমকাই দেখা, অসুখটার কথা শুনে তাড়াতাড়ি রজতকে জীপে উঠিয়ে নিয়ে চলে এলাম। ও আবার আমার বন্ধুও।"

কর্তা ধিক্কারের দৃষ্টিতে অনাথের দিকে চাইতে সে বলল— —"চটিও বদলাননি।"

বেশ চেষ্টা করেই যেন কর্তা সংযত করে রাখলেন নিজেকে, শুধু বললেন—"ডিপথিরিয়া যে!"

প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"দেখুন তো, আপনারও দুর্ভোগ।"

স্বাতিকে বললেন—"কথা না শুনে দেখলে তো কি কাণ্ডটা করলে দুজনে মিলে? যাক, কি আর হবে? এখন এঁদের বিদায় করো। এঁর দুর্ভোগের তো আর প্রতিকার নেই কিছু।"

আবার প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"একটু যে চা দেবো, তা ও পাটই নেই বাড়িতে ; কেউই খাই না আমরা।"

স্বাতি ওঁকেই প্রশ্ন করল—"পান খান না?"

প্রশান্তই উত্তর দিল—"না ; কিছুর দরকারও নেই।"

রজতকে বলল—"ওঠ তাহলে। একটা কিছু ওষুধ লিখে দেবে?"

"ইনফ্লুয়েঞ্জা, তিন দিনের মেয়াদের পর আপনিই সেরে যাবে, আবার ওষুধ কেন?" —আপত্তি করলেন কর্তা।

স্বাতি বলল—"তবু একটা লিখেই দিন। অন্তত যাতে বাড়তে না পারে। বয়েস হয়েছে তো।"

অনাথ বলল—"আর খোরাক কি হবে সেটাও বলে দেন……"

"খোরাক হবে খাঁটি দুধ, আপেল, বেদানা, নেসপাতি, আঙুর —যোগাতে পারবি তুই ?"

একেবারে ফণা ধরে উঠেছেন কর্তা। কাগজ আনতে যাচ্ছিল স্বাতি, ঘুরে একটু ব্যস্ত হয়েই এগিয়ে আসছিল, অনাথই নিল সামলে। গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে বলল—"তুমি চুপ করো দিকিন, রোগীর সব কথায় থাকতে নেই। চুপ করে থাক তুমি। বুঝলুম না হয় ডিপথিরিয়া হয়নি, তাই বলে তাকে টেনে আনতে হবে ?"

ফণাটা নামিয়ে একটু ঘুরে বসলেন কর্তা।

[ছয়]

স্বাতি তোয়েরই ছিল। প্রেসক্রিপশনটা লেখা হয়ে গেলে আঁচলের গেরো খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল রজতের দিকে। রজতের দৃষ্টি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরের চারিদিক একবার চকিতে ঘুরে এল, সে বলল—"এসব কেন ? থাক।"

কর্তার মুখটা হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন—"না, 'থাক্' কেন ? ওটা নিতেই হবে।"

তখনই কিন্তু ও ভাবটা বদলে নিয়ে বললেন—"ফি না নিলে —বুঝতেই তো পারছেন—স্বাতি কথায় কথায় ডেকে পাঠাবে।"

একটু হেসে বললেন—"হাঁচি পেলে যে একটু হাঁচব নির্বিবাদে তার উপায় থাকবে না। নিন ওটা।"

কথাটাকে হাল্কা করে দেওয়ায় একটু উৎসাহ পেয়েই রজত আবার আপত্তি করে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রশান্ত বাধা দিয়ে বলল—

"বেশ তো, প্রায় এক জায়গাতেই রয়েছি বলে ফি হিসেবে না নিতে চাও, স্বাতি দেবীর জরিমানা বলে তো নিতে পার।"

পাঁজরায় বাঁ হাতটা লাগিয়ে বলছিল, একটু আঙ্গুলের টিপও দিয়ে দিল।

"দিন তবে"—বলে হাতটা বাড়িয়ে নোটটা নিল রজত। বুক-পকেটে গুঁজে রাখতে রাখতে উঠে পড়ে বলল—"বেশ, তাহলে আসি। আপনি কিন্তু সাবধানেই থাকবেন একটু।"

কর্তা বললেন—"আমার নিজের খেয়ালমত থাকা নয়তো, ওরা যেমন রাখে। তা সাবধানের কসুর দেখছেন কিছু?"

দুজনেই দুজনকে নমস্কার করে ঘুরেছে, রজত আবার ফিরে দাঁড়াল, বলল—"কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে। ওটা একটা বিলিতী পেটেন্ট ওষুধ, আমাদের হাসপাতাল ছাড়া কাছে-পিঠে কোথাও পাওয়া যাবে না। ওটা অনাথকে দিয়ে ঐখান থেকেই আনিয়ে নেবেন।"

চোখ নামিয়ে একটু কি ভাবলেন কর্তা—'হ্যাঁ' আর 'না'-র মধ্যে দ্বন্দ্ব বোধহয়—চোখ তুলে একটু কৌতুক-রহস্যের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"মেয়ে আসে বাপ-মাকে ঋণে জড়াবার জন্য, না গো মা স্বাতি?"

দুজনের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কথাটা বলে রজতকে বললেন—"বেশ, তাই নিয়ে আসবে। কাল যাবেখন। আজ তো রাত হয়ে যাবে ফিরতে।"

ওরা ঘুরতে এবার উনিই আবার ফেরালেন, বললেন—"শুনুন।"

ফিরে দাঁড়াতে প্রশান্তকেই সামনে পেয়ে বললেন—"বলছিলাম, হাসপাতালে তো ভালো রকম পথ্যেরও ব্যবস্থা থাকে।" —একটু হাসি নিয়েই মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এবার প্রশান্তই চোখ নীচু করে একটু ভাবল। হয়ে পড়েছে একটু লুব্ধ কৌতুকরহস্যের সুযোগটা নেওয়ার জন্য। তারপর তার হঠাৎ সংস্কৃত বইগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, সেদিন যে দেখেছিল; বলল—"কথাটা ঠিক, তবে

আপনার জন্যে পাঠানো যায় না তো। উনসত্তর জাতে ঘাঁটাঘাঁটি করছে তো।"

ওঁর মর্যাদা ধরেই রহস্যের উত্তরটুকু দিয়ে বেরিয়ে এল রজতের পেছনে পেছনে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

একটু নীরবেই কাটল, তারপর প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল—"দেখলে?"

"দেখলাম বৈকি।" উত্তর করল রজত, বলল—"তুমি যে সেই চালার আধখানা উড়ে যাওয়ার কথা বলেছিলে ঝড়ে, সেটাও তো মেরামত হয়নি ; অথচ প্রায় মাস দু'য়েকের কাছাকাছি হয়ে গেল না?"

"অথচ কোন রকম সাহায্য করবারও উপায় নেই। দেখলে তো ফি নেবে না বলতে কি রকম হয়ে উঠলেন। উগ্রই বলতে হয় না কি?"

"সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমায় প্রশান্ত। নোটটা বুক-পকেটে থেকে আমায় যেন বিঁধছে। কোন উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? অন্য কোন ছুতো করে?"

"সম্ভব বলে তো মনে হয় না। ওঁর এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি ডেলিকেট (delicate)। যতই মিলিয়ে দেখছি, মনে হচ্ছে ওঁদের দারিদ্র্য নিয়ে কেউ 'আহা' বলবে এইটে উনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। আমার সেদিনের অভিজ্ঞতা তো বলেইছি তোমায়। অভদ্রতা ভিন্ন কিছু বলা যায় না। কিন্তু যতই দেখছি বেশ বুঝতে পারছি, এই ব্যাপার। সেদিন তো দারিদ্র্য আরও প্রকাশ হয়ে পড়বার কথা, আশ্রয় দিতে হবে, আহারও। সে যে কী বিপর্যস্ত ভাব মেয়ে আর বাপের! উনি এত রূঢ় হয়ে উঠলেন—এ রকম চেহারা যে প্রথমটা সত্যিই ভেবেছিলাম একদম পাগলের সামনেই পড়ে গেলাম বুঝি।"

আবার নিস্তব্ধতা এসে পড়ল দুজনের মাঝে। জীপটা বাসার সামনে এসে পড়লে প্রশান্ত বলল—"এসো, চা খেয়ে যাও। বাড়িটা খালি, আরও ভাল লাগছে না।"

গাড়ি গ্যারেজে তুলে রেখে দুজনে ঘরে গিয়ে বসল। প্রশান্ত

আগেকার কথার জের ধরেই বলল—"অথচ এদিকে আলাপ-আলোচনায় মানুষটি কেমন সহজ ছাখো।"

শুধু সহজ বললেই হয় না। বেশ ধারালো বুদ্ধি, অবস্থা বুঝে সিচুয়েসন সামলে নেবার ক্ষমতা রয়েছে। বেশ একটু ঠাট্টার ভাবও সঙ্গে—হাসপাতালের পথের কথা যখন বললেন—লক্ষ্য করেছ নিশ্চয় —খুব সূক্ষ্ম……"

"তাই তো আমি আর এগুতে সাহসও করলাম না। মনে হোল হয়তো আবার ঘা দিয়েই বসব।"

ওঁদের নিয়েই খানিকটা রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল ছুই বন্ধুতে। নিতান্তই অল্প, পাঁচ-সাত ঘর নিয়ে একটি কৃষক পল্লী; এখানে পরিবারটি যেমন বেমানান তেমনি অসহায়। ছুই বন্ধুরই সহানুভূতি গিয়ে পড়েছে, অথচ এমন একটা প্রবল বাধা রয়েছে যে কিছু করবার উপায় নেই। অনেক রকম আন্দাজ করল ছু'জনে—কে হতে পারে, কি উপজীবিকা। মুশকিল হয়েছে, ঘরে সোমথ মেয়ে, যাওয়া-আসা করে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের রাস্তা বন্ধ। এমন অবস্থায় কৌতূহল পরিহার করাই সমীচীন মনে হোল ; অন্তত সংযত রাখা। ঠিক হোল, রজত ডাক্তার-মানুষ, দেখবে এদিক-ওদিক থেকে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারে। খুব সন্তর্পণে ; ওঁদের আত্মমর্যাদায় যেন একটুও না আঘাত লাগে।

রজত যাওয়ার জন্য উঠল, প্রশান্ত নোটটা চেয়ে নিল, বলল—"দাও, দেখি যদি ওটার কোন ব্যবস্থা করতে পারি। তুমি আর এক কাজ করবে, অনাথ কাল যখন ওষুধ নিতে আসবে তাকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও।"

সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকবে অতোখানি মনোবল অনাথের নেই। কাজের চাপ, রাত্রেও সামলাতে হয়, টেবিলে বসলও প্রশান্ত, কিন্তু কোন মতেই আজ আর মন বসাতে পারল না। রসুইয়ে

ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে খাবার দিয়ে দিতে বলে, একটা নভেল হাতে করে বিছানায় লেপটা টেনে নিয়ে শুয়েছে, দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হোল।

ওর ঘরের দরজারই ; ঘরটা বাইরের দিকের বারান্দা-সংলগ্ন। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"কে ?"

উত্তর হোল—"আমি অনাথ ভাণ্ডারী।"

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল বিছানায়। কাউকে না ডেকে নিজেই দোর খুলে দিতে যাচ্ছিল, মনে পড়ল ভেজানই আছে। বলল—"চলে এসো।"

প্রবেশ করতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল—"কি খবর! তুমি যে সন্থ সন্থ·······"

"খবর আর ভালো হতে পেলেন কই ?" —হাতে একটা বড় লাঠি রয়েছে, গাঁঠে গাঁঠে পেতলের পাত মোড়া, সেইটের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল অনাথ। একটু একটু হাঁপাচ্ছে।

আতঙ্কে প্রশান্তর মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুবার আগেই বলল—"বলছিনু—খবর আর ভাল হতে পেলেন কই! বড় কর্তা যে বিঘোরে মারা গেলেন········"

"মারা গেলেন! বল কি ?" —উত্তেজনায় পা দুটো লেপের মধ্যে থেকে নীচে নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল প্রশান্ত, অনাথ বলল—"লাহিড়ী বংশের ঐ রোগ, এই তিন পুরুষ ধরে দেখছি তো। ডাক্তারে বললে রক্ত মাথায় চাপ বেঁধে উঠেছে, ধরাকাটের ওপর থাকতে হবে, কর্তা বললেন আমার কিছু হয় নি—সেই পূর্ববৎ আহার, সেই পূর্ববৎ সব কিছু—তারপর একদিন হুট করে·······"

"ওহে বাপু শোন," অধৈর্যভাবে বাধা দিয়ে বলল প্রশান্ত—"এঁর বাবার কথা থাক, আমি জানতে চাইছি, ইনি, মানে স্বাতি দেবীর বাবা—ইনি কেমন আছেন। তুমি সাত তাড়াতাড়ি চলে এলে—হাঁপাচ্ছ··· ··"

"চলে না এসে সর্বনাশ ঘটাব আবার একটা ? বংশের ধারা

তো জানি ; একটার পর একটা এই রকম আহম্মকি করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান—তুই শালা ব'সে ব'সে দেখ। এবার আবার ঘাড়ে ঐ একটা আইবুড়ো মেয়ে……"

"তুমি একটু সংক্ষেপ করে বলো বাপু। জিজ্ঞেস করছি—যেমন দেখে এসেছিলুম অন্তত সেই রকম আছেন তো ?"

"তা আছেন। তবে আবার গিয়ে সেই রকমটি দেখতে পাবেন এ রকম মুচলেকা তো লিখে দিতে পাচ্ছিনে। আছেন ওপরে ওপরে —বাপ যেমন ছিলেন……"

"থামো।" —হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দিয়ে প্রশান্ত চাটুজ্যেকে ডেকে তু'কাপ চা করে দিয়ে যেতে বলল। খানিকটা নিশিন্ত হয়েছে, সেকালের পরিবারভুক্ত পুরোনো চাকরদের মুদ্রাদোষ, এক কথার সঙ্গে পাঁচ কথা টেনে এনে বলা, বিশেষ করে পারিবারিক ইতিহাস থেকে। নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য একটা কথাও মনে হয়েছে ওর, সেইটে ধরে বর্তমান ছেড়ে অতীতেই গিয়ে পড়ল, বলল—"সে আর ভয় নেই, ভালো ডাক্তারের হাতে পড়েছে, নিশ্চিন্দি থাকো তোমরা, তোমার মা-মণিকেও আড়ালে ডেকে বলে দিও। ……তাহলে তুমি তিন পুরুষ ধরে এঁদের সঙ্গে রয়েছ ?"

"কেন, আমার বাপ আবার এনার ঠাকুদ্দার খাস তাঁবেদারি করে যায়নি ?" আমার ঠাকুরদাদা আবার তানার বাপের লেঠেলদের সর্দার ছেল না ? তারপর আবার ……"

"ডাকাত ছিলেন তিনি ?"

উবু হয়ে বসেছিল অনাথ, লাঠিটা শুইয়ে রেখে একটু চেপে গুছিয়ে বসল। বলল—"কোন্ জমিদারটা ছেল না সেকালে আমায় বলতে পারেন ? স্বরূপগঞ্জের রায়েরা, উদিকে ভুবন গাঁয়ের দত্তরা, তারপর দক্ষিণে যান—সুরূপের গোঁসাইরা, কোনটের নাম করবেন করুন—আমি দেখিয়ে দোব—আজ কারুর নাতি হাইকোর্টের বালিষ্টর কারুর ছেলে জেলা কোর্টের জজ—তা হোন না কেন, তবে সুতো ধরে ওপরে উঠে গেলে সবার তো ঐ এক কাহিনী—বাপ-পিতামোর

দিনের কথা বলছি—যার যত বড় শক্ত লাঠি, যে যত লুটেপুটে আনতে পারলো সে তত বড় জমিদার। তা জমিদারই বলুন কিংবা রাজাই বলুন—দেখেছি তো সে বোলবোলাও।"

"তাহলে জমিদারের বংশ এঁরা?"— প্রশ্নটা করে চুপ করে রইল একটু প্রশান্ত। এরপর কিভাবে পরিচয়টা এগিয়ে নিয়ে যায়? জমিদার থেকে একেবারে এত নীচে!

অনাথও চুপ করেই বসে রইল। মুখটা গম্ভীর, ঠোঁট-ছুটো বার-কয়েক কুঁচকে কুঁচকে উঠল, যেন অনেক কষ্টে একটা কথা ভেতরে চেপে রেখেছে। ঠাকুর চা নিয়ে এল।

প্রশান্ত একটা কাপ নিয়ে অনাথকে বলল—"তুমিও একটু খেয়ে নাও। পুরোনো চাকর, ভয় পেয়ে মনে হচ্ছে যেন ছুটেই এসেছ। এমন তো মোটরেই চলে আসতে পারতে আমাদের সঙ্গে।

ঠাকুর রেকাবির ওপরই ছুটো কাপ বসিয়ে নিয়ে এসেছে। এদিকে কোন উত্তর না দিয়ে অনাথ একটু যেন বিরক্তভাবেই তার দিকে চেয়ে বলল—

"তুমি কী গো ভাই? একটা গেলাস নিয়ে এসো যেমন-তেমন হোক।"

ঠাকুর একটা কাঁচের গেলাসে চা-টুকু ঢেলে নিয়ে এলে সেটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল; তখনই প্রায় এক চুমুকেই শেষ করে ফিরে এসে দেয়ালের একপাশে রেখে দিয়ে আবার সেইভাবে বসল, তারপর গোঁফজোড়া হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিয়ে বলল—"তাহলে দেখছি আপনি না বলিয়ে ছাড়লেন না। আপনাদের সঙ্গে মোটরে করে এলে আর ঘরে ঢুকতে হোত আমায়?"

"চোটে যেতেন?" —প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

উত্তর দিল না কোন অনাথ, ভাবটা যেন—একথাও জিজ্ঞেস করতে হয়? বলল—"আর এই যে ওষুধ নিয়ে যাব, মিছে কথা বলেই তো ঘ'রে সাঁদ করাতে হবে। ভেতর থেকে হাঁকদোব—"কে কড়া নাড়লে' —বলে। তারপর শিশি হাতে করে ফিরে গিয়ে বলা—ডাক্তারবাবু

আপন লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেছেন। সুবিধে, মেয়ের পড়া নিয়ে য্যাখন বসেন, জ্ঞানগম্যি তো আর থাকে না কিছু। তা এসব ধরি না, চার পুরুষ ধরে নুন খাচ্ছি, না হয় বললুম খানিকটা মিথ্যে, যুধিষ্ঠিরকেই বলতে হোল, অনাথ ভাণ্ডারী তো কোন্ ছার্। এসব ধরিনে। কাল্ হয়েছে আগেকার সেই দরাজ জমিদারি মেজাজ নিয়ে।"

"যায়নি এখনও ?" —প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"গেছে কি করে বলবেন তা ক'ন ? একটা লমুনো তো স্বচক্ষেই দেখলেন।"

"কি ?" —আন্দাজটা বোধহয় করতে পেরেছে, তবু প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"তুললুম না কথাটা। তোয়েরই তো ছিলুম, তা যা করেই হোক। তবে ডাক্তারবাবু য্যাখন নেব না বলে হাত গুটিয়ে বসলেন, ত্যাখন······"

কথাটা টেনে নিয়ে চোখ তুলে সন্তর্পণে একটু মুখের দিকে চাইল অনাথ।

প্রশান্ত বলল—"তুমি কি ফিয়ের টাকাটার কথা বলছ ?"

একটা যেন ঘা খেল অনাথ, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল—"সে—ঐ তো বলনু যে করেই হোক, তোয়ের তো ছিলুমই, মা-মণি বেঁধেই তো রেখেছেল আঁচলে, বাড়িয়েও তো ধরলে······"

গর্বে, রাগে, অভিমানে বেশ পুরানো কাহিনী ধরে চলছিল, হঠাৎ যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে অনাথ, যেন গলায় কথাগুলো বেধে গিয়েই চুপ করে গেল : মাথাটা নামিয়েও নিল একটু !

প্রশান্তর কাছে নোটটা রয়েছে বলেই এ সুযোগটা আর ছাড়ল না, যদিও একটু দ্বিধাগ্রস্ত হোলই প্রথমটা। বলল—"হ্যাঁ, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছ অনাথ, আমিই বলব ঠিক করেছিলুম, তারপর ভুলে গেছি। ইয়ে······মানে······রজত—ঐ ডাক্তার আর কি—আমার বন্ধুই তো—টাকা ও নিতে চাইলে না—আমায় বললে, তুমি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরৎ দিতে পার······আবার কথা হচ্ছে সরকারি

ডাক্তার, নিতেও তো পারে না ফি······তুমিই এটা হাতে রাখো······ ওঁদের কাউকে বলে কাজ নেই······”

পকেট থেকে নোটটা বের করে বাড়িয়ে ধরে নিজের ঝোঁকেই বলে যাচ্ছিল, অতটা বুঝতে পারেনি, “নাও ধরো”—বলে হাতটা আর একটু বাড়িয়ে ধরতেই অনাথ পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বলে চলল—“ও ইঞ্জিয়ারবাবু, আমি এ কি সমিস্যেয় পড়লুম বলেন—কী পাপ করেছিলুম আমি—জানছি উদিকে অপরাধী হচ্ছি, মহাপাতক করছি ঐ দেবতুল্যি মানুষকে মিথ্যে বলে—ইদিকে আমি যে ডাক্তারবাবুর মতন দরাজ বুকে হাত গুটিয়ে নোব সে ক্ষ্যামতা আমার কোথায় ?···এক দরাজ বুক নিয়ে কত্তাই আছেন বসে, কি করে যে চলছে এক আমিই জানি কি মা-মণিই জানে—দুখের মেয়ে, দিন দিন যে কি হয়ে যাচ্ছে বাবু—এমন জায়গায় এসে পড়েছি—একটু ‘আহা’ বলবে, বিপদে-আপদে একটু পাশে এসে দাঁড়াবে, এমন মনিষ্যি নেই একটা—গরীব চাষা-ভুষো, তাদেরই বা দোষ কি ?······ এক জিদ ধরে বসে আছেন, নড়বেন না এখান থেকে—একদিন মা-মণিকে বোঝাচ্ছেন পাণ্ডবদের সেই অজ্ঞাতবাসের কথা—সেই যে একদিন হাঁড়ি খালি, সিকৃষ্ণ এসে হাজির—ছল করে খেতে চাইলেন—দৌপুদী ঠাকুরুন দেখলেন একটি ভাতের সঙ্গে একগাছি শাক পড়ে আছে হাঁড়ির এক কোণে—ও বাবু, দুখের মেয়ে মা-মণিকে আর কত বুঝতে হবে ? কত আর বুক বাঁধবে ?······”

পরিচয় খুঁজছিলই প্রশান্ত, অনাথ আপনা হতেই দিয়ে যাচ্ছে, মন্দ লাগছিল না, কিন্তু হঠাৎ যে এই রকমটা দাঁড়াবে তা ভাবতেই পারেনি। প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে কী যে করবে ঠিক করতেই পারল না, তারপর একটু ঝুঁকে এগিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল—“চুপ করো অনাথ ! চুপ করো। ওঠা-নামা এ তো আছেই সংসারে, কি আর করবে ? আমিও তো এতটা জানতাম না, ভুল হয়ে গেছে।”

খানিকক্ষণ চুপচাপই গেল। অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে প্রশান্ত। আশঙ্কাই ছিল, কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে কোথায় ঘা দিয়ে

বসবে, সেটা যে অনাথ থেকেই শুরু হবে ভাবতে পারেনি। নোট-সুদ্ধ হাতটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে চুপ করে বসেই রইল কিছুক্ষণ।

তারপর প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে বুঝল এ দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দেওয়াই ভুল হবে। জানাই দরকার যতটা পারা যায়, আর তার সূত্র অনাথই। জেনে নিয়ে যতটা করতে পারা যায়, নয়তো ব্যর্থ পূর্ব-মর্যাদার যূপকাষ্ঠে বলি পড়বে পরিবারটি। একটা কথা বলেছে অনাথ—সে ডাক্তারের মতো দরাজ বুকে হাত গুটিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু সত্ত সত্ত আবার হাতটা বাড়াতেও মন সরছে না প্রশান্তর।

ছেড়েই দিল ওদিকটা। ওষুধের কথাটা মনে পড়ে গেছে, সেইটে ধরেই বলল—"থাক্ ওসব কথা এখন,তোমায় তো ওষুধটা নিয়ে যেতে হবে। রাতও হয়ে যাচ্ছে, অনেকটা পথ যেতেও হবে।······"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর কাছেই এসেছিলুম—ভাবলুম ইঞ্জিয়ার-বাবুর বাসার সামনে দিয়েই যখন যাচ্ছি······"

চিন্তার স্রোতটা চলছিলই ভেতরে ভেতরে, প্রশান্ত দাঁড়িয়ে উঠল। রজতকে আর আনতে চাইল না আপাততঃ এর মধ্যে, বলল—"ওষুধ তো হাসপাতালে, ডাক্তারবাবু হয়তো নেইও বাসায়, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

ড্রেসিং-গাউনটা টেনে নিয়ে গ্যারেজে নেমে জীপটা বের করল। চাটুজ্যেকে বাসার দরজা বন্ধ করে দিতে বলে, অনাথকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছু যে করতে পারছে, বুকটা যেন ভরে আসছে তাতে। ওষুধটা নিয়ে বাসার দিকে ফিরে আসতে আসতে তেমাথার মাথায় গাড়ি থামিয়েছে, অনাথ নামতে যাচ্ছে, ডানদিকে জেলাবোর্ডের সড়কটা, প্রশান্ত বলল—"দাঁড়াও, নামতে হবে না।"

বাসার দিক থেকে গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে ডানদিকেই চালিয়ে দিল।

ভীতই হয়ে পড়েছে অনাথ, তবে আর্তের অনুগ্রহ লাভ; কি

বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। শেষে যখন বেশ খানিকটা গেছে, ভাবটা সাধ্যমত গুছিয়ে নিয়ে বলল—"ও ইঞ্জিয়ারবাবু, দেবতা হয়েই তো এয়েছেন আমাদের বরাতে, কিন্তন্......"

প্রশান্ত বলল—"যা বলবে বুঝেছি, কিন্তু আমি তো যাচ্ছি না ভেতরে—পারি কখনও যেতে? তোমায় নামিয়ে দিয়ে রাস্তা থেকে ফিরে আসব। না হয় খানিকটা এদিকেই নামিয়ে দোবখন। গল্পে-সল্পে খানিকটা বিলম্বই হয়ে গেল তো তোমার। আরও দেরি হলে জবাবদিহিতে পড়ে যাবে।"

"তাহলে এইখানেই দেন না কেন নামিয়ে, কতটুকুই বা আর?"

"আর খানিকটা যাই।" —কিছু করতে পেরে যে আনন্দের একটা জোয়ার এসেছে মনে তাইতেই যেন ঠেলে নিয়ে চলল।

গাড়িও জোরেই চলেছে। কথার মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। অনাথ চঞ্চলভাবে একটু উঠে পড়েই বলল—"আর নয় ইঞ্জিয়ারবাবু, এসেই তো পড়লুম, শব্দ যাবে মোটরের ..."

"বেশ, তাহলে এখানেই নামো"—বলে প্রশান্ত আস্তে আস্তে গাড়িটা দিল থামিয়ে। দুদিকের অন্ধকারে অত বুঝতে পারেনি, ঐটুকু বলতেও গাড়িটা আবার খানিক এগিয়ে গেছে, থামাতে থামাতে বাড়িটার প্রায় সামনেই গিয়ে দাঁড়াল। অনাথ নামতে নামতেই থমকে গিয়ে ডেকে উঠল—"মা-মণি!"

[সাত]

মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি-শক্তিও খুব স্বচ্ছ নয়, অনাথ বুঝতে পারেনি, তবে প্রশান্ত একটু আগে থাকতে দেখেছিল—একটি মেয়ে এদিকেই আসতে আসতে মোটরের আলো দেখেই ঘুরে গিয়ে রাস্তার ধার দিয়ে হন হন করে আবার সামনের দিকে ফিরে চলেছে। গাঁয়ের কোন মেয়ে হবে মনে করে আর ও-দিকটা ভাবেনি। ও

সম্ভাবনাও তো মনে আসে না। আলোটা এগিয়ে আসছে দেখে ভয়েই ঘুরে গিয়েছিল। তবে সেটা ছিল সঙ্কোচের ভয়। মোটরটা কাছে এসে থেমে আসছে দেখে মেয়েটি অন্য ধরনের ভয়ে প্রায় ছুটেই কয়েক পা গিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তা থেকে, এই সময়টা অনাথের নজরে পড়ল।

ডাক শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে নিশ্চয় একটু সাহস পেয়ে ঘাড়টা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। তখন রাং-চিত্রের বেড়ার একটু আড়ালও হয়ে গেছে।

অনাথ গাড়ি থেকে নেমে এগুতে এগুতে প্রশ্ন করল—"মা-মণি, তুমি ইদিকে কোথা থেকে এসতেছ, এই অন্ধকারে, একা?"

"তুমি মোটরে এলে?" —অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করল স্বাতি।

"হ্যাঁ, এই যে ইঞ্জিয়ারবাবু নিয়ে এলেন, নিজে?" —হঠাৎ পুলকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে অনাথ; এই একটু আগেই কত কথা হয়ে গেল, কত ঘটা করে বলবার সে সব। এই উদ্দীপনার চোটেই একটা ভুলও করে বসল, একটু আগেরই সতর্কতার কথা ভুলে প্রশান্তকেও ডাক দিয়ে বলল—"একটু নামবেন না দয়া-ঘেন্না করে?"

গাড়িতে স্টার্ট দেয়নি প্রশান্ত। সেটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু এই মূঢ় আমন্ত্রণে হঠাৎ মূঢ়ের মতোই কেন যে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল সেটা সে নিজেই বুঝতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অনুশোচনা, সে যেন এককালে শত বৃশ্চিকের দংশনে। স্বাতি বোধহয় সেদিনের সেই ছেঁড়া-সেলাই-করা শাড়িটাই রয়েছে পরে। আজ আর বাবা সামনে নেই আড়াল দিতে, ওকে এগুতে দেখে যেন কি করবে ভেবে না পেয়ে আগাছার ঝোপেই একপা পেছিয়ে গেল।

জড়ভরতের মতো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ে নমস্কার করে প্রশান্ত বলল—"কিন্তু, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে, বিশেষ কাজ আছে।" —যেন ওরই অনুরোধে নেমে এসেছে।

স্বাতি নমস্কারটা ফিরিয়ে দিতেও ভুলে গেল, কিংবা হয়তো শাড়ির কোথাও মুঠিয়ে ধরা থাকা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। উত্তরও যে

দিল সেটা অনাথের কথারই, তারই দিকে চেয়েও ; বলল—"তোমার এত দেরী হয়ে গেল দেখে .... দেখলাম বাবাও ঘুমিয়ে পড়েছেন... তাই ভাবলাম না হয় একটু এগিয়ে......"

"দেরি হয়ে গেল দেখেই আমি বললাম—তাহলে চলো জীপে করেই রেখে আসি!" —সুযোগ পেয়ে সামলাবার চেষ্টা করছে প্রশান্ত। স্বাতি এবার করুণ নেত্রে চাইল তার দিকে, বলল—"আপনাদের কত যে দয়া!"

বেশ ভালো লাগছে অনাথের—সেই জন্যেই কথার বেশ সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে না। একটু অনুযোগের হাসি হেসে বলল—"কিন্তু মা-মণি, তুমি ওঁকে পেন্নামটা করতে ভুলে গেছ, অথচ উনি করলেন। আর ওকি, আগাছার মধ্যে কেন? রেতের জঙ্গল, লতা-পাতা, কত কি সব .... "

বেরিয়ে আসতে হোল স্বাতিকে, উপায় না থাকায় জড়তাটাও কেটে গেছে খানিকটা ; অন্ধকারটাও রয়েছে, তা ভিন্ন অনাথের অন্তরালটুকুও পেল। লজ্জিতভাবে নমস্কারটুকু সেরে নিয়ে বলল—"কিছু মনে করবেন না।"

"সে মনে করবার মানুষই নয় উনি।" —হাসিটুকু ঠোঁটে ধরে রেখে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে পালা করে চেয়ে যাচ্ছিল অনাথ, সান্ত্বনার কথাটুকুতে কি ছিল, ওদের দুজনের মুখেও একসঙ্গেই একটু হাসি ফুটে উঠল। নিশ্চয় উৎসাহই পেল অনাথ, আরও একটা অসঙ্গত কথা বলে ফেলল : বলল—"তাহলে যদি একটু পায়ের ধুলোও দিতেন, এসেই য্যাখন পড়েছেন।"

স্বাতির হাসি-হাসি মুখটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। কাতর দৃষ্টিতে এবারও যেন নিরুপায় হয়েই প্রশান্তর দিকে চেয়ে আরম্ভ করল—

"কী যে ভালো হোত তা'হলে, কিন্তু ....."

"সে আমি জানি। ......তুমিই তো বললে অনাথ, কর্তাকে লুকিয়ে তোমরা দু'জনে পরামর্শ করে নিয়ে আনতে গেছ ওষুধটা, ভুলে

গেলে ? ……আমি তাহলে এখন যাই স্বাতি দেবী। কিছু ভাববেন না ; ওষুধটা খাইয়ে যাবেন।”

“কিছু কথা শোনেন না। কী মুশকিলে যে পড়েছি! জিজ্ঞেস করুন না অনাথ-কাকাকে।”

—চোখটা ছলছল করে উঠল। অনাথ একটু শাসনের টোনেই বলে উঠল—“এই ছাখো, বোকা মেয়ে! আর কাঁদে ? এনারা রয়েছেন।”

মুখটা ওরই ঘাড়ে গুঁজে দিল স্বাতি, প্রায় তখনই আবার তুলে নিয়ে একটু ধরা গলায় বলল—“চলো কাকা, বাবা উঠে পড়বেন।”

এবার নমস্কারটা করতে ভুলল না, তবে হাত তোলার সঙ্গে কথাটা আর উচ্চারণ করতে পারল না। গলাটা ধরে গেছে।

প্রশান্ত বলল—“আপনি কিছু ভাববেন না, আমরা রয়েছি। দরকার পড়লেই অনাথকে পাঠিয়ে দেবেন, তেমন বোঝেন তো কর্তাকে না জানিয়েই। আর……”

কি বলতে যাচ্ছিল, খেয়াল হোল, ও আগে না গেলে স্বাতির যাওয়ার অসুবিধা আছে। আর একবার নমস্কার করে ঘুরল মোটরের দিকে।

ছু'পা গেছে, ঠাণ্ডার জন্যে পকেটে ডান হাতটা চলে যেতেই নোটটা হাতে ঠেকল। একটু দ্বিধা, তারপরই ঘুরে ডাক দিল—“অনাথ একবার আসবে ?”

“আজ্ঞে, এই যে”—এক রকম ছুটেই এল অনাথ।

স্বাতি দাঁড়িয়েই পড়েছিল। ঠিক হয় না মনে করেই হোক বা বাবার উঠে পড়ার ভয়েই হোক, “আমি এগুচ্ছি অনাথ কাকা” বলে এগিয়েই গেল বাড়ির দিকে।

প্রশান্ত মোটরের কাছেই নিয়ে গেল অনাথকে। একবার ঘুরে দেখল স্বাতি সন্তর্পণে দোর খুলে ঘরে প্রবেশ করছে। অনাথকে বলল—“একটা কথা আছে অনাথ, কিন্তু কর্তার কথা তো বাদই দাও, তোমার মা-মণিও ঘুণাক্ষরে জানতে পারবেন না।”

"কথাটা কি ইঞ্জিয়ারবাবু? পেটে সেঁদুলে পেট চিরে ফেললেও কেউ বের করতে পারবে না, এই আপনাকে বলে থুলুম।"

"এই নোটটা রাখতে হবে।" বের করে এগিয়ে ধরল প্রশান্ত, বলল—"আর কিছু নয়, হাতটা খালি থাকা ঠিক নয়। শক্ত না হোক্, অসুখই তো কর্তার একটা।"

"তা দেবেন ছ্যান ইঞ্জিয়ারবাবু। কী যে এ টাকার রিতিহাস!" —নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে বলল—"তা দেন, আমি দাসানুদাস, আমার হাত পেতে নিতে দোষ নেই।"

"কিন্তু তোমার মা-মণি যদি জিজ্ঞেস করে? করবেই তো জিজ্ঞেস।"

একটু ভাবল অনাথ, বলল—"ওষুধ দিলেন, তা কই ডাক্তারবাবুর চিঠেটা তো ফিরে পেলুম না। বলি, দেবেন তো?"

প্রশান্ত বাঁ পকেটে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে প্রেস্‌ক্রিপশনটাও বের করে দিল। বলল—"ঠিক আছে ·····; তাই বোল।"

গাড়ির পা-দানে উঠতে উঠতে ঘুরে বলল—"কাল একবার ওদিকে আসতে পারবে? না হয় বোল—কেমন থাকেন, রিপোর্ট চেয়েছেন।"

"বলবেন—রোগ কোথায় যে তুই ঘটা করে রিপোর্ট দিতে যাবি। মানুষটাকে তো জানেন না। ·· ···তবে, এস্‌বো; এস্‌বো বৈকি। কাল আপনাদের উদিকেই হাট। এস্‌বো বিকেলের দিকে। ···ওকি, পা দুটো যে তুলে ফেললেন। সিচরণের পদরজ তো পেতে হবে একটু। ····· না, না, ভুঁয়ে এসে দাঁড়ান।"

উঠতে যাচ্ছিল, হাসতে হাসতে নেমে ঘুরে দাঁড়াল প্রশান্ত, বলল —"ওর আর কি দাম আছে?

"বেশি আর কি এমন, ধুলোই তো, তবে অনেক ব্যাটার কপালের তেলক-চন্দনের চেয়ে তো বেশি গো।"

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল—ছ্যান।"

ডান হাতটা স্যাণ্ডেল পরা পায়ের নীচে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বুকে কপালে ঠ্যাকাল।

[আট]

প্রশান্ত যে অনাথকে আসতে বলল তা তার কাছ থেকে সব কথা শোনবার জন্যেই। দেখল, যা অবস্থা, অনধিকারচর্চা মনে করে চোখকান বুজে থাকা অন্যায়ই হয় এর পর। আসল ব্যাপারটা না জানলে কোন্ পথে, কিভাবে ওঁদের সহায়তা করা যেতে পারে বুঝতেও পারা যাচ্ছে না। আর, সেদিকে কিছু করতেই হবে যেরকম করেই হোক।

একটা কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই দু'দিনের আলাপ-পরিচয়ে, কর্তা কোন কারণে নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে 'অজ্ঞাতবাস' পছন্দ করলেও অনাথ আর স্বাতি যেন চায় কেউ পাশে এসে দাঁড়াক। স্বাতি অবশ্য অনাথের মত হাত পেতে কিছু নিতে পারবে না, তবে এটা তো স্বাভাবিকই যে পিতার ঐ অবস্থা, এক ঐ অনুগত ভৃত্যের ভরসায় যথেষ্ট বল পাচ্ছে না মনে।

সব জানতে হবে। একটা সুবিধে হোল যে বাপের অজ্ঞাতে মেয়ে আর ভৃত্যের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে, এই বোঝাপড়ার নিভৃতে হয়তো প্রশান্তরও জায়গা করে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

পরের দিনই এল না অনাথ। তবে এলে সুবিধাও হোত না। হেড অফিসের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতে হয়, বাসায় এসেই প্রশান্ত খবর পেল বড় সাহেব বিনা নোটিশেই হঠাৎ তত্ত্বাবধানে আসছেন। তখন থেকেই ঘুরেঘারে সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখতে হোল। তার পরদিনটাও যে তাঁকে দেখাতে শোনাতে কোথা দিয়ে কেটে গেল যেন বুঝতেই দিল না প্রশান্তকে। পরের দিন, পূর্ব দিনের অতিরিক্ত মেহনতের জন্য মনটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকায় স্বাতিদের চিন্তাটাই প্রবল হয়ে রইল মনে। কয়েকবারই মনে হলো—হয়তো অসুখটাই বেড়েছে কর্তার, একবার দেখে আসলে

হয় রজতকে সঙ্গে নিয়ে—কিন্তু কোথা থেকে সেই সঙ্কোচটা এসে পড়তে লাগল—সমর্থ, সুন্দরী মেয়ে, অসুখ আসলে তেমন কিছু ছিলও না তো·······

দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। অফিসে আর গেল না। বাড়িতেই কতকগুলো কাজ নিয়ে বসেছিল, অভিনিবেশ হলো না। তবু লোকের যাওয়া-আসা আছে, টেলিফোনের দৌরাত্ম্য আছে, প্রশান্ত একবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে অফিসে জানিয়ে দিল—তার শরীরটা বিশেষ খারাপ, নিত্যান্ত জরুরী কিছু না হলে কেউ যেন না আসে বা তাকে যেন ফোন না করা হয়।

আরামকেদারায় হেলান দিয়ে চুরুটের ধোঁয়ায় অবিন্যস্তভাবে কি সব রচনা করে যাচ্ছিল নিজের মনে, এমন সময়, ভেতরে দেওয়াল ঘড়িতে ছ'টা বেজে যাওয়ার পর অনাথ হাট-বাজার করবার একটা মাঝারি গোছের থলি হাতে করে উপস্থিত হোল।

প্রশান্ত উঠে বসল চেয়ারটায়, বলল—"এই যে অনাথ এসে গেছ। কর্তার কি খবর? কাল কই এলে না তো?"

"মোটেই ভালো নয়।"—কাল না আসা সম্বন্ধে কিছু না ব'লে শুধু ঐটুকু মন্তব্য করে অনাথ পেতল বাঁধানো লাঠিটা পাশে রেখে উবু হ'য়ে সামনে বসল। বলল—"ভালো মোটেই নয়। কথা হচ্ছে, ব্যাধিটা যেখেনে, সেখেনে তো চিকিচ্ছে হচ্ছে না, তা'হলে ভালো যে থাকবেন তা কি ক'রে সেটুকু বুঝিয়ে বলুন আমায়।"

"কেন, ফল হোল না ওষুধে?"—উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"খেলে কে আপনার ওষুধ যে ফল হবে?···'তোরাও দাঁওয়ে পেয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছিস, বুড়ো বয়েসে আমায় খয়রাতী ওষুধ খাওয়াতে চাস্—সব গেছে, শুদ্ধু দেহটা নিয়েও চিতেয় উঠতে দিবিনি?····"এ কথা শোনার পর আর কে ও ওষুধ খেতে বলবে তা ক'ন আমায়। খবর মোটেই ভালো নয়।"

"তা হলে এক কাজ করো। ডাক্তারকে দিয়ে একটা অন্য ওষুধ লিখিয়ে দিচ্ছি, সস্তা দেখে, নিয়ে যাও হাটের ডিস্পেনসারী থেকে।"

"সে ওষুধ এগিয়ে দেবে কে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে সেটা ক'ন?"

"বুঝলাম না।" বিমূঢ়ভাবে বলল প্রশান্ত।

"বোঝা শক্ত। এই যে এতটুকু থেকে খেদমৎগারি করছি লোকটার, আমিই কি বুঝেছি যে দুটো দিন দেখে আপনি বুঝে নেবেন! ওনার কথা হচ্ছে—এই যে একটা মানুষ ওপরপড়া হয়ে উবগার ক'রে গেল, তার ওষুধ না খেয়ে বাজারের ওষুধ আনিয়ে খেলাম—অপমানের কথা নয় তার পক্ষে? একটা বড় আঘাত দেওয়া হবে না। এই হচ্ছে ওনার কথা—পষ্ট। ও ওষুধও খাওয়া হবে না, খয়রাতী, তাতে দেহ অশুদ্ধ হয়ে যাবে; ওষুধ কিনেও আসবে না। উনি বৌ-রাণীমার মতন শুদ্ধু শরীল নিয়ে চিতেয় উঠবেন, মা-মণি কেঁদে কেঁদে অস্থিচম্মসার হয়ে মরবে, অনাথ আবাগের-বেটার ভাগ্যে জেলে পচে মরা।"

রাগে-বিরক্তিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল অনাথ। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"বৌ-রাণীমা কে ছিলেন, স্বাতি-দেবীর মা?

হাত দুটো কপালে ঠ্যাকাল অনাথ, বলল—'সতীসাধ্বী পুণ্যবতী মানুষ ছেলেন, এ বনবাসে আসবার মাস দুই পরেই তো দেহ রাখলেন। তারপর থেকেই না মেয়েটার আরও ঐ হাড়ির হাল—নিজেও চাইবে না নিজের দিকে, চাইবার লোকও নেই,—নইলে ঐ নাকি মা-মণির রং? ঐ নাকি চুল? ঐ নাকি···" আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল!

একটা কথা বলতে দশটা এসে পড়ে,—বেশ গুছিয়ে একধার থেকে আগাগোড়া সব শুনবে, সে আশা নেই। কথার ফাঁক খুঁজে যাচ্ছে প্রশান্ত; ঐ ক'রে ক'রে যতটা জানতে পারে। প্রশ্ন করল—"এলেন কতদিন এখানে এঁরা? ছিলেন কোথায় আগে?"

"এলেন—আশ্বিনে আশ্বিনে দু' বছর গিয়ে এই মাস। এলেন কোথায় থেকে, বা কি ক'রে, বা কেন, সেটা····"

দ্বিধাভাবেই একটু যেন থেমে যেতে অজ্ঞাতবাসের কথাটা

নে পড়ে গেল প্রশান্তর, বলল—"বারণ থাকে তো না হয় থাক।"

"এই দেখুন, আপনার কাছেও নাকি বারণ থাকবে! ব্যামো হলেও তো ডাক্তারকে বলতে বারণ, কিন্তু তাহলে চলবে? আর চলবে না বলেই তো ডাক্তারবাবুকে নে'যেতে হোল, বলতে হোল সব কথা। আপনাদের তো হবেই বলতে। কেন, যেখানকার কথা সেখেনে কারুর জানতে বাকি আছে যে অত বড় মানুষটা রাতারাতি···"

"থাকই ওটা আজ অনাথ।"—কেমন একটা কুণ্ঠা এসে গেল, টাল-বাহানা করার ভাব লক্ষ্য ক'রে, বলল,—"একদিন তখন সবটুকু শোনা যাবে তোমায় বসিয়ে, আজ আমারও হাতে কাজ রয়েছে, সময় নেই। তবে একটা কথায় মনে বড় খটকা লাগল, যদি মানা না থাকে····"

"কথাটা কি? আপনাকে বলব, তা মানা থাকলে শুনছেই বা কেটা? আপনি একেবারে দেল খোলসা ক'রে জিজ্ঞেস করুন না।"

"ঐ যে তুমি তখন বললে না—তোমায় জেলে পচে মরতে হবে?"

"হবে না মনে করছেন?"—ন'ড়ে-চড়ে, লাঠিটা আর একটু সরিয়ে রেখে গুছিয়ে বসল অনাথ, বলল,—"তাহলে সবটা শুনুন অবধান ক'রে, তারপরেও যদি মনে করেন, দেশে আইন নেই, সিঁদ কেটেও ফাঁকি দিয়ে দিব্যি খাঞ্জা খাঁ নবাবের মতন হাওয়া খেয়ে বেড়ান যায়, তাহলে তাই। কিন্তু তা হবে না এটা আপনাকে নিকে দিতে পারি। একবার চাপা দিলেন, ছুবার চাপা দিলেন, তারপর একদিন ধম্মের কল বাতাসে নড়বেই, আপনি চাপা দিতে চান, অন্যের নজরে যাবে পড়ে, দারোগা-সেপাই ডেকে·নে'সবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি, সঙ্গে সঙ্গে জেল। বলুন এ কথার নড়চড় আছে?"

"তা তো নেই, কিন্তু এমন গর্হিত কাজ করতেই বা যাবে কেন?"

"না করে উপায় কি বলুন?"

"চুরি করবে—সিঁদ-কেটে!"—রহস্য পরিষ্কার হবে কি, আরও যেন গুলিয়ে দিচ্ছে মাথা।

"তার মধ্যে মা-মণিও রয়েছে, দু'-জনের যোগসাজস করেই কাজটা করা তো। সে কথা যদি বলি দারোগাকে, মা-মণিও সাক্ষী দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমারও যোগসাজস ছেল, তাহলে হয়তো খালাস পেয়েও যেতে পারি, কিন্তু ওনার নামটা তো আর পাপ মুখ দে' বের করা চলে না। চলে তো তাও বলুন।"

স্তম্ভিত হয়ে গেছে প্রশান্ত ভেতরে ভেতরে। এমন একটা অবস্থা, আর একটুও এ প্রসঙ্গ বাড়াতে গেলে কী শুনতে হবে ভেবে পাচ্ছে না। হুঁস হোল, চুরুটটা নিভে গেছে। দেশলাই জ্বেলে আবার অগ্নিসংযোগ করতে করতে একটু ভেবে নিল, তারপর এই বিরতিটুকুতে ওদিকটা যেন ভুলেই গেছে, এইভাবে ধোঁয়ার আড়ালে ভ্রূদুটো কুঁচকে বলল—"ছ্যাখো! তোমায় কেন যে ডেকেছিলাম ভুলেই গেলাম। শীতকালের বেলা, দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে তোমার হাটবাজার করবার। আবার এতটা পথ। তাহলে না হয় আজ......."

"তা হোক দেরি, হাটসুদ্ধ তো কিনে নিতে যাচ্ছিনে।" আবার নড়েচড়ে বসল অনাথ, বলল—"অবিশ্যি হাটসুদ্ধও কিনেছে এই লাহিড়ী বংশেরই লোক। কর্তার বাবাই। হাটের দখলদারি নিয়ে একসময় তাঁনাদের শালা-ভগ্নীপতের মধ্যে খুব একচোট চলেছিল মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কী নয়? খেয়ালী মানুষ, একদিন কি মনে হোল, পাত্র-মিত্র নিয়ে হাটে গিয়ে উপস্থিত। কর্তা আসবেন, খবরটা খুব চারিয়ে গেছল। এনারাও গাড়ি থেকে নেমে হাটে ঢুকেছেন, পেয়াদা-বরকন্দাজ রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে চলেছে, অন্য দিক থেকে সম্বন্ধী সাণ্ডেলমশাইও এসে উপস্থিত—তাঁনার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। মাঝামাঝি এসে কাছাকাছি হতেই—শালা-ভগ্নীপতে তো কথাবার্তা নেই ত্যাখন,—ওদিক'কোর একজন এদিক'কোর একজনকে রুদ্দেশ করে বললেন—'স্যাণ্ডেলমশাই

জিজ্ঞেস করছেন, আজ লাহিড়ীমশাই স্বয়ং স্বশরীরে হাটের পাহারাদারি করতে এলেন নাকি ?" এদিক'কোর মোসায়েবদের মধ্যে ছিলেন বটকেষ্ট দত্তমশাই, অমন মুখফোড় লোক ভূ-ভারতে হয়নি। কথাটা না পড়তে পড়তে বললেন—'স্যাণ্ডেলমশাই নাকি কুটুম্বিত্তের জোরে আপনিই হাটের 'তোল্লা' আদায় করতে আসবেন শোনা গেল, তাই কত্তাকে নিজেই আসতে হোল বেত হাতে করে পাহারা দিতে।'···মুখের মতন জবাব তো একেবারে, 'তোল্লা' হোল মালিকের পেয়াদা হাটের দোকানীদের কাছ থেকে বেসাতির খানিকটা করে যা আদায় করে—আলু, বেগুন, শাক, বেনে-মশলা—যা এল বাজারে, মায় গুগলি-খুঁচোচিংড়ি, শুঁটকি মাছ পর্যন্ত। মুখের মতন জুতো, কত্তা কি বকশিষ করবেন—আবার জানান্ দিয়ে করা চাই তো বকশিষটা—বললেন,আজকের হাটের তাবৎ মাল তিনি কিনে নিয়ে মোসায়েবদের দিয়ে দিলেন ; আদ্দেক হিস্যে দত্তমশায়ের, যিনি জবাবটা দিলেন, আদ্দেক বাকি সবাই ভাগাভাগি করে নেবেন। অবিশ্যি মাল কি ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে সবাই ? —হিসেব করা হোল, তিনি দামটা দোকানীদের দিয়ে দিলেন, তারা সেটা এনাদের হাতে তুলে দিলে, আবার যেমনকার খরিদ-বিক্রী তেমনি চলল। চারিদিকে রব উঠে গেল, লাহিড়ীমশাই হাট কিনে দান করেছেন, দত্তমশাই স্যাণ্ডেলমশাইয়ের মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়ায়।"

চেয়ে রইল প্রশান্তর মুখের দিকে। একটা কিছু বলা দরকার বলেই প্রশান্ত মন্তব্য করল—"জমিদারি মেজাজ।"

অনাথ বলল—"কতকটা ঠিক, আবার কতকটা ঠিকও নয়। কথাটা হচ্ছে, জমিদার হলেই কি মেজাজ হয় ? কেন, জমিদার তো স্যাণ্ডেলমশাইও ছিলেন, কৈ, খুঁজেপেতে একটা লাগসই পাল্টা জবাব দিতে পারলেন না তো। ট্যাকা রয়েছে, দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে হাজারটা রাস্তা ছেল। তা নয়, যেমন ট্যাকা থাকবে, তেমনি আবার এইটেও থাকা চাই তো।"

বুকের মাঝখানটায় ডান হাতটা চেপে কথাটার টীকা করল অনাথ। প্রশান্ত বলল—"সে কথা একশ'বার।"

সেই ভয়টা লেগে রয়েছে, প্রশ্ন করল—"তাহলে আবার কবে আসছ ?"

মনে হোল কথাটা যেন কানেই যায়নি অনাথের। একঝোঁকে মনিবদের পূর্ব গৌরবের কথাটা বলে এসে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বুকটা জোরে ওঠানামা করছে। একটু চেয়েই রইল স্থির-ভাবে, তারপর মুখের দীপ্তি আবার নিভে এল। বলল—"সেই কথাই কইছিলুম। বলি, আজই না হয় তালপুকুরে আর ঘটি ডোবে না, কিন্তু চেরকালটা তো আর এইরকম ছেল না। তা সেই লাহিড়ী বাড়ির বৌ য্যাখন বাড়ি থেকে বার হলেন সোয়ামীর হাত ধরে, ঐ দুধের মেয়ে সঙ্গে নিয়ে, ত্যাখন সম্বল তো মাত্র গায়ে যে হাল্‌কা পাঁচখানি গয়না ছেল, তাই।

"বল কি!" —কথাটা বলে মুখে আর কথাই যোগাল না খানিকক্ষণ; তারপর আবার প্রশ্ন করল,—"তা আসতেই বা হোল কেন ঘর ছেড়ে সবাইকে ?"

"কাহিনীটে তো দীগ্‌ঘ। ইদিকে আপনি আবার বলছেন হাট-বাজার করগে যা। য্যাখন এলেন ত্যাখন অবিশ্যি একদিনের লুটিসেই আসতে হোল, তবে যে ব্যাপারের জন্যে লুটিস সেটা তো একদিনেই হয়নি। সেটার গোড়াপত্তন হোল সেইদিনই যেদিন এনার বাবা বড়কত্তা লাহিড়ীমশাই চোখ বুজলেন। চোখ বুজতেই অবিশ্যি সবার আসা পিরথিমিতে—তাঁনার বাবাকেও বুজতে হয়েছিল, আপনিও বুজবেন একদিন, আমাকেও যম রেহাই দেবে না। তবে ওঁনারা চোখ বুজবার কালে যেমন উপযুক্ত লোকের হাতে ওনাদের ধন গচ্ছিত রেখে গেলেন, লাহিড়ীমশাই মারা যেতে সিটি তো হতে পেল না। একেবারে অপদার্থ মানুষের হাতেই তো পড়ল জমিদারিটা।"

"কেন, স্বভাবের দোষ-টোষ…"

"আপনি যে হাসালেন।" —ওরূপ বিবরণে যে কথাটা আগেই মনে আসে সেই কথাটাই আরম্ভ করেছিল প্রশান্ত, অনাথ বাধা দিয়ে একটু হেসেই উঠল, বলল— "রাজার ছেলের ও দোষে তো রাজ্য যায় না। যাতে যায়, যাতে গেল, সেই দোষটা ক'ন থেকে ঢুকেই না জেরবার করে দিলে একেবারে। বলি, পুঁথি-কেতাব নিয়ে পড়ে থাকলে কি রাজ্য চালান যায়? অথচ এঁনার সেই রোগ ঢুকল একেবারে সেই ছেলেবেলা থেকে। বড়কত্তা য্যাতদিন বেঁচে ছিলেন ত্যাতদিন না হয় চলল, উনি গতাসু হওয়ার পরও যে সেই সুধু বই আর বই, তাইতেই কাল হোল কিনা। সব ব্যবস্থা গিয়ে পড়ল কর্মচারীদের হাতে, মাথার ওপর কেউ নেই, তারা নিজের নিজের আখের ক'রে নেবে না তাল বুঝে? আস্তে আস্তে আদায়-পত্র কমে এল, এমন কি লাটের টাকা যোগাতে দু'একখানা মহালও বাঁধা পড়ল, কোন হুঁস নেই। হুঁস হবে কি, এই সময় মা-মণিরও একটু নেকাপড়া করবার মতন বয়েস হয়ে এয়েচে ইদিকে, উদিক থেকে একেবারে নজর ফিরিয়ে তাঁনাকে নিয়ে পড়লেন। বইয়ের পাট যে লাহিড়া বাড়িতে ছেল না, তা নয়, এতবড় পুরতন জমিদার বংশ, বইয়ের পাট থাকবে না একেবারে, সে কি কথা! সায়েব বাড়ি থেকে আমদানি করা ভালো ভালো আলমারিতে সোনার জলে বাঁধানো মোটা মোটা বই সব—ইঞ্জিরি, বাংলা, সংস্কেত, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে। তা দেখুন না লয়ান ভরে কত দেখবেন, কিন্তু সেসব তো কখনও নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে নেমে এসে অঘটন ঘটায় নি। এঁনার সময় তাই হোল।"

ঠাকুর চা নিয়ে আসতে অনাথকেও এককাপ চা দিয়ে যেতে বলল প্রশান্ত। বাইরে গিয়ে সেটুকু একচুমুকে নিঃশেষ করে আবার এসে যথাপূর্ব বসল অনাথ। আরম্ভ করে দিল—"আলমারির বাইরে পিরথিমিটে কি রকম তা একখানি বইয়েও জানত না, কত্তার টাইমে এক উঠছে তো এক নামছে, লাইবুড়ির ফরাসে বইয়ের গাদা—মা-মণি বড় হয়ে উঠতে আরও সমারোহ—চাপাই পড়েছেন বইয়ের গাদায়

দুজনে। শুধু দুজনেই বা কেন, সারা জমিদারিটাই বলুন না। —এই য্যাখন অবস্থা যাচ্ছে, সেই সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন রায়মশাই এসে উপস্থিত। ……অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ, তা হবে বৈকি—প্রায় চোদ্দ-পনের বছর পরে।

কত্তার প্রাণের বন্ধু। এর আগে, কত্তা য্যাখন কালেজে পড়ছেন কলকাতায় থেকে, লাহিড়ীমশাই বেঁচে, সেই সময় ওঁনার যাতায়াত ছেল। কত্তার যা নাম ওঁনার তাই নাম, তাইতে ওঁনারা স্যাঙ্গাৎ বলেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতেন, খুব হ্যালায়-গলায় দুজনে, কত্তার মতনই পড়াশোনার ঝোঁক, য্যাখন আসতেন মাসকে মাস থেকে যেতেন। আবার এই বছর পনের পরে হঠাৎ এসে উপস্থিত।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া, উনি এসে এক নতুন ফ্যাচাং তুললেন, ব্যবসা করতে হবে। কলকাতার উদিকে খবর রটেছে, জমিদারি আর রাখবে না সরকার বাহাদুর, আইন করে কেড়ে নেবে, উদিকপানে যাত জমিদার তাঁনারা নাকি জমিদারি বেচে ঐ কম্ম করছে, বাঁচতে চান তো কত্তাকেও তাই করতে হবে আইন হয়ে যাবার আগে। জপাতে লাগলেন ক'দিন ধ'রে। ওঁকে আর জপানো কি, জমিদারি কী আচে, কতটা আচে, যায় তো এমনি যায়, কি, ব্যবস্থা করতে যায় এসব বাজে কথা নিয়ে ওঁনার তো ভারি মাথাব্যথা। তবে নায়েব-গোমস্তাদের গরজ ছেল বৈকি, গেলেই তো তাঁনাদের রুজি গেল, তাঁনারা উল্টোদিকে টানতে লাগল। খবরটা যে সত্যিই ছেল সেটা তো পরে টেরই পাওয়া গেল, তবে ও সব অঞ্চলে যে একটু কানাঘুষো উঠেছিল, এনারাই কিছু নয় কিছু নয় বলে চেপে-চুপে রাখছেল। মোদ্দা কথা, শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল যে নগদ টাকা যা বের করতে পারা যায় তার সঙ্গে ত্যাখনকার মতন একটা ছোট মহাল বেচে যা পাওয়া যায় সেই টাকাটা মিশিয়ে ব্যবসায় নামতে হবে। আপাতত পরীক্ষে হিসেবে। বেশ ক'দিন রইলেন রায়মশাই, আর একটা মহাল গেল, তারপর টাকা-কড়ি গুছিয়ে নিয়ে দুই স্যাঙ্গাতে

কলকাতায় চলে গেলেন। সেইখেনেই নিজে হতে বুঝেসুঝে দেখবেন সব, সেইখেনেই দস্তাবেজ সব তোয়ের হবে।

ব্যবসা ইস্‌টার্ট করে দিয়ে দিন পনের পরে কত্তা আবার লাইবুড়িতে এসে ঢুকলেন মেয়েকে নিয়ে। তাকে ব্যবসা বলব কি একটা রাঘববোয়াল বলব আজ অবধি তো থির করে উঠতে লারলুম ইন্‌জিয়ারবাবু। রায়মশাই মাঝে মাঝে আসেন, টাকা নিয়ে যান, ব্যবসা নাকি হু হু করে চলেছে, আরও ফলাও করবার জন্যে আরও পুঁজি দরকার—এই করে করে বছর কয়েকের মধ্যে য্যাখন আর কিছু রইল না বিশেষ, এই সময় শোনা গেল সত্যি আইন হয়ে যাচ্ছে ; তারপর গেলও। যা ছেল সরকার বাহাদুর সব কেড়েকুড়ে নিলে, কত্তদিনে কত করে কি সব খেসারৎ দেবে নাকি। তা কি পেলেন, কবে পেলেন, বা কখনও পাবেন কিনা কিছু জানিনে। নফর মানুষ, অতটা তো কিছু বুঝিও না, শুধু দেখছি চারিদিকে যেন লুট পড়ে গেছে, আর অমন যে বোল-বোলাও—হিসেব করে দেখতে গেলে তিন পুরুষ থেকে তো দেখে আসছি—তা যেন কপ্পুরের মতন উবে গেল আস্তে আস্তে।

জিজ্ঞেস করবেন—তা ব্যবসা ফলাও হয়ে উঠেছে, যেমন ইদিকে যাচ্ছে তেমনি আবার উদিকে আমদানিও তো হচ্ছে। কি জানি ইন্‌জিয়ারবাবু, হলে তো ভালই ছেল। শুনতুমও তো অমুক অমুক জমিদার এই করে নাকি আগে থাকতে সাবধান হয়ে ঘর সামলে নিয়েছে নিজের নিজের। ভালই তো। নিজে বই নিয়ে আছেন, বন্ধু এসে পরামর্শ দিলে, ব্যবসা দিন দিন ফলাও হয়ে উঠেছে, মন্দ কি করে বলি? কিন্তু—সে আাম বাইরে কান পেতে থাকতুম ইন্‌জিয়ারবাবু, রায়মশাই য্যাখন এসতো—তা কখনও ট্যাকা গুণতে দেখলুম, কি নোট—খাজাঞ্চিখানায় এককালে দেখেছি তো—তা তো পাপ চক্ষুতে পড়ল না। এলেই গুজগুজ, ফুসফুস—তাই থেকেই কান পেতে শুনে যা টের পেতুন তা এই যে, লাভের অংশ এখন নিজেরা না নিয়ে ব্যবসাতেই ঢালা হচ্ছে। উনিও নিচ্ছেন

না এক পয়সা, ইনিও না নেন সেইটেই চলতি ব্যবসার পক্ষে নাকি ভালো। আর দেখতুম যাওয়ার আগে কি সব কাগজ-পত্রে দস্তখৎ দিচ্ছেন কত্তা। এসবই লাইবুড়ি ঘরে হোত। ওটা দেউড়ির একটেরেয়, কাজের কথা য্যাখন হোত মা-মণিকে সরিয়ে দেওয়া হোত। দুধের মেয়ে করতই বা কি থেকে তা বলুন।

আজ্ঞে না, ফলাও ব্যবসার ট্যাকা এল ঘরে, উঠল লোহার সিন্দুকে, চম্মচক্ষুতে এ দিশ্য কখনও দেখলুম না। সেরেস্তা উঠেই গেছে—দেউড়ি করছে খাঁ-খাঁ—ভেতর বাড়িতে গেলুম তো বৌ-রাণীমার মুখ শুকনো। আপন বলতে তো সতীলক্ষ্মী ঐ একাই—তা কি বুঝতেন না বুঝতেন জানিনে, কিন্তু মুখ ফুটে তো সোয়ামীর কথার ওপর কোন কথা বলেন নি কখনও। আত্মীয়-কুটুমের যাওয়া-আসা কমে এয়েছে—সুখের পায়রাই তো সব, কিছু পুষ্যি দেউড়ি আঁকড়ে পড়ে আছে—তা আত্মীয়ই হোক বা পুষ্যিই হোক, কারুর মুখের আগেকার সেই জলুষ নেই—একটা যেন আতঙ্ক, কি হবে! কি হচ্ছে! জলুষ যদি দেখতে হয় তো কত্তার মুখে দেখুন আর মা-মণির মুখে দেখুন।”

ধুঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে শুনছিল প্রশান্ত, একটু চকিত হয়েই ঘুরে চাইল।

অনাথ বলে চলল—“আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশেষ করে শেষের দিকে, সব য্যাখন একেবারে ফাঁকা হয়ে এসেছে। আগে উদিকে দুজনেই ছিলেন নিব্বিকার-নিব্বিরোধ, কত্তা স্বয়ং ভোলানাথ মহাদেব, মা-মণি তাঁর কন্যে সাক্ষেৎ সরস্বতী-ঠাকরুণ—নিজের তালেই আছেন, দুনিয়াটার কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোন হুঁস নেই। শেষের দিকে, ঐ যে বললুম, য্যাখন একটার গায়ে একটা সব্বনাশ এসে পড়ে অবস্থা একেবারে কাহিল, সেই সময় দেখা গেল মানুষ দুটো একেবারে মাটির পুতুল নয় নেহাৎ, সাড় আছে। জিজ্ঞেস করবেন ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার আর কিছু নয়, মা-মণি পাশের পড়া পড়ছেল, বাপে-বেটিতে তাই নিয়ে এতদিন মজ-গুল ছেল, সেই পাশ

দিয়েছে। তা নাকি আবার এমন যে—মা মণি তো বাড়িতেই বাপের কাছে পড়েছে, ইস্কুলে পড়েও সে রকম পাশ কেউ দিতে পারে না। তা সে দেখবার মত ইন্‌জিয়ারবাবু, কটা দিন সেই কী হাসি যে দেখেছিলুম, বিশেষ করে মা-মণির মুখে, তা পূর্ব্বেও কখনও দেখিনি, আর পরেও কখনও....”

বলতে বলতে মুখখানা আলো হয়ে উঠেছিল, যেন সেদিনকার আলোতেই, হঠাৎ যেন নিভে গেল। অনাথ বলল—“আর হাসি দেখলুমই বা কবে বলুন। মা-মণির মুখে বলতে গেলে সেই তো শেষ হাসি। কলকাতায় এসে এর পরেও তো পাশ দিলে একটা, এবার বাড়িতে কত্তানশাই, বাইরে কলেজ, এবার তো ফাষ্টো হয়েই পাশ দিলে—দেখলুম তো সিদিনকের মুখও।........কত্তার অবিশ্যি সেইভাব—প্রেথম পাশের বেলায় কত্তার হাতের একটা আংটী গেছল, এবার আর একটা আংটী বেচে দান-খয়রাতও হোল, কিন্তু মা-মণি তো আর সে মা-মণি নেই। প্রেথম পাশ দেবার মতন না হলেও আত্মীয় কুটুম আর দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব ডেকে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছেল। সেই হিড়িকেই সমস্ত দিনটা এক রকম গেল কেটে। সন্ধ্যের পর সবাই চলে গিয়ে বাড়ি খালি হয়ে যেতে কি একটা দরকারে ওনাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি ছাতের রেলিঙের ধারে উদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ গিয়ে পেছনে দাঁড়িয়েছি তো, ডাক দিতে—ওমা এযে কাঁদছে!.......‘বলি, কান্না কিসের মা-মণি, এমন সুখের দিন?’- বলতে না বলতেই উল্টে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কচি মেয়ের মতন ফুলে ফুলে......”

অনাথ হঠাৎ মুখটা দুটো হাতে ঢেকে একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কেঁদেই চলল খানিকটা মাঝে মাঝে বুকের ভেতর থেকে—‘ওফ্-ওফ্’ শব্দ আর, ‘কী দেখতে বেঁচে আছি—কেন গেলুম না আগে?’ একটু সামলে নেওয়ার পরও চুপ করে বসেই রইল খানিক্ষণ, তারপর চোখদুটো গামছার খুঁটে ভালো করে মুছে নিয়ে বলল—“কথাটা বুঝলেন না? অবিশ্যি কতদিনই বা বাড়ি ছেড়ে

কলকাতায় এসেছে, বছর দুই মাত্তোর ; কিন্তু এই বছর দুইয়ে অনেক কিছু যে দেখলে, দুধের মেয়ে যে দেখে দেখে বুড়ি হয়ে গেল ইন্‌জিয়ার-বাবু। জানে তো এ দান খয়রাৎ আর ভোজের রিতিহাস—এ মা-সরস্বতীকে ঘরে আনতে সাতপুরুষের মা-লক্ষ্মীকে যে কি ক'রে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে হোল, এটাতো আর বুঝতে বাকি নেই ত্যখন। আগের পাশের দিনের মতন নেচে-কুঁদে বেড়াবে কি, চোখের জলে ছাদ ভেজাচ্ছে ভরসাঁঝের বেলায়। সে বুকে জড়িয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে কি থামানো........

"হ্যাঁ মনে পড়ে গেল,—একটা কথা তুমি ছেড়ে এসেছ অনাথ।—তখন কি যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি আর তোমার মা-মণি—দু'জনে যোগ-সাজস করে ..."

হঠাৎই মাঝখান থেকে কেন যে প্রশ্নটা করে বসল প্রশান্ত তা সেই জানে। অনাথ বললে—"সেই কথাতেই তো আসছি ইন্‌জিয়ার-বাবু, ওদিক থেকে একটু গোড়া বেঁধে না নিয়ে এলে কিসের ওপর কি হোল সঠিক বুঝতে লারবেন তো। এবার আবার সেই প্রেথম পাশের দিনের কথা বললেই সব হদিস পেয়ে যাবেন। দুটো পাশ দিতে হাতের আর একটা আংটী বেচে খাওয়া-দাওয়া দান-ধ্যান হোল তো, প্রেথম পাশের সময় যেটা যায় সেটা ছেল ভালো হীরের আংটী একটা। আর ত্যাখন দেশেরই বাড়ি, সামান্য ইদিক-উদিক কিছু রয়েছেও—ঘটাটা বেশ রাজসুয় গোছেরই হয়েছেল উরই মধ্যে ; লাহিড়ী বাড়ির মেয়ে পাশ দিলে যেমন হওয়া উচিত—অবস্থা ছাড়িয়েও। তবে লাহিড়ী বাড়ির সেইটেই শেষ কাজও।....আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। তালপুকুরে তখন জল শুকিয়ে এসে তলার পাঁক দেখা দিয়েছে। বাড়িটি ছাড়া আর কিছু নেই, তারও মেরামতের অভাবে আর ছিরি-ছাঁদ নেই কিছু। সবার মনটা খাঁ-খাঁ করেছে সব্বদা। কর্তারও বৈকি, য্যাতই কেন আপন-ভোলা মহাদেব হোন, কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িছে, পড়ছেই তা চোখে। যজ্ঞিটুকু হয়ে যেতে আরও যেন মনে হোল জায়গাটা গিলতে আসছে। এই সময় ঠিক

তাক বুঝে একদিন রায়মশাই কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত। যজ্ঞিতে নেমতন্ন গেছল বইকি, যাবে না ?—একেবারে কত্তার ডান হাত, কী রকম বুদ্ধি খাটিয়ে সামলে রেখেছেন উদিকটা! নেমতন্ন ঠিকই গেছল, তবে ঠিক সেই সময়টা নাকি কাজের খুব বেশি চাপ পড়ে গেছে, আসতে পারেন নি। ক'দিন বাদ দিয়ে এলেন।

এসে দেখেশুনে সলা দিলেন—এ ছিবড়ে নিয়ে পড়ে থেকে আর কি হবে, কলকাতায় চলে আসুন। সেখেনে ব'সে নিজের ফলাও কারবার নিজের চোখে দেখাশোনা করতে পারবেন। ইদিকে মেয়েটা ভালো, তাকে পছন্দ মতন ভালো কলেজে দিতে পারবেন। কথাটা সংগত, কত্তা রাজি হলেন, কবেই বা গররাজি হয়েছেন ওঁনার কোন্ কথায়? বৌ-রাণীমা তো এ গাঁ, এ দেউড়ি ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে পেলেও বত্তে যান। তাই হোলও।"

অনাথ হঠাৎ আবার ছেড়ে দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল প্রশান্তর মুখের দিকে। প্রশান্ত তেমনি বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুনছিল, বিরতিটুকু বিলম্বিত মনে হওয়ায় ঘুরে চেয়ে বলল--"তারপর? ·······ও! কিছু বলবে আমায়?"

আরও যেন কেমনধারা হয়ে গেল অনাথের মুখটা। একটানা দ্রুতই বলে আসছিল, কণ্ঠের লয় বদলে দিয়ে বলল—"হ্যাঁ, ইন্জিয়ার-বাবু বলব একটা কথা। মা-মণি সুবিধে দেখে আপনাকে বলে দিতে বলেছেন স্মরণ ছেল না, আচমকা মনে পড়ে গেল। কথাটা হচ্চে—ইয়ে—মানে, আপনি যিদ্দিন পেরথমে আমাদের বাড়ির এসেন, সেই পেল্লায় ঝড় বাদলের রেতে—কত্তা—ইয়ে—মানে, একটু যেন—কী যে বলি···· ..."

"হ্যাঁ অনাথ, মনে হয়েছিল যেন—যেন পছন্দ করেননি তিনি আমাদের আসাটা ...."

—কথাটা মুখ দিয়ে বের করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না বলেই প্রশান্ত নরম করে বলে দিতে অনাথ একটু এগিয়ে ওর পাদুটো চেপে ধরল, কাতরস্বরে বলল—"ওটুকু ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে ভুলে যেতে হবে

ইন্‌জিয়ারবাবু, মা-মণি ব্যাগাতা করে বলেছে, যেতেই হবে ভুলে। দেবতা-মানুষ কত্তা—সে আপনি হু'দিন যাওয়া-আসা করলেই···"

"ও কি করছ অনাছ, ছিঃ!" ঝুঁকে হাত ছুটো ছাড়িয়ে নিল প্রশান্ত, বলল—"সেটুকু কি আমায় যাওয়া-আসা ক'রে বুঝতে হবে? কেন, সেদিনই কি টের পাইনি? দেখলুম কোন কারণে—হয়তো ওরকম ঝড়-বৃষ্টির জন্যেই—একা মানুষ—মেয়ে সঙ্গে·······"

"ঐ ঝড়-বৃষ্টিই ইন্‌জিয়ারবাবু, আর কিছু নয়। ঐ রকম পেল্লায় ঝড়-বৃষ্টি—তা এমনি আপন মনে হয়ে যাক না, গেরাহ্যি নেই, গুছিয়ে-গাছিয়ে বরং আরও চাড় ক'রে মা-মণিকে নিয়ে পড়াতে বসেন—ছিষ্টি রসাতলে যাক না কেন, গেরাহ্যি নেই—কিন্তু তার মধ্যে কেউ যদি এল-গেল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এলেও আবার গেলেও—তো আর মাথার ঠিক থাকে না। এমনি তো তার কারণ হয়েছেল কিনা। প্রেথম পাশের যজ্ঞির ক'দিন পরে সেবারে যে রায়মশাই এল, ঠিক সিদিনকার মতন ঝড়-বাদলের দিন—বন্ধুই, কিন্তু শেষ আঘাতটা দিতে শত্তুরই হয়ে তো ঢুকল ঘরে—তারপর যিদিন বেরুলেন শেষবারের মতন সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সিদিনও—ভালোই ছেল আকাশ, হঠাৎ ঈশেন কোণ থেকে মেঘ এসে কী রসাতল কাণ্ড! বেরুবার ইচ্ছে ছেলনা কত্তার—সে কুক্ষণে না বেরুলে হয়তো উল্টেও যেত পাল্লা—কিন্তু রায়মশাই জিদ করে বসল—কে জানে জপিয়ে-জাপিয়ে ঠিক করে এনেছে, আবার যদি বদলে যায় মন। বিষ্টি নয় ইন্‌জিয়ারবাবু, ওপর থেকে কত পুরুষের তানারা যেন ঘড়া-ঘড়া চোখের জল ফেলছে তারই মধ্যে--উফ্! তারই মধ্যে ইন্‌জিয়ারবাবু, বৌ-রাণীমার আর মা-মণির হাত ধ'রে······"

আবার ভেঙ্গে পড়ল অনাথ। প্রশান্তও অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, একটু চুপ করে থাকার পর বলল—"স্থির হও অনাথ, কেঁদে তো ফল নেই। তোমার মা-মণিকে বোল, আমি সে কথা মোটেই ধ'রে বসে নেই, আর সেই রাতেই তো দেখলাম, ওঁরা কত ভালো, কত বড়। চুপ করো তুমি।"

অনাথ গামছার খুঁটে চোখ ছুটো মুছে নিয়ে একটু চুপ ক'রে বসেই রইল, তারপর আবার আরম্ভ করল—"সেই থেকে কলকাতার বাড়িতেও কেউ যদি এই রকম ঝড়-বাদলে এসে পড়ল, কিম্বা বারান্দা-টুকুতেই উঠে দাঁড়াল তো এই রকম হ'য়ে যেতেন। অবিশ্যি যাখন টের পেলেন বন্ধু কী সব্বনাশটাই করেছে। মানুষটা এমনি সত্যিই সদাশিব ইন্‌জিয়ারবাবু, তবে আঘাতটা তো দারুণ, কালেজার মধ্যি কোথায় ঘা দিয়েছে কে জানে ?

কাহিনী দিনকের দিন ধ'রে বলতে গেলে বছর কাবার হয়ে যাবে, অল্পটুকু নয় তো। সংক্ষেপেই বলি। কলকাতায় ওনাদের ভাগে খানতিনেক বাড়ি ছেল ; তার ছুটো ভাড়ায় খাটত, একটা খালি পড়ে থাকত—গাঁ থেকে কেউ এল-গেল তো রইল,—মামলা-মোকদ্দমা আছে, কলকাতা বেড়ানো আছে, আগে এইসব ছেলও তো। গিয়ে সবাই উঠলেন সেই বাড়িতে। সবাই মানে, সব বাদ-সাদ দিয়ে আমরা পাঁচজন আর কি, কত্তা, বৌ-রাণীমা, মা-মণি, আমি বাতাসীর মা, অধীনের পরিবার। সে বিবাহ হয়ে ইস্তক এই বাড়িতেই তো বৌ-রাণীমার খাস্ দাসী হয়েছেল। মেয়েটা অনেকদিন আগেই যায়, ছুভ্‌ভোগের কপাল নয় আর কি, মাগিও কলকাতায় এসে বেশিদিন টিকল না।

কলকাতায় এসে একদিন রায়মশাই আফিস ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন কত্তাকে মোটরে ক'রে। বাড়ি ছেড়ে আসায় যে খানিকটা মুসড়ে পড়েছেলেন, আফিস ঘুরে এসে আবার ছুটো দিন যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তবে ঐ ঘুরে আসাই সার। খুব নাকি বড় আফিস —কর্মচারী-পেয়াদায় গীজগীজ করছে। তা করুক, কিন্তু এক পয়সা আয়ের সঙ্গে তো সম্পর্ক নেই। সংসার চলে, কিছু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা এনেছিলেন, তারপর ছুটো বাড়ির ভাড়া, যা এক রকম বন্ধই হয়ে গেছল। আদায় করবার লোক নেই, ইদিকে কত্তাও দেখেন না— সেই ভাড়াটা ঠিক মতন আসতে লাগল, তা বাকি-বকেয়া সমেতই। তবে মনে করেছেন কত্তা এসে পড়তে নাকি ? রামঃ! কত্তা আবার

সেই মেয়ের স্ন্যাকাপড়া নিয়ে পড়েছেন, ঐ করতেই তো আসা। মা-মণি কালেজে যাচ্ছে, বাপে-বেটিতে বই নিয়ে রয়েছেন মেতে, চাল-ডাল-দুধ-কয়লার মতন তুশ্চু বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করতে যাবেন! যদি জিগোন তাহলে আদায়-পত্তর হ'তে লাগল কি ক'রে তো বলব এই লাঠিটুকুর জোরে।"

অনাথ শক্ত করে পেতল-বাঁধানো লাঠিটা একবার মুঠিয়ে ধ'রে হাতটা নেড়ে দিল। একবার গোঁফ জোড়াটার ওপর দিয়ে বাঁ হাতটা বুলিয়ে এনে বলল—"এ লাঠি ঠাকুদ্দার হাতের ইন্‌জিয়ারবাবু, ছেলের হাত হয়ে এখন এই নাতির হাতে উঠেছে। হাতের অবিশ্যি আর সে জোর নেই, তবে লাঠি তো অনেক দেখেছে, অনেক ফয়সালা করেছে এককালে, হক্কের ভাড়া আদায় করে আনবার ক্ষ্যামতাটুকু রাখে এখনও। তা একবার শুধু শানের ওপর ঠক ঠক ক'রে দুটো ঘা দিয়ে দাঁড়ালেই হোল। মোট কথা, আফিস থেকে কিছু আসুক, না-আসুক—যা আয় তা দিয়ে তো পুঁজি বাড়ানোই হচ্ছে, কত্তা নিজে গিয়ে দেখেও তো এলেন কবার—কী জাঁকজমক আফিসের!—কপাট ডিঙ্গিয়ে ইদিকে কিছু নাই আসুক,কলকাতায় দুটো বছর এক-রকম সুখে-স্বস্তিতেই কেটে গেল। তার কারণ, লোক তো চারটি, বাতাসীর মাও এর মধ্যে বুদ্ধি করে দু'দিনের জ্বরে সরে পড়ল টুপ করে। সংসার হাল্কা, উদিকে মাসের গোড়ায় লাঠি গিয়ে হক্কের ট্যাকা আদায় করে আনছে, চলতে লাগল ভালোই। তবে আবার ঐ ভালো করে চলাই কাল্ হোল কিনা।"

"কেন ?" —ঘুরে চেয়ে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"কেন তা বুঝলেন না ? কষ্টটা যদি গোড়া থেকেই হোত তো গলদটা কোথায় সেটা ধরবার একটা তাগিদ থাকত তো। দিব্যি চলে যাচ্ছে, সোতোরাং সেটুকু আর হতে পেল না!

এইবার রায়মশাইয়ের কথায় একটু আসা যাক্। কত্তা কলকাতায়, দুই স্যাঙাতে এক সহরেই রয়েছেন, তা বলে তানার আসা-যাওয়া যে বেড়েছে কিছু—আজ্ঞে না, মোটেই নয়। এতদিন যে ছেলেন এনার

তার মধ্যে বার চারেক, কি হদ্দ পাঁচবার এসেছিলেন—ভয়ঙ্কর ব্যস্ত, এলেই দেখতুম ওপরের ছাতে গিয়ে গুজগুজ ফুসফুস কি সব হোত, আর সেই সব্বনেশে দস্তখৎ, কী সব ইস্টাম্পোর কাগজে—আমার আবার একটু আড়িপাতা রোগ আছে তো—দেখতুম।

"এঁরা কখনও ওঁর বাড়ি যাননি ?" —আবার ঘুরে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"না ইন্‌জিয়ারবাবু। ঐখানে কত্তার মস্ত বড় একটা অভিমান ছেল, কিছু না হোক্, বংশটা তো সেই পুরানো লাহিড়ী বংশই। অত পেয়ারের স্যাঙাৎ—কলকাতাতেই রয়েছে, তা একদিন এনাদের বলা, কি নেমতন্ন করা, কিছু নয়। এনাদের দিক থেকেও—'কোথায় থাকো, কিবা'ম থাকো'।—সে-সব কিচ্ছু নয়। এল, মা মণিও চা তোয়ের ক'রে এক পেলেট খাবার সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা পেন্নাম করে এল, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। বৌ-রাণীমাও সে-কেলে মানুষ; সোয়ামীর বন্ধু এল, আজকালকার মতন এসে খাতির অভ্যর্থনা করবেন সে-দিকে কখনও যাননি, এখানে এসেও রেওয়াজ ভাঙলেন না। মোট কথা, ওরই মধ্যে একটু মেলামেশা থাকলে হয়তো গায়ের গন্ধে কখনও টের পাওয়া যেত—মানুষ নয়, আস্ত-খেকো বাঘ, স্যাঙাৎ নয়, দুষমনের ওপর দুষমন—তা সেটুকু আর হ'তে পেল না।

এইভাবে দুটো বছর কেটে গেল। মা-লক্ষ্মী এর মধ্যে আস্তে আস্তে ছেড়ে যেতে লাগলেন। মা-মণির দুটো পাশ দেওয়ার কথা আপনাকে বলেছি। একটু যে খাওয়া-দাওয়া হোল তাতে মনে করলুম গাঁয়ের পুকুর থেকেই মণ খানেক মাছ ধরিয়ে আনিগে না হয়। কত্তা বলেই খালাস, হাতের আংটি বেচে টাকাটা দিয়ে নেমন্তন্ন করে বেড়াতে লাগলেন প্রাণ খুলে, ব্যবস্থা তো এই অধীনের হাতে—তা সে অনেক দিন থেকেই এইভাবে চলে আসতেছে—মাছের ব্যবস্থাটা গাঁ থেকেই করবার জন্যে আমি শুধু বৌ-রাণীমাকে ব'লে রাতারাতি বেরিয়ে পড়লুম। সেখেনে গিয়ে দেখি, ব্যবসা বাড়ির ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। চারখানা মোটরগাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, গাড়ি

না টেরাক কি বলেন আপনারা।—তার একখানা আসবাবপত্রে বোঝাই হয়ে গেছে, বাকিগুনো হচ্ছে। জনপাঁচেক লোক লেগে রয়েছে। লাঠিটা সঙ্গেই থাকে তো, লোকগুলোকে একধার থেকে পাট করতে যাচ্ছিলুম, দেখি খোদ রায়মশাই তদারক করছেন। বললেন কত্তার মত নিয়েই সব বিক্রী হয়ে গেছে, একটা কাগজও দেখালেন পকেট থেকে বের করে। পড়তে তো জানিনে, তবে কত্তার দস্তখতের টানটা দেখা আছে—বুঝলুম এসব ওপর ঘরে গিয়ে গুজগুজ ফুসফুসের পরিণাম। আর পুকুরে মাছ ধরাবার আহিংকেটা থাকে, আপনিই বলুন না? ল্যাজ মুখে ক'রে চলে এলুম। বৌ-রাণীমাকে আর বললুম না; এ মনের-আগুন ছড়িয়ে আর লাভ কি? এমনি তো কম জ্বালায় জ্বলছেন না। বললুম—দেখবার লোক নেই, মাছ আর বয়ে আনবার মত পাওয়া গেল না।

মাস তিনেক পরে একদিন বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ নিতাই-চরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'কি নিতাই, তুমি গাঁ ছেড়ে এখেনে?'...... দেউড়ির দেখাশোনা নিতাই-ই করত, বলল—দেউড়ি, পুকুর, বাগান—গাঁয়ের যা কিছু সব বিক্রী হয়ে গেছে, ও কলকাতাতেই একটা চাকরী নিয়ে রয়েছে এখন।

বললুম না আর, বৌ-রাণীমা কি মা-মণিকে ব'লে ফল কি বলুন না। কত্তাকেও জিগোলুম না। বিক্রীর ট্যাকা? বললুম না রাঘব-বোয়াল ব্যবসা হাঁ ক'রে রয়েছে! যেখান থেকে যা আসছে ক্ষিদে তো মেটাতে পারছে না আর। কত্তা দিব্যি আছেন। মা-মণিকে তিনটে পাশের পড়া পড়াচ্ছেন, আর কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। না জানতে দিলেও সতীলক্ষ্মী তো টের পাচ্ছেনই ভেতরে ভেতরে যে সব ফোঁপরা হয়ে আসছে, একদিন বৌ-রাণীমা কত্তার পাতের সামনে বসে বাতাস করতে করতে বললেন—মা-মণির বিয়ের সন্ধান তো আর না করলেই নয়। কত্তা বেশ নিশ্চিন্দি হয়ে একটু হেসেই বললেন—'সে ভাবনা আমার নয়, স্যাঙাতের। আমার সঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, আমি নিয়েছি স্বাতির এদিককার ভার,

ও নিয়েছে ওদিককার ভার। বৌ-রাণীমা বললেন—"বড় ভারটাই তো নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন তিনি দয়া করে। তা কিছু সন্ধান-টন্ধান পেয়েছেন? জ্যান? জিজ্ঞেস করেছ?'"

কত্তা বললেন—'এই জ্যাখো মেয়েলি বুদ্ধি! জিজ্ঞেস করতে গেলে আঘাত পাবে না মনে?

ঐ একবার। যেন মনের গরল ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার ভয়ে আর ওকথা তোলেননি সতীলক্ষ্মী।

এদিকে আঘাত দেওয়ার ভয়ে জড়োসড়ো, ঠিক এই সময় শেষ আঘাতটাই এসে পড়ল ওদিক থেকে। মাসের গোড়ায় ভাড়া আদায় করতে যেতে তারা তো মারমুখো হয়ে উঠল—লাঠিটা সঙ্গে নিয়ে যেতুম বলে স্তেঁহের চক্ষে দেখত, না তো—বলে—'ভাড়া! বাড়ি বিক্রী হয়ে যাদের ভাড়া পাওনা তারা নিয়ে গেছে, আবার ভাড়া কিসের? লাঠির জোর?'—স্তেঁহের চোখে তো দেখত না, একরাশ শুনিয়ে বিদেয় করে দিলে।

আর তো না বললে চলে না, পেট চলবে কি ক'রে? কত্তাকেই বললুম আগে, গোপনেই। কত্তা বললেন—'তুই গেছলি নাকি আদায়ে? তা আগে আমায় একটু জিজ্ঞেস করতে হয়। তোর বৌ-রাণীমাকে আর বলে কাজ নেই কথাটা, মেয়েছেলে অতটা বোঝে না তো। বাড়ি বিক্রীই হয়ে গেছে। ব্যবসাতে হঠাৎ একটা ঘাটতি এসে পড়ে বানচাল হওয়ার যোগাড় হয়েছিল—স্যাঙ্গাৎ কোন রকমে সামলে নিলে, দু'জনে কিছু কিছু করে দিয়ে ও আবার ঠিক হয়ে যাবে।' ......সুধোলুম—'তা চলবে কি করে? ভরসা ছেল দুটো ভাড়া।' ......বললেন—'মাসে মাসে কিছু ফেলে রেখে আসিসনি? এঃ, বড্ড কাঁচা কাজ করেছিস বেহিসেবীর মতন। জমিয়ে যেতে হয় কিছু করে, মানুষের দায় আছে, বিপদ আছে,।' বললুম—'হিসেব করতে তো শিখলুম না কারুর কাছে সারা জীবনভোর, তা এখন উপায় কি?

"কিছু বলিনি এ যাবৎ ইন্‌জিয়ারবাবু, তা একটু খোঁচা যেন না

দিয়ে আর পারলুম না। চুপ করে একটু ভাবলেন, একবার দিষ্টিটে হাত দুটোর ওপর গিয়ে পড়ল, আংটির খোঁজে। আর কি—সেদিক তো ফরসা, তারপর একটু যেন উল্‌সে উঠেই বললেন—'হয়েছে রে অনাথ, টাকার জন্যে তুই ভাবিস নি। সবাইকে যদি সব কথা ভাবতেই হবে তো চলবে কি করে? টাকার জন্যে তুই ভাবিসনি, জোগাড় হয়ে যাবে।'

"আর তো রাস আলগা দেওয়া যায় না ইন্‌জিয়ারবাবু এ-লোককে। এর ওপর আবার কর্জ করে বসবেন কি, কি করবেন কে জানে। বললুম—'তা জোগারটা হবে কি ক'রে? কোনও রাস্তা তো চোখে ঠেকছে না।' ·······বললেন—'ঠেকে না তোদের চোখে কিছুই। চোখ বুজে থাকবি তো কি করে ঠেকবে? শোন্‌, তোর বৌ-রাণীমাকে বলে কাজ নেই, মেয়েছেলে ওরা একটুতেই ভেবড়ে যায়—ব্যাঙ্কে যে গয়নাগুলো আছে তার একখানা বের করে নিয়ে আপাতত তো চলুক—স্যাঙ্গাৎ বলেছে মাস-খানেকের ওয়াস্তা, তারপরে আবার সামলে যাবে। তুই যা, নাহক ভেবে সারা হচ্ছিস।'

এর পরই স্যাঙ্গাতের মোহটা ভাঙ্গল, তবে ত্যাখন ভাঙ্গলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি?—

পরের দিন বিকেল বেলা ব্যাঙ্ক থেকে য্যখন ফিরে এলেন, চেহারা দেখে আর চেনা যায় না; চোখ-মুখ বসে গিয়ে সে যেন কতকালের রুগী। গয়না আমিই নিয়ে গিয়ে ট্যাকার ব্যবস্থা করব, বাঁধা দিয়েই হোক, চাই বেচেই হোক এই রকম কথা হয়েছিল; বাইরের বারান্দায় ওপিক্ষে করে বসেছিলুম, রিক্‌সার ভাড়া চুকিয়ে চোরের মতন আস্তে আস্তে উঠে এসে চুপি চুপি বললেন,—'সব্বনাশ হয়েছে অনাথ, স্যাঙাৎ আমায় পথে বসিয়ে কোথায় সরে পড়েছে।'

ব্যাঙ্কে গয়না গচ্ছিৎ রাখার ব্যবস্থা রায়মশাই-ই করেছিলেন, তার রসিদ, বাক্সর চাবি সব তানারই কাছে, না ডাকার অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বাসার খোঁজে গিয়ে দ্যাখেন, সে নামের গলি আছে, কিন্তু কোন বাড়ি নেই। আর নম্বরের কথা না ভেবে গলির ডাইনে-

বাঁয়ে যত বাড়ি সবতেই ধাক্কা দিয়ে খোঁজ নিলেন এটা ওমুক রায়ের বাড়ি কিনা। কেন হবে বলুন না? ভাবলেন বোধহয় এদানি হঠাৎ বাড়ি বদল করেছেন, গেলেন আফিসে। হলঘর-ভরা সে অফিসের কোন পাত্তাই নেই, তার জায়গায় কাটের দেয়াল দিয়ে ভাগ করা ছোট ছোট খুবরির মধ্যে চারখানা লতুন অফিস। তাদের একটাতে খবর পেলেন রায়-লাহিড়ী কোম্পানী তো অনেকদিনই দেউলিয়া হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে। ওরাই এই খবরটুকু দিলে, তবে রায়মশাই কোথায় থাকেন, কি করছেন সেসব কিছুই বলতে পারলে না। ছুটলেন ব্যাঙ্কে। খবর পেলেন ওনার নামে ব্যাঙ্কে কোন বাক্স গচ্ছিৎ ছেল না। এক ঐ নামের অমুক রায়ের নামে একটা ছেল গচ্ছিৎ, তা মাস-চারেক হোল তিনি খালাস নিয়ে গেছেন।

ভাংল স্যাঙ্গাতের মোহ। তবে, বললুম না?—ত্যাখন ভেঙেই বা কি, না ভেঙেই বা কি? এর ঠিক দু'দিন পরে লুটিস এসে হাজির, দিন চারেকের মধ্যে এবাড়িও খালি করে দিতে হবে। ব্যাপার কি?—না, রায়-লাহিড়ী কোম্পানীর দেনার দায়ে এবাড়ি বিক্রী গেছে।

উদিককোর কাহিনী এইখেনেই শেষ ইন্‌জিয়ারবাবু অবিশ্যি অনেক বাদসাদ দিয়ে। দিনকোর দিন যে কী করে কাটছেল সে তো আর বলে শেষ করা যাবে না, শুনেই বা করবেন কি? কাহিনীটে উদিককোর মোটামুটি এই।"

চুপ করল অনাথ। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"তারপর—এখানে আসা? অবশ্য বলতে যদি তোমার কোন বাধা না থাকে।"

কথাটা আরও এইজন্য বলল যে দেখল রায়মশায়ের নামটা যেন বেশ সাবধানেই এড়িয়ে গেল অনাথ, নাম-সাদৃশ্যে যাতে কত্তার পরিচয়টা বেরিয়ে না পড়ে। অনাথ আগের মতোই একটি দীর্ঘ ভূমিকা আমদানি করল—ওকে বলবে বৈকি—ওকে না বললে চলবে কেন—কর্তা যাই বলুন, ও তো বুঝছে এখন এরাই দুজন ওদের সহায়-সম্বল। ভূমিকাটুকু করে আবার হেঁট হয়ে একটু চুপ করে

রইল, তারপর হঠাৎ মুখটা তুলে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা, এটা কেনই বা হয়, আর কি করেই বা হয় কইতে পারেন ইন্‌জিয়ারবাবু? আপনি বিদ্বান, অনেক দেখেছেন-শুনেছেন, আপনি নিয্যস পারবেন বলতে, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আজ পর্যন্ত তো কোন হদিস পেলুম না। কথাটা হচ্ছে, যে দোষ করলে, বন্ধুর ভেক ধরে এসে অমন করে তার সব্বনাশ করলে—সেই কোন্ কালেজের দিন থেকেই তো তোড়-জোড় করছেল—তা সে দিব্যি বুক ফুলিয়ে এই কলকাতা শহরেই বেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো মটোরগাড়ি হাঁকিয়েই—তার নজ্জা নেই সরম নেই, য্যাত নজ্জা-সরম এসে জড়ো হবে কত্তার মাথায়?—যে কিনা সম্পূর্ণ নিদ্দুষী, যে কিনা বন্ধু বলে বিশ্বাস করে সবকিছু তার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে রইল!

চুরুট টেনে যেতে লাগল প্রশান্ত, এক সময় হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল—"ওটা আপন-আপন স্বভাবের ওপরই নির্ভর করে তো অনাথ। তবে এটুকুতে কি কোন সন্দেহ আছে যে অত চোখকান বুজে বিশ্বাস করে যাওয়াটাও একটা বিষম্ লজ্জার কথাই? কী মনে হয় তোমার?"

হাত দুটো একত্র করে যেমন উবু হয়ে বসেছিল অনাথ সেইভাবে চুপ করে বসেই রইল একটু, তারপর আরম্ভ করল—"নুটিসটা এল, সে সময় মা-মণি কলেজে। কত্তামশাই যেন কেমনধারা হয়ে গেছেন, ওরা চলে গেলে আমায় বললেন কথাটা যেন এখন না বলি দু'জনার কাউকে, উনি একটা উপায় ঠাওরাচ্ছেন, প্রায় ঠিকই হয়ে গেছে, একেবারে পাকা করে নিয়ে ত্যাখন নিজেই প্রকাশ করবেন কথাটা। সমস্ত দিনটা এমনি গেল। ওনার চা ফুরিয়েছে, এদানি বাড়িতে দু'রকম চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বৌ-রাণীমা—আমাদের তিনজনের একরকম আর ওনার একরকম—আগেকার মতনই উৎকৃষ্ট চা, মাত্র ঐ একটি শক ছেল তো জীবনে—ফুরিয়ে গেছে, সন্ধেকালে নে'সতে যাচ্ছি বাজার থেকে কত্তা বাইরে বারান্দায় পাইচারি করছিলেন, জিগ্যেস করলেন—'কোথায় যাস?'

—শুনে বললেন,—'থাক্ তুই আগে একটা কথা শোন অনাথ। তোকে সকালে ত্যাখন বললুম না যে কাউকে বলে কাজ নেই, একটা বিহিত করব?—তা করতুম, এমন শক্ত কিছু নয়, ভিকিরী হয়ে পড়েছি, কিন্তু মুখ্যু ভিকিরী নয় তো, কলকাতা জায়গা, পড়তা খারাপ পড়েছে—অমন বড়ো ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে গেল— (ত্যাখনও শাক দিয়ে মাছ ঢাকাটা একবার লক্ষ্য করে যাবেন ইন্‌জিয়ারবাবু, কিনা বড় ব্যবসা, বরাত দোষে নষ্ট হয়ে গেছে!)—পড়তা খারাপ, কালেজে না হয় নিদেন একটা ইস্কুলেরও একটা ভালো মাষ্টারি জুটে যেত্তোই, কিন্তু······'

"চুপ করে গেলেন। বেশ মনে আছে তো সেদিনকার কথা একটি একটি করে। বলতে বলতে খামোকা চুপ করে গেলেন। বললুম—'তাহলে তাই করুন না। চারটে পেট চলেই যাবে আপাতত, তারপর ব্যবসার দিকটা আবার সামলে গেলে—যেতেও তো পারে,—ত্যাখন আবার ছেড়ে দিলেই হবে।'

"আমিও মনে করলুম ইন্‌জিয়ারবাবু—কাটাঘায়ে নুনের ছিটে না দিয়ে একটু ঠাণ্ডা মলমই না হয় লাগিয়ে দিলুম—ব্যবসা যে কোথায় উঠেছে তা তো জানছিই। দাঁড়িয়ে পড়ে বলছিলেন, খপ করে দুহাতে আমার ডান হাতটা ধরে ফেললেন; বললেন—'বড্ড লজ্জা—বড্ড লজ্জারে অনাথ—দেশে মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে এসেছি, কলকাতাতেই বা আর মুখ দেখাব কেমন করে? এক কাজ কর অনাথ—সকাল হওয়ার আগেই কোথাও আমাদের লুকিয়ে ফেল—যেন-যেন······'

—আর কথা বেরোয় নি ইন্‌জিয়ারবাবু। কাঁদতে দেখিনি ভোলানাথকে, সতী যেতেও কাঁদেননি—ভ্যাবাচাকা মেরে গেছলেন—সেই একবার দেখলুম ইন্‌জিয়ারবাবু—আমার হাতে মাথাটা চেপে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলে হাতখানা—ওফ্!-ওফ্! ·····"

নিজেও আবার ভেঙে পড়ল অনাথ।

একটু এমনিই কাটল, তারপর অস্বস্তিকর অবস্থাটা একটু কাটিয়ে

দেওয়ার জন্যেই প্রশান্ত ঠাকুরকে ডেকে চা তোয়ের করে আনতে বলল। অনাথ চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"আমায় আর চা দিতে মানা করে দেন ইন্‌জিয়ারবাবু, শুদ্ধু আপনার তরেই আসুক।"

"কেন গো, একটু খেতে, ঠাণ্ডা রয়েছে তো। হাট সেরে এতটা যেতে হবে আবার।"

"আপনি ত্যাখন বললেন, রাদেশটা অমান্য করতে নারলুম, নৈলে চা সেই-দিনই ছেড়ে দিয়েছি। বাড়ি থেকেই গেছে।"

"হঠাৎ ?"

"কত্তা তো আর দোকান থেকে চা আনতে যেতে দিলেন না। এইটেই নাকি বড় পেয়ারের জিনিস ছেল, বললেন—'থাক অনাথ, শকের আর কিই বা রাখতে পারলুম যে এইটেকেই ধ'রে রাখতে হবে ? পারিস্ তো যেমন বেরিয়েছিস্ আর পাপপুরীতে না ঢুকে সিদে চলে যা বরং, দেখ যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারিস। কপালে টেঁকল না, এ যেন লুটিস পাওয়া ইস্তকই মনে হচ্ছে কার বাড়িতে রয়েছি—কার ঋণ বাড়াচ্ছি, হাঁপিয়ে উঠছি অনাথ।'

"সেই থেকে তার এক খেয়াল ঐ মাথায় ঢুকে বসল—ঋণ-ঋণ একটা আতঙ্ক। ভাবটা এই—কত জন্ম ধরে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে এয়েছি তাই এই করে সুদে-আসলে শোধ করতে হোল। তাই এবাড়িতে আসা পর্যন্ত তারিখ ধরে আমায় ভাড়া আদায় দিয়ে যাচ্ছেন—নিতেও হচ্ছে আমায় হাত পেতে, নৈলে……."

"বুঝলুম না তো।"—বাধা দিল প্রশান্ত।

"বাপ-পিতেমোর বাড়ি কোথায় কি আছে জানিওনে ইন্‌জিয়ার-বাবু। আছে কিনা, থাকলেও কারা ভোগ করছে, তাও না। ক'পুরুষ ধরেই তো দউড়িতেই মানুষ। এটুকু আমার মাতুলসম্পত্তি। মাতামো শিধর সরকার একদিককোর ডাকসাইটে জমিদার পুরু-ষোত্তম ঠাকুরের সর্দার-লেঠেল থাকাকালীন এইটে করেন। তা লেঠেলদের শেষ পরিণাম তো সেই এক, অত পাপ মা-ধরণী সইবে

কি ক'রে ? আমাদের দিকে আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, প্রাশ্চিত্তির পুরো হবে তবে তো ছাড়পত্র পাব—আছি পিত্তিরক্কে করে এখনও, উদিকে মাতুলবংশ একেবারে ফর্শা। এযে একেবারে ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—অত তাড়াতাড়ি কি ব্যবস্থা হবে, হবেই বা কোত্থেকে ? —সে কথাও আছে, তা ভেন্ন নিখোঁজ হয়ে অজ্ঞাতবাস করতে হয় তো এমন আরামের জায়গা তো আর ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে না—তামাম জঙ্গল, খুঁজে পেতে ছ'সাত ঘর হেলো চাষার ঘর—পাণ্ডবেরা বোধহয় এইখানেই এসে কাট্যেছেলেন। আমি বৌ-রাণীমার কাছে একটা ছুতো ক'রে সেই রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়লুম। লোক ছেল বৈকি—চাষের মাঠ আর বাসের ঘর তো খালি থাকে না ; মালিকের খোঁজখবর নেই, ভোগ দখল করবার লোক জুটে গেছল। লাঠিটে সঙ্গেই থাকতো—তাদেরও রাতারাতি অজ্ঞাতবাসের পথ ধরিয়ে, দোরে কুলুপ এঁটে, বন-বাদাড় ভালো করে কেটে-ছেঁটে পস্কের-ঝস্কের করে পরদিন সন্ধ্যের একটু আগে ফিরে গেলুম আমি।

মাথা খারাপ হয়ে গেছল বলতে হয় বৈকি, অন্তত সেদিনকার সব কথা য্যাখন মনে পড়ে। জিদ ধরলেন সেই রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়বেন।......'সে কি কত্তামশাই ! সে অজ বনগাঁ—কছেও নয়, রেতে সেখেনে কি ক'রে যাওয়া যাবে ?'......না, হেঁটে যাব, য্যাখন পৌঁছুই, য্যাতক্ষণে পৌঁছুই—দিনের আলোয় আর আমি বেরুতে পারব না অনাথ—গাঁ থেকে বেরিয়েছিলুম একটা কথা ছেল, জমিদারি সবারই যাচ্ছে, ছেড়েছুড়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছি ; এখান থেকে আর কোন্ মুখ নিয়ে বেরুব দিনের আলো থাকতে ?'

"কোনমতেই শুনবেন না। বৌ-রাণীমা আর মা-মণি বোঝাতে এলে চটে উঠলেন—'তাহলে তোমাদের যদি এতই মায়া বসে থাকে যে হু'দণ্ড কাটিয়ে যেতে পার—বেশ, তোমরা থাকো, আলোয়-আলোয়ই এসো'খন, আমায় যেতে দ্যাও।'

"বেহিসেবী বলে মুখনাড়া খেলুম, কিন্তু সত্যিই বেহিসেবী হলে কি সংসারটা চালিয়ে আনতে পারি এই ক'বছর ধ'রে ? ঐ আয়ের

মধ্যে থেকেও কিছু কিছু রাখতুম বাঁচিয়ে। কী আর উপায়? একটা মোটর ঠিক করে আনলুম। একটুখানি পথ নয়তো। যেখানে বড় রাস্তা থেকে আমাদের কাঁচা শড়কটা বেড়িয়েছে সে পজ্জন্ত ঠিক বিয়াল্লিশ মাইল, পাথর পোতা আছে, তায় রাত্তির বেলা। আরও একটা উপদ্রব চলছে ক'দিন থেকে, বলা নেই কওয়া নেই, বিষ্টি। অবিশ্যি সেদিনটা সমস্তদিন ভালোই গেছে, তবু গাঁইগুঁই করে ডেরাইভার সেদিক দিয়েও খানিকটা দর তুলে নিলে—দৈবীসৈবীর কথা তো বলা যায় না। গরজ বড় বালাই, কত্তা কোনমতেই শুনবেন না, করকরে আশিটি ট্যাকায় ফুরন হোল ইঞ্জিয়ারবাবু। একটা বিছানার বড় মোট, দুটো ট্রাঙ্কে কাপড়-চোপড় এদিক ওদিক যা আঁটল, একটা থলের মধ্যে কিছু বাসন-কোশন আর দিন-দুইয়ের মত চাল-ডাল নিয়ে বেরিয়ে পড়া ঠিক হোল। খেয়েদেয়ে। বাকি সব আমি ওনাদের বসিয়ে রেখে পরে নিয়ে যাব। অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়ার কারুরই ইচ্ছে ছেল না, থাকতে পারে কখনও? কোন্ না ঐতেও বেশ খানিকটা রাতও হয়ে যাবে। হ'য়েও তো গেল, আর তাইতেই তো ওনার সেই কুষ্ঠির ক্ষ্যাণ্-লগ্নটুকু এসেও পড়ল।"

প্রশান্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফিরে চাইল।

"আজ্ঞে, ক্ষ্যাণ-লগ্ন ভেন্ন আর কি বলব তাকে?—গাঁয়ের বাড়িতে শত্রু ঢুকল—আকাশ ভেঙে পড়ছে; সেখেন থেকে বেরুলেন, আকাশ ভেঙে পড়ছে; সিদিন রেতেও তাই। সন্ধ্যেয় বেরিয়ে পড়লে পথে যা হবার হোত, এ মোটর এসে ওপিক্ষে করছে, জিনিসপত্র উঠবে, হঠাৎ আকাশে গুম-গুম-গুম। ডেরাইভার বেঁকে বসল, যাবে না। কাহিনী বাড়িয়ে লাভ নেই, এতো আর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের পালা শোনাচ্ছি নে, ট্যাকাটাকে পুরোপুরি একশ' করিয়ে নিয়ে আদ্দেকটা আগাম হাতিয়ে মোটর ছেড়ে দিলে ডেরাইভার। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিষ্টি-বাদল নামল বৈকি, তা কখনও বাদ যায়? ঝড়তি-পড়তি যা হাতে ছেল, সব এই সময়টার জন্যে জুগিয়ে রেখেছিল তো দ্যাবতা, আকাশ ফুটো করে নাব্যে দিলে। বেরুতেও তাই, এখেনে এসে বাড়ি ঢুকতেও

তাই। তার আর বিবরণ কেন দিতে যাই কষ্ট ক'রে? —আপনার ওপর দিয়েও তো গেল সিদিনকে। তাই বলি—ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে ভুলে যাবেন, মানুষটা কি সাধ করে ক্ষেপে ওঠে ও ধরনের বিষ্টি-বাদল দেখলে? —ভাবে আবার বুঝি কে স্যাঙ্গাৎ হয়ে ঢুকল ঘরছাড়া করে বের করতে। দোষ দেবেন কি ক'রে?

"এর সঙ্গে সেই ঋণ-ঋণ আতঙ্ক। সিদিন আবার একেবারেই কেমনধারা হয়ে গেছেন তো, সেই ঝড়-বিষ্টি মাথায় করে মটোর থেকে বাড়ি ঢুকতে যাব, দরজার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ……'আবার কি হোল? ভেতরে চলুন, ভিজে যে নেয়ে গেলুম সবাই।' ……না, 'তোকে ভাড়া নিতে হবে বাড়ির।' ……বুঝুন অবস্থাটা, সেই পাহাড়ে বিষ্টিতে দাঁড়িয়ে শপথ করিয়ে নিয়ে তবে বাড়ি ঢুকলেন। তারপর থেকে এই দু বছর ধরে আমাদের এই ছেলে-ভুলুনো খেলা চলছে, আমার আর মা-মণির।"

একটু চুপ করে সেইভাবে জোড় করা হাত দুটোয় রগ চেপে বসে রইল অনাথ। প্রশান্তও নিজের চিন্তা নিয়ে আস্তে আস্তে চুরুট টেনে যেতে লাগল।

এক সময় অনাথ আবার আরম্ভ করল—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেলেভুলুনো খেলা ছাড়া আর অন্য নাম কি দেওয়া যায় একে? একদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষটা শিশুর মতনই সরল তো। হওয়া চাই, এইটুকু বোঝে, কোথা থেকে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে সিদিকে বিশেষ খোঁজ-খবর নেই; আপনি যা বুঝিয়ে দেবেননির্বিচারে বুঝে নেবে। এখানে আসতেভগবান সেই আগের রোগটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ায় ইদিক দিয়ে একটু সুবিধেই হোল। এখন অষ্টপহরই মা-মণির পড়াশোনা নিয়ে থাকেন,নিজেরও কিছু বই আছে, গাঁ থেকে আসবার সময় যে ক'খানা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, বাকি তাবৎ লাইবুড়ি তো জমিদারি-বাড়ি-ঘরের সঙ্গে ব্যবসার গব্‌ভে গেল—সেই ক'খানা ওলটান পালটান, কি সব হিজিবিজি নিকে খাতা বোঝাই করেন আর মা-মণিকে পড়ান, অন্যদিকে আর গা নেই। আগেই

বলেছি, ভাড়ার ট্যাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে এসেছিলুম। ওনাকে বলিনি, জানি মা-মণি আবার পাস দিলে ফের একটা যজ্ঞি আছে তো, আর হাতে আংটি নেই, হয়তো বাড়িটুকুতেই হাত পড়বে, তার চেয়ে এটা থাক। শ' পাঁচেক ট্যাকা ছেল, তাই থেকে একশ' ট্যাকা মটোর ভাড়ায় টেনে নিলে, কিছু কলকাতা থেকে মালপত্তরগুলো এনে ফেলতেও খরচ হয়ে গেল। তেমনি আবার কিছু হাতেও এল। কলকাতায় আসবাব পত্তোর, খাট চৌকি, যা ছেল, কিছু সৌখীন জিনিস—কত্তার আর মা-মণির নেতান্ত পেয়ারের দু'-একখানা বাদ দিয়ে—সব বেচে এলুম তো—সব মিলিয়ে দু'শ তেত্রিশটে ট্যাকা আর বারো আনা আমার হাতে রইল। ট্যাকাটা ওনাকে বুঝিয়ে দিয়ে বৌ-রাণীমার হাতে দিতে গেলে কেঁদে ফেললেন ইন্‌জিয়ারবাবু, বললেন তোর কাছেই রাখ্ অনাথ, একমুঠো করে খেতে দিস তিনজনকে।

"তা তিনজনের ভার তো বেশিদিন বইতেও দিলেন না সতীলক্ষ্মী। এখেনে আসবার পর দুটো মাসও গেল না, একদিন সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে চক্ষু বুজলেন। ভোগা নয়, কিছু নয়, এক যদি বলেন সারা জীবনটা ধরে তবে অমন করে ভুগলেটা কে?

"সেই দু'শ তেত্রিশ ট্যাকা বারো আনা—তিনটে মানুষ—এই পোড়া পেটটাকেও তো ধরতে হয়—অনেক খেয়েছিস্ তিন পুরুষ ধ'রে, এবার বন্ধ দে বললে তো শুনবে না—তা ও'কটা ট্যাকা আর কদ্দিন টেনে নিয়ে যাওয়া যায় বলুন না। মাগ্যিগণ্ডার দিন, সুবিধের মধ্যে এই যে চাইলেই যে হাতের কাছে এটা-ওটা-সেটা পাবে সে উপায় নেই, তার সঙ্গে আরও একটা সুবিধে, কি দিয়ে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিচ্ছে মেয়ে বাপের সামনে, কি দিয়ে নিজে গেরাস তুলছে মুখে, তা খোঁজ নেওয়ার লোক নেই কাছে-পিঠে, সুবিধে অনেক অজ্ঞাতবাসে—তবু ট্যাকাটা তো ঐ। টেনে-বুনে দেড়টা বছর পজ্জন্ত কোন রকমে চালিয়ে নে' গেলুম, তারপরেই বৌ-রাণীমার গয়নায় হাত দিতে হোল তো। তাই বা ক'খানা? শখের কিছু তো আর ছেল না জীবনে—চারগাছা করে চুড়ি, একটা সোনার পাতে মোড়া শাঁখা,

একটা হাল্কা চেন-হার আর একটা পাথর বাঁধানো নাকছবি। গয়নার যা ছেল, খাস আর খানদানি—সবই তো ব্যাঙ্কের নামে রায়মশাইয়ের সিন্দুকে গিয়ে উঠেছে। বলতে হল কত্তাকে। চটেই তো গেলেন—'তোরা বেহিসেবী, কাণ্ডজ্ঞান নেই, সব যদি পেটেই পুরব তো ঐ যে একটা মেয়ে রয়েছে, কিছু নয়তো দু'খানা গয়না দিয়েও তো বিদেয় করতে হবে—অনেক ভাবতে হয় মানুষকে, শুধু পেটের কথা ভাবলেই চলে?

সমীচীন কথাই তো ইন্‌জিয়ারবাবু, বাপের মতনই। কিন্তু সেই যে বলে গেছে, শুধু কথায় তো চিঁড়ে ভেজেনা, পেট যে সব পোয়াদার বড় পেয়াদা। এক এক করে যেতে লাগল। কিন্তু দেখলেন তো ওর মধ্যে হার আর চুড়ি ক'গাছার যা একটু দাম। আরও চারটে মাস কাটল কোন রকম করে, তারপর একদিনের কথা······সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেলে ইন্‌জিয়ারবাবু ·····"

—জানলার বাইরেই দৃষ্টি ফেলে চুরুট টানার সঙ্গে সঙ্গে শুনে যাচ্ছিল প্রশান্ত, এবার বিরতিটা আরও দীর্ঘ হওয়ায় ঘুরে প্রশ্ন করতে গিয়ে ছ্যাখে গামছার খুঁটে চোখ মুছছে অনাথ। ও তাড়াতাড়ি আবার ঘুরিয়েই নিল মুখটা। নিশ্চয় অভাবের চরমে এসে সেদিন-কার এ একটা এমনই কাহিনী যা এত সহ্য-করা বুকেও দাগ কেটে ব'সে গেছে। প্রশান্ত একটু সময় দিল। তারপর যেন হঠাৎ চকিত হয়ে উঠে বলল—"হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে অনাথ; আমি একটা অফিসের কথা মনে পড়ায় এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম।···তোমার তো দেরিও হয়ে গেল, হাট ভেঙে যাবে না যেতে যেতে?"

"আপনি ত্যাখন চুরির কথা সুদোচ্ছিলেন না? সিঁদেল চোর হতে গেলুম কেন? ······তা সিদিনকোর কথা না হয় নাই শুনলেন—লাভ তো নেই কিছু—মোদ্দা কথাটা এই যে বৌ-রাণীমার গয়নাগুলো যেতে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে ঐ দুধের মেয়েটাকেও বুঝি শেষ পজ্জন্ত হারাতে হয়। আমার চোখেও ধুলো দিয়ে নাগাড়ে উপোস দিয়ে যাচ্ছে, প্রেথমে একবেলা, তারপর একদিন, তারপর······থাক সে

কথা। আমি যেমন কত্তাকে ভাঁওতা দিয়ে যাচ্ছি, ও-ও তেমনি দিচ্ছে আমায়—আমার কাছ থেকে শিখে নিয়ে।

চেপে ধরতে বললে—'বাবার ভাবনা নিয়ে ছিলুম অনাথকাকা, কিন্তু আর ভেবে তো কূল পাচ্ছিনে, যেতে দাও আমায় মার কাছে এবার। ……একজন কমলে, হালকাও হবে আর একটু।

ওর বয়েস এই ঠিক উনিশ বছর সাত মাস আর এই কটা দিন ইন্‌জিয়ারবাবু, এই তো সিদিন জন্মাল, কত নাচ, গান, বাজনা-বাদ্যি হোল। তা বয়েস না হলে কি আর বুড়ো হতে নেই? কোন্ বুড়িটা ওর চেয়ে বেশি দেখেছে তা ক'ন না আমায়?

সমিস্যে নয়?—এই যদি মনের কথা হয় তো কোন্‌দিন কি ঘটিয়ে বসে কে বলতে পারে? পেটের ভাবনাব ওপর এই একটা লতুন সমিস্যে, কি করে যে কাটতে লাগল তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাই? সব্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা, মতিগতি খারাপ, কখন্ কি ক'রে বসে। ইদিকে অষ্টপহর আগলে ব'সে থাকা তো যায় না, অন্য ধান্দা আছে, তারপর এই সময় আবার মুশকিল হোল, কত্তাও মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছেন—কোথায় নাকি ইস্কুল হওয়ার কথা হ'চ্ছে, কে নাকি তার ছেলেমেয়ের মাষ্টার রেখে পড়াতে চায়—মাঝে মাঝে ভোলানাথেরও ধ্যান ভাঙে তো, সেই আর কি। ডুব ভাবনায় কাটতে লাগল ইন্‌জিয়ারবাবু। কিন্তু জন্মাতে দেখেছি, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করলুম— সে মেয়ে ভাঁওতায় আমার ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে এতো হয় না। একটা দিন ছেড়ে দিতে হোল, আবার কত্তা বাড়ি থাকলে তো হবে না। তারপর দিন বিকেলে তিনি আবার কামিজ গায়ে দিয়ে উড়ুনিটে নিয়ে বেরিয়েছেন, মা-মণি রকে মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছেল, আমি যেন বাইরে থেকে এইমাত্র এলুম এইভাবে সামনে এসে বললুম—'তাহলে এই আমিই আগে-ভাগে স'রে পড়ছি গো মা-মণি, একবার বলে যাওয়া দরকার, তাই……'

শেষ করতেও হোল না—'কোথায় যাচ্ছ অনাথকাকা।' —বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল একেবারে। ……বললুম—'যেখানে গেলে

সব জ্বালা মেটে, এই তার ওষুধ'—ব'লে ডেলাটা মুখের দিকে তুলেছি, একেবারে বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, হাতটা দু'হাতে ধ'রে ফেললে। তারপর হাতটা নাকের কাছে টেনে নিয়ে—'ও কাকা, এযে আপিন।' বলে এক চিৎকার। দেউড়িতে দু'একজন বুড়ি খেত তো, জানে আপিন জিনিসটা কি।

—আজ্ঞে না, সে মার্বেলগুলির মতন এক ডেলা, অত আপিন কোত্থেকে জোগাড় করব? খয়েরের ডেলা, হাট থেকে কিনে তার আগের দিনই একটু আপিন মিশিয়ে গন্ধটা ঠিক করে রেখেছিলুম— নেতান্ত আর ছেলেমানুষ নয় যে রং দেখেই ভাঁওতায় পড়ে যাবে।

দুঃখের কাহিনী, ইন্‌জিয়ারবাবু, যেটাই শুরু করব এই রকম লম্বাই হয়ে যাবে তো। কত বলব, কতই শুনবেন আপনি? সংক্ষেপে—সেই সিদিন গিয়ে চুরির পরামর্শটা হোল দু'জনে মিলে…"

সমস্তটাই চরমের দিকে, তারপর শেষে আবার এই, ত্রস্ত কৌতূহলে মুখের দিকে চাইল প্রশান্ত, চোখ দুটো যেন ঠেলে আসছে।

একটু নড়েচড়ে বসল আবার অনাথ, বলল—"মা-মণি উপোষ করে মরুক, চাই, আমি আপিন খেয়েই মরি, আসলে মরল তো যে-লোকটা বেঁচে রইল, মানে কত্তাবাবু। অনেক ভেবেচিন্তে এবার শেষে মা-মণির গয়না দু'খানায় হাত দেওয়া সাব্যস্ত হলো খুড়ো-ভাইঝিতে। বুকের রক্ত ইন্‌জিয়ারবাবু, কিন্তু উপায় তো ছেল না। গাঁয়ে কিছু ধারও হয়ে গেছে, অবিশ্যি চাল-ডালেই, সাত-আটখানা ঘর নিয়ে গরিব গাঁ, দেয়ই বা কোথা থেকে তারা?

দিতেই হয় গয়নায় হাত। কিন্তু সমিস্যে হচ্ছে এবার তো বৌ-রাণীমার মতন সহজ নয়, কথাটা পাড়া যায় কি করে কত্তার কাছে? শেষে ঐ মা-মণিই সলাটা দিলে ইন্‌জিয়ারবাবু, বললুম না? ভোলা-নাথের বেটি সরস্বতীঠাকরুণই তো। তবে অবিশ্যি দুষ্টু-সরস্বতীর বুদ্ধি, তা দুষ্টু আর ভালো, দুজনা তো আর আলাদা নয়, যেমন প্রেয়োজন মনে করে, সাজে। বলল—'বাবাকে বলতে গেলে তো হবে না অনাথকাকা, চাকরি-চাকরি বাই রয়েছে, আর হয়তো

ফিরবেনই না বাড়ি। তুমি চুরি করিয়ে দাও গয়না ক'খানা।'
..... সে কি গো! চুরি করিয়ে ছাও কি বলিস?' না,—'ঠিকই বলছি, চুরি হয়ে গেছে বলে সিঁদটা দেখিয়ে কোথাও বন্ধক দিয়ে কিম্বা বেচেই নিয়ে এসো টাকাটা। বাবা বুঝতে পারবেন না অত।'
......'বেশ, তুই যেন বাবার চেয়ে বুদ্ধিমান, ছেলে-ভোলানো ক'রে দিলি বুঝিয়ে তানাকে, কিন্তু সিঁদ কেটে চুরি করে আবার সোনা ফিরিয়ে দেবে এমন নিরেট বোকা চোর কোথায় পাচ্ছি আমি?......
'না, তোমারও বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে কাকা। চোর ডেকে আনতে হবে কেন? নিজেই একটা সিঁদ কেটে দেখিয়ে দিলে, তারপর কাদা দিয়ে আবার জুড়ে দিলেই হবে ইট ক'খানা। শুনেছিলুম আমাদের কলেজের দারোয়ান নাকি একবার নিজের ঘরে ঐ ক'রে চুরি করে বাসনপত্তর সরিয়ে ফেলেছিল, ভাঙা বাক্স দেখিয়েছিল—মতলবটা, তাহলে কলেজ থেকে সাহায্য পাবে, মেয়েরাও চাঁদা তুলে দিয়ে দেবেই। তার ভুল হয়েছিল, সিঁদের ইট-সুরকি সব ভেতরের দিকেই থেকে গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে থেকেই ব'সে ব'সে সিঁদটা কেটেছিল কিনা। তা তুমি তো আর সে-ভুলটা করতে যাচ্ছ না, বাবা সন্দেহ করতে পারবেন না একটুও।'

বললুম—'ধন্যি মা তোর কালেজ, আর ধন্যি তার দারোয়ান।'
.......কিন্তু উপায় তো নেই, সাতপাঁচ ভেবে হতেই হোল রাজি, বনতেই হোল চোর। খানিকটে আবার ধম্মকথাও তো শোনালে এর ওপর—তার ছেল কুমতলবে হাত নোংরা করা, আমার তো তা নয়। বুঝিয়ে তো দিলে আমায় যে আমার যে চুরি করা গেরস্তর কল্যেণেই।

গয়না-গাঁটির শখে মেয়েও মার মতনটি তো একেবারে। গায়ে পাঁচখানা পাঁচ রকম থাক্ এমন খেয়ালটা তো কখনই ছেল না। গাঁয়ে থাকতে তবু হাতে রুলির সঙ্গে চারগাছা করে সোনার চুড়ি পরত, ইদিকে কালেজে ঢোকা ইস্তক সে সব গিয়ে মাত্তোর ঐ দু'গাছা করে রুলিতে দাঁড়িয়েছিল তো, আর দু'কানে দুটো দুল; কালেজে নাকি

চুড়ি পরা ফ্যাশান নয়। ......আজ্ঞে গয়না ছেল বইকি—সে কি কথা? অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে উদিকে বরাবরই তো হয়ে গেছে, কিন্তু সে সব তো হয়েছেল স্যাঙ্গাত-কাকার ভাগ্যেই, মায়ের গয়নার সঙ্গে সে সবও গিয়ে মাত্তোর এই ক'খানায় ঠেকেছিল, তার মধ্যে থেকেও চারখানা চুড়ি একদিন চোরের পেটে অন্তর্ধান হোল। যদি বলেন গেল তো আটখানাই গেল না কেন তো বলি চারটে বাঁচল সে ঐ হতভাগ্য চোরের সলা-পরামর্শেই। প্যাঁটরায় আটখানাই তোলা ছেল, আমিই বললুম—একেবারে সবগুনো যাবে কেন, দু'খানা ক'রে প'রে নে, তারপর সিঁদ কাটলেই হবে।

ঘা খেয়ে খেয়ে মনটা এতই অসাড় হয়ে গেছল, এদিকে সিঁদ দেখে আর চুরির কথা শুনে খুব যে ভেঙে পড়লেন কত্তা এমন নয়। বরং পাছে মা-মণি ভেঙে পড়ে সেই জন্যে কি একটা সংস্কৃত শোলোক আউড়ে বললেন—দুঃসময়েও ভগবান নাকি একেবারেই ভোলেন না, তাই ঐ চারখানা প'রে নেওয়ার সুবুদ্ধিটুকু জুগিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই চোর বনবার কথা ত্যাখন বলছিলুম আপনাকে ইন্‌জিয়ার-বাবু। সেও তো অনেক দিন হয়ে গেল। তপ্ত বালিতে জলের ফোঁটা, সে কটা ট্যাকা আর কদ্দিন বলুন না। আবার তো চুরির পরামর্শ আঁটতে হবে খুড়ো-ভাইঝিতে মিলে। আর, বারে বারেই যে লোকের চোখ এড়িয়ে যাবে চোরে এই বা কে বলতে পারে? অব্যেস নেই তো, আঁৎঘাতও জানা নেই, সেবারেই গা ছমছম ক'রে ভির্মি লাগার মতন হয়ে পড়েছেল। এমনি চোখে না পড়ে গেলেও কেউ হয়তো দেখবে সিঁদ কাটতে কাটতে হাক্লান্ত হয়ে চোর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে।"

[নয়]

চুপ করে শুনে গেলে এক বৈঠকেই রাত কাবার করে দিতে পারত অনাথ। কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তার স্রোত

চলছিল প্রশান্তর মনে, ওর কাহিনীর গোড়ার কথাটা ধরে, অর্থাৎ স্বাতিদের নিরুপায় দারিদ্র্য। একটা সংকল্পও গড়ে উঠেছিল যে অত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কিছু একটা করতেই হবে। অনাথের শেষের-কথাগুলায় একটা সুযোগ পেয়ে, আর ফিকড়ি বের করবার আগেই বলল,—"ও হবেই অনাথ, কত সাবধানে থাকবে তুমি? তারপর তোমার হাতে যদি হাতকড়ি ওঠে তো ওদের দু'জনের কি অবস্থাটা হবে তা একবার ভেবে ছাখো!"

এতটা ভেবে দেখেনি নিশ্চয় অনাথ। কথাটা হাল্কাভাবেই বলেছে, জানে নির্জন পরিবেশে নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়া অত শক্ত নয়, ও ধরনের বিপদের সম্ভাবনাও নেই তাতে। প্রশান্তর মুখে শুনে কিন্তু বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েই গল্পের সূত্র ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর মুখের পানে, একটু পরে বেশ বিহ্বল স্বরেই বলল,—"ভেবে কি দেখিনি ইন্‌জিয়ারবাবু? দেখেছি; কিন্তু উপায় ঠাহর করতে পারছি কৈ? তাই না মনে করলুম যাই তানার কাছে —অগতির গতি তিনি······"

"উপায় একটা ঠাউরেছি আমি, একমাত্র উপায়। এখন তুমি যদি রাজি হও। যদি-ফদি নয়, হতেই হবে রাজি, নৈলে কী যে হবে, আমার মাথায় তো আসছে না। চুরির কথাটা খানিকটা জানাজানি হয়েই গেছে গাঁয়ে—সতর্কই থাকবে তো তারা।"

ডোজটা বেশ কড়া করে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। আরও বিহ্বলই হয়ে উঠেছে অনাথ, বলল,—"কি উপায়, ক'ন।"

"তোমার মা-মণির চুড়ি কটা ছাড়িয়ে আন।"

"তাহলে তো এবার তাদের ঘরে সত্যিকার সিঁদ দিতে হয় ইন্‌জিয়ারবাবু, সে ক্ষমতা কোথায় আমার?"—মুখের পানে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বলল অনাথ।

"তার দরকার নেই, টাকা দিয়েই ছাড়িয়ে আন······"

"ট্যাকা কোথায় পাব? দুশো ট্যাকায় বাঁধা, সে তো পেটের

মধ্যে চলে গেছে। বেচবই বলে আরও দশটা ট্যাকা নে'সলুম তারই কাছ থেকে কত্তার অসুখে……"

"আমি দিচ্ছি টাকা……"

অনাথের মুখটা এক মুহূর্তেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছাইপানা হয়ে গেল, বলল—"আপনি দেবেন!……আপনি দেবেন ইন্‌জিয়ারবাবু—কিন্তু কত্তা তো কারুর দান—এমন কি কারুর ঋণও……"

"এই ছাখো! সব গোলমাল ক'রে ফেলছে অনাথ ঘাবড়ে গিয়ে! কত্তা টের পান কোথা থেকে? তিনি কি বাঁধা দেওয়ার কথাটা জানেন যে ছাড়িয়ে আনার কথাটা বলতে হবে তাঁকে?"

"তাওতো বটে, কত্তা তো জানেন চুরিই গেছে"—মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনাথের। তখনই কিন্তু আবার একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল,—বলল "কিন্তু মেয়েও যে বাপকা বেটি ইন্‌জিয়ারবাবু, কেউ দান করছে জানলে……"

"দান!"—কথাটা বলে চোখ খানিকটা কপালে তুলল প্রশান্ত, বলল,—"আমি পেটের দায়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে এই নির্বান্ধব দেশে চাকরি করতে এসেছি অনাথ, দান ক'রে বেড়াব সে ক্ষমতা কোথায়? ঋণ হিসেবেই দোব আমি। আর দোব সেও কি তোমার মা-মণিকে? ঋণ নেবে তুমি, অবশ্য, যদি চাও। আমি যে তোমার মুখে এতক্ষণ ধরে কথাগুলো শুনলাম তাতে তো আমার এ বিশ্বাসটুকু দাঁড়িয়েই গেছে যে তোমার হাতে আমার টাকা মারা যাবে না। আজ এঁদের অবস্থা খারাপ, তবে কর্তা মুখ্যু নন, উদ্যোগীও রয়েছেন, একটা কিছু আয়ের পথ ধরলে তখন, যেমন করে এসেছ শুনলাম, তাই থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তুমি আমার পাওনা মিটিয়েই দেবে। অবিশ্যি এককালে দেবে কি কিস্তিবন্দী করে, সুদটুদ কিছু দিতে পারবে কি শুকোই—অতটা ধরি না, কাবলিওয়ালা নয়তো একেবারে……"

আরও বাড়াতে যাচ্ছিল, ছাখে চোখ দুটো চকচক করছে

অনাথের, থেমে গিয়ে বলল—"এই হচ্ছে আমার কথা, এখন ছাখো ভেবে-চিন্তে তুমি। মা-মণি তোমার আসছে কোথায় এর মধ্যে যে তার মতামত নিয়ে ভাবনা ?"

চোখ দুটো গামছার খুঁটে একটু মুছে নিয়ে নড়েচড়ে গা'টাকে বেশ একটু শব্দ ক'রে নিয়ে বসল অনাথ, যেন ভেতরের সংকল্পেই ; বলল—"আমি নোব ইন্‌জিয়ারবাবু। নেহাত যদি পরমায়ু না থাকে, করব কি ?—নৈলে ট্যাকা আপনার ডুববে না······আর পরমায়ু আছেই এখন, এইগুলো ব'সে ব'সে দেখতে হবে তো।"

"বাঃ! আর তোমার পরমায়ু না থাকলে আমি যে মারা যাই অনাথ, আমায় টাকার ভুক্তান দেবে কে ব'সে ব'সে!"

আবার চোখ তুলে এমন বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে, এক পশলা জল ঝরঝর করে ঝরেই পড়ল অনাথের চোখ থেকে, এবার অবশ্য হাসির সঙ্গে মিশে।

এর পর কে যেন প্রশান্তকে ভেতর থেকে ঠেলে নিয়ে গেল স্বাতিদের বাড়ির দিকে। টাকা বের করে দিয়ে অনাথকে হাটের দিকে বিদায় ক'রে জীপটা গ্যারেজ থেকে বের করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অত যে সংকোচ, সমর্থ মেয়ে ঘরে, বিনা প্রয়োজনে গিয়ে পড়া, সেটা কোথায় যেন উবে গেল, যেন ধর্তব্যের মধ্যেই কিছু নয়।

একটা ওজুহাত ঠিক করে নেবে। পথেই। তার জন্য অপেক্ষা করতে পারছে না। মিথ্যা অযথা বলে না, তবে মিথ্যার ওপরে হঠাৎ একটা শ্রদ্ধা এসে গেছে ; মিথ্যা যে এমনভাবে সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারে, দোষের ভাগী না ক'রে, কোন রকম খুঁত না রেখে, এতে সত্যই একটা ভরসা এসে গেছে। রাস্তাতেই হাতড়ে বের করে নেবে একটা মানানসই ওজুহাত, যেমনটা অনাথের কাছে চালিয়ে দিল, কর্জ দিচ্ছে ব'লে।

হাতঘড়ি উল্টে দেখল সাড়ে চারটে বাজে। না বিকেল, না

সন্ধ্যা। একটু না হয় বসেই যাবে? না, বরং বলবে আফিস থেকে বাসায় আসবার পথে একবার ঘুরে যাচ্ছে, ভেবেচিন্তে আসা নয়, আকস্মিক খেয়াল।

ভালোই হোল। মিথ্যার বন্যা যে নেমেছে মনের মধ্যে, তা অনেক সমস্যাই একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আর সামান্য দেরি করলেও শুভলগ্নটা বেরিয়ে যেত।

জীপ ছেড়ে ও ও-বাড়ির পথটাতে নেমেছে, ওদিক থেকে স্বাতির বাপ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন; পেছনে স্বাতি। একটু থমকে গেলেন ওকে দেখে, দুজনেই।

প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে বলল—"আপনি কোথায় যেন বেরুচ্ছেন; তাহলে ভালোই আছেন। আফিস ফেরত ভাবলাম একবার দেখে আসি। অনাথকে বলেছিলাম খবরটা দিয়ে আসতে, তা……"

"হাটের দিকে গেছে সে, হয়তো ফেরবার সময় আপনার বাসা হয়ে আসবে। আসুন ভেতরে।" স্বাতিই বলল। বাপের দিকে চেয়ে বলল—"বাবা তাহলে একটু ব'সে যাবে?"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন কর্ত্তা, একটু যেন বিব্রতও। বললেন —"আমি না হয় চট করে একটু ঘুরেই আসব? তোমরা গল্প সল্প করনা একটু ততক্ষণ।"

একটু অস্বস্তি এসেই গেল—অবশ্য শুধু স্বাতি আর প্রশান্তর মধ্যে। তবে প্রশান্তর আজ জোগাচ্ছে বেশ, বলল—"তেমন দরকার থাকে তো না হয় আমার জীপে ক'রে ঘুরিয়ে আনতাম আপনাকে।"

এবার অস্বস্তিটা কর্তার; সে বিব্রত ভাবটা গেছে বেড়ে। যেন তারই প্রতিষেধ হিসেবে একটু গা এলিয়ে বললেন—"না, আপনি মিছিমিছি আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন? একে অফিস থেকে সোজা চলে এসেছেন।……না গো মা স্বাতি, চলো বসিইগে ভেতরে গিয়ে। উনি কষ্ট করে এলেন খোঁজ নিতে। অনাথ আসুক, ওঁদের নাহয় বলে পাঠাব'খন কাল সকালে আসব।……ক্ষীরির দিদিমা তাহলে চ'লে যাক বাড়ি, আর দরকার কি?"

চৌকাট ডিঙোতেই একটা পরিবর্তন চোখে পড়লো প্রশান্তর। সামনের ঘরের চালাটা মেরামত হয়েছে, আর একটু যেন সাজানো ঘরটা। কিছুই নয়, দেয়ালের একধারে তিনটে নূতন-কেনা মোড়া, বসবার জন্য, অন্যদিকে একটা চৌকি, মনে হোল সেই ভেতরের চৌকিরই একটা যেন মেরামত করে এনে রাখা হয়েছে; তার ওপর একটা নূতন মাদুর পাতা। ছবিওলা একটা দিনপঞ্জি টাঙানো রয়েছে, দেওয়ালে।

এই ঘরেই, বোধহয় একটা মোড়ার ওপরই বসবার জন্য পা বাড়িয়েছে; স্বাতি বলল—"আসুন ভেতরেই বসবেন চলুন।"

একটু অপ্রতিভ ভাবেই বলল। কর্তাও বললেন—"হ্যাঁ তাই চলুন, একটু গরমও আছে ওটা।"

যেন স্বাতির ভেতরের সংকোচটা প্রকাশ ক'রে দিয়েই একটু হেসে বললেন—"এটা অনাথ বৈঠকখানা করে সাজিয়ে রেখেছে—লাটবেলাট কেউ এসে গেলে ..."

ভেতরের ঘরে একটা চৌকি, তবে তার ইটগুলো সরে কাঠের পায়া বসেছে, গোটানো বিছানার নীচে একটা নূতন মাদুর পাতা। পরিবর্তনের দীনতার কোথায় যে একটা লজ্জা রয়েছে তার জন্যে এবারেও অপ্রতিভভাবেই চৌকিটার দিকে দেখিয়ে স্বাতি বলল—"বসুন।.......বাবাও বোস' তুমি।"

একটু বিব্রতভাবে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"আমি অনাথ কাকার বৈঠকখানা থেকে একটা মোড়াই তুলে নিয়ে আসি।"

হেসেই কথাটা বলে পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া তুলে নিয়ে এসে বসল সামনাসামনি হয়ে। অর্থাৎ এ-নূতন ব্যবস্থার মধ্যে ও নেই; একা অনাথেরই মাথা থেকে বেরিয়েছে সবটুকু।

চালু হয়ে এল আলাপ ক্রমে। ঐ মিথ্যা কথাটা ধরেই—অনাথ খবরটা দিয়ে এল না—কাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে—তবে হেড আফিস থেকে বড় সাহেব হঠাৎ ইন্‌সপেক্‌শনে আসায় নড়তে পার'ছল না। ইন্‌সপেক্‌শনের কথা নিয়ে কাজের প্রকৃতির সম্বন্ধেও

কয়েকটা ফিকড়ি বেরুল বাপ-মেয়ের কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নে—শুনেছে তো খুব বড় কাজ—এত প্রত্যক্ষভাবে জানবার তো সুযোগ পায় নি এর আগে,প্রধানতঃ ঐ অবলম্বন করেই আলাপ আলোচনা চলল।

একটা জিনিস প্রশান্তর দৃষ্টি এড়ালো না; সেই ছমছমে ভাবটা যেন লেগেই রয়েছে কর্তার, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। আর, এবার শুধু ওঁরই নয়, যেন স্বাতিরও। অনেকটা, কেউ এসে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বসে থাকলে যেমন হয়। কর্তার দিকটা বোঝা যায়, যেন হয়েই আসতে চান সেই কোন্ কাজের জায়গা থেকে; তবে স্বাতির দিকেরটা ঠিক বুঝতে পারছিল না প্রশান্ত। এও ভাবছিল, হয়তো সন্দেহই, তার ওপর হঠাৎ মাঝখানে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে উঠতে পারছিল না। তারপর এক সময় এক জায়গায় শেষ করে দিয়ে উঠেই পড়বে, এমন সময় অনাথ বেশ হন্তদন্ত হয়েই রেশনব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে মুখে প্রশ্নটা নিয়েই প্রবেশ করল—"ইন্‌জিয়ারবাবু এয়েছেন কলোনী থেকে?"

চৌকাঠে পা দিয়েই প্রশান্তকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে কি বলতে যাচ্ছিল—আজ মিথ্যেটা বেশ রপ্ত করা আছে বলেই প্রশান্তর জুগিয়ে গেল, বলল—"কি করব? তুমি তো এলে না আমায় খবরটা দিতে·······"

বুঝল কি বুঝল না, ও প্রসঙ্গটাই ছেড়ে দিয়ে ভেতরের দিকে এগুতে এগুতে অনাথ স্বাতিকে ডেকে বলল—"মা-মণি একবার এসো তো ইদিকে শীগ্‌গীর।"

সেই ছমছমে ভাবটা এক মুহূর্তেই সরে গিয়ে স্বাতির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে প'ড়ে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বলল—"আপনি একটু বসুন, আসছি এখুনি।"

একটু পরে ও ঘরে আসতে প্রশান্ত আবার উঠতে যাচ্ছিল, বলল—"বসে যান একটু, চা খেয়ে যাবেন। এক্ষুনি হয়ে যাবে আমার।"

যেন কোন আপত্তি শুনবে না বলেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল।

চায়ের সঙ্গে নিয়ে এল খানিকটা হালুয়া, চারখানা বিস্কুট।

ঐ ছিল ওর অশান্তির কারণ এতক্ষণ। একটা লোক বলছে অফিস থেকেই সোজা এখানে চলে এসেছে, তাকে একবার মুখ ফুটে বলতে পারা যাচ্ছে না কিছু না হোক চাটুকু দিয়েও একটু সংকার করি। প্রশান্ত যখন আপত্তি করল—ঐ কথাটাই বলল, সোজা তো অফিস থেকে এখানেই চলে এসেছে। এমন একটি সূক্ষ্ম হাসির আমেজ ঠোঁটে করে বলল, প্রশান্তর বুঝতে বাকি রইল না, অনাথের মুখে ইতিমধ্যে সব শুনেছে। হয় অনাথ তখন তার ইঙ্গিতটা ধরতেই পারেনি, না হয় উৎসাহের মাথায় তার মা-মণিকে সব বলেই দিয়েছে বিকালের কথাগুলো। খুব বড় গলা ক'রে বলবার কথাও তো। একটা ভয় লেগেই রইল, টাকার কথাটাও না ফাঁস করে দিয়ে থাকে।

এই নিয়ে বার দুই স্বাতির কাছে প্রশান্তর মিথ্যা ধরা পড়ল, প্রথমবার সেই মোটর নিয়ে। সেই দুর্যোগের রাত্রে, প্রথম দিন।

স্বাতি হাসে বেশ সামলে নিয়েই, কিন্তু যত সামলাবারই চেষ্টা করুক, ফুটেই ওঠে হাসিটুকু।

[দশ]

অনাথ যে এত শীঘ্র এসে পৌঁছাল তার কারণ সে হাটে যায়নি।

হাটে যাবে বলে খানিকটা এগিয়েছে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আসার সময় প্রশান্তর পায়ের ধূলা নিয়ে আসা হয়নি আজ। ভুলই একটা, কলোনী ছাড়িয়ে খানিকটা চলেও এসেছে, এগিয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু অস্বস্তিটুকু বেড়েই চলল। প্রথম দিন অত ঘটা ক'রে পায়ের ধূলা নিল, অমন লাগসই কথাটাও বলল প্রশান্তর আপত্তিতে, আর, আজ কোথায় আরও ঘটা করে নেবে, না, ভুলেই চলে এল

একেবারে। অস্বস্তিটা বাড়তে বাড়তে এক সময় দাঁড়িয়েই পড়তে হোল।

তবু, শুধু এর জন্যেই ফিরে যেতে কেমন একটু যেন লজ্জাও করে। দোমনা হয়ে দাঁড়িয়েই রইল একটু। তারপর একটা বুদ্ধি খাটাল। দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখল লোকজন কেউ নেই এদিকটায়। রাস্তার ধারেই একটা বনগ্যাঁদার ঝোপ, আর একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গামছাটা পাকিয়ে একটা ছোট্ট বিড়ের মত করে তার একধারে একটু ঘন ডালপালা দেখে লুকিয়ে রাখল।

তারপর ফিরে চলল।···মনটা বেশ হাল্কা হয়েছে। একটা যে খাশা বুদ্ধি জুগিয়ে গেল তালের মাথায়, তার জন্য আরও হাল্কা হয়েছে। বলবে গামছাটা ভুলে ফেলে গেছে—বলবে, সেদিন প্রশান্ত যে বলল, ওর পায়ের ধূলার আর দাম কি, তা দেখুক মিলিয়ে আছে কিনা দাম,—না নিয়ে যাওয়ায় খানিকটা বাজে মেহনৎ তো করতেই হোল। পাবে না ওখানে, তা, তাতে তো পায়ের ধূলার মাহাত্ম্য আরও বেড়েই যাবে—অত বড় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে একটা গামছাও হারাবে না ?

ওর মনটার মধ্যে সরলতার সঙ্গে একটা ছেলেমানুষী আছে, সেটা বেড়ে গেছে আজ, যা সব হোল তাতে কম একটা আনন্দের জোয়ার তো ঠেলে উঠছে না মনে।

গিয়ে দেখল প্রশান্ত নেই। ঠাকুর চাটুজ্জ্যে বলল—এইমাত্র মোটরে করে তাদের বাড়ির পথেই বেরিয়ে গেল। প্রশ্ন করে জানল, কিছু বলে যায়নি, তবে অফিসের কাজে দূরে কোথাও যায়নি, তাহলে বলেই যায় সাধারণতঃ।

একটু নিরাশ হয়েই ভাবতে ভাবতে ফিরছিল, তারপর হঠাৎ খেয়ালটা উঠল মাথায়। হাটে আর গেল না। কলোনীর নিজের প্রয়োজনের জন্য একটা কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স আছে, নিত্য-প্রয়োজনের সব রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। গামছাটা বনগ্যাঁদার ঝোপ থেকে তুলে নিয়ে এসে সেইখানেই গিয়ে ঢুকল। র‍্যাশন

ব্যাগে টিনের ঘি, মাখন, সুজি, ময়দা, চা, চিনি, বিস্কুট প্রভৃতি যা কিছু আঁটাতে পারল, তাড়াতাড়ি কিনে পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে। …গেছে নিশ্চয় ওঁদের বাড়িতেই প্রশান্ত। না গিয়ে থাকে অন্য দিন কাজে লাগবে। অনিশ্চিতই বা কেন?—একদিন কর্তাকে দিয়ে নিমন্ত্রণই করাবে দু'জনকে মা-মণির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে …চিঠি দিয়ে আসবে কর্তার—অত আত্মীয়তা ক'রে অসুখের কথা শোনামাত্রই ছুটে ছিল দুজনে, দুটো ফিয়ের টাকা ঠেকিয়ে দিয়েই দায়িত্ব সারা হয়ে গেল? লাহিড়ীবাড়ির তাই নাকি প্রথা?—তাই নাকি হয়ে এসেছে এতকাল?…

চিন্তার মধ্যেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরে দেখল, জীপটা ওদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খুশির ঝোঁকেই আরও এক কাণ্ড করে বসল অনাথ। স্বাতি চা, হালুয়া, বিস্কুট নিয়ে এসে প্রশান্তর সামনে চৌকির ওপর রেখে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করছে, অনাথও চা আর একখানা রেকাবিতে হালুয়া আর বিস্কুট এনে কর্তার সামনে দাঁড়াল। এতই আকস্মিক যে কর্তা যেন বিস্ময়ের কূল পাচ্ছেন না। স্বাতিও এমন হাঁ করে ওর মুখের পানে চেয়ে আছে যে বেশ বোঝা যায় তাকেও এ সম্বন্ধে কিছু জানায়নি অনাথ; কিছু একটা ব'লে—হয়তো নিজের খাওয়ার কথাই—খানিকটা বেশী আয়োজন করে গেছে। অনাথ নিজে কিন্তু একেবারেই সপ্রতিভ। কর্তার বিমূঢ়ভাব দেখে বলল—"সে তো বুঝছি, কিন্তু আপনি না খেলে ঐ উনি খাবেন?……দেখুন না হাত গুটিয়ে বসে আছেন।……কি ইন্‌জিয়ারবাবু?"

বিস্ময়ের সীমা নেই প্রশান্তরও, একটু আগেই তো ওঁর চা-ছাড়ার কাহিনীটা ওরই মুখে শুনল। কাপটা তোলবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল একটু, অপ্রতিভভাবে টেনে নিয়ে বলল—"না…… ওঁকেও খেতে হবে বৈকি।"

"ঐ দেখুন। আর ডাক্তারবাবুও কি বলেছেন তাও শুনুন……" শোনাবার জন্যে চেয়ে রইল প্রশান্তর মুখের দিকে।

প্রশান্ত যন্ত্রচালিতের মতো বলল,—"বলছিল বৈকি রজত—অনাথও ছিল তো—বলছিল—এই সময় ওঁর একটু খাওয়ার দিকে নজর রাখা—আর চা'টা একটা মাইল্‌ড স্টিমুলেণ্ট্‌ও তো—তাছাড়া নূতন শীত পড়েছে······

"তা, রাখবি তবে তো খাব, না, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকবি ?"—প্রশান্তর স্খলিত কণ্ঠের চায়ের গুণগানের মধ্যেই অনাথকে কথটা বলে, প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"ও ব্যাটার পাল্লায় পড়বেন না আপনি।"

যেন দুজনের একটা চক্রান্তের মধ্যে পড়ে নিরুপায় হয়েই চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। একবার চাইলেনও অনাথের দিকে। অনাথ স্বাতির দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"তুমিও গিয়ে একটু মুখে দিয়ে নাও গো মা মণি, নাহক বেঁজি-বেড়ালের পেট ভরিয়ে তো লাভ নেই। আমি রইলুন এখেনে।"

গোঁফ জোড়াটা ফুলিয়ে তার ওপর দিয়ে ডান হাতের চেটোটা টেনে দিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু সেই পেতল বাঁধানো লাঠিটা হাতে নেই।

স্বাতির পেটে হাসি গুড়-গুড়িয়ে উঠছিল, পালিয়ে বাঁচল।

ওদের খাওয়া হয়ে গেলে অর্ধেক হালুয়াসুদ্ধ কর্তার রেকাবিটা তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল অনাথ। একবার প্রশান্তর খালি রেকাবিটার ওপরও নজরটা গিয়ে যেন তেরছাভাবে পড়ল। সবটুকু না খেয়ে পরিত্রাণ নেই ভেবে প্রশান্ত খালি করে ফেলেছিল, মনে হোল যেন একটু নিরাশ হয়েছে অনাথ। মনে পড়ে গেল ওর পায়ের ধূলার মাহাত্ম্যের কথা—আর কিছু না হোক, হয়তো প্রসাদ হিসেবেও কিছু আশা করেছিল।

একটা পর্ব শেষ হোল। অপ্রীতিকর নিশ্চয় নয়, তবে খানিকটা অস্বস্তিকর তো বটেই ; স্বাতি ফিরে এলে আবার চালু হোল গল্পসল্প। এবারে যেন আরও একটু বেশ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে দিয়ে। সদ্য-অফিস-

ফেরত অতিথির অসংকারের চিন্তা নেই স্বাতির মনে; সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসতে কোথায় সেই যাওয়ার তাগিদটা সরে গেছে কর্তার মন থেকে, প্রশান্তরও কোন ব্যস্ততা নেই। অধিকন্তু লাগছেও বেশ ভালো। আজ মনটা তো নানা কারণেই আছে বেশ ভালো। তবু একবার নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে যখন ওঠবার কথা বলল, কর্তাই বললেন—"তাড়াতাড়ি কিসের? গাড়ি রয়েছে, উঠে বসলেই তো পৌঁছে যাবেন।"

যেন আপনা হতেই প্রশান্তর দৃষ্টি একবার স্বাতির দিকে ঘুরে গেল। বাপের কথায় উৎসুক দৃষ্টিতেই চেয়েছিল ওর মুখের পানে, একটু যেন থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে বলল—"আর যেমন একটানা খাটুনি গেছে বলছেন কাল……"

"তা বইকি, একটু রিল্যাক্সেশন্ দরকার।" —কর্তা ওর কথাটা পূর্ণ ক'রে দিলেন। বললেন—"মাঝে মাঝে তো চলে এলেই পারেন, গাড়ি রয়েছেই, আর এই তো পথ।"

প্রশান্ত হেসে বলল—"আমরা হাতুড়িপেটা মানুষ, বেশ তো খাপ খাই না সব জায়গায়, সেই ভয়।"

কর্তা বোধহয় কলম-পেষাদের সঙ্গর অভিজ্ঞতা নিয়েই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, থমকে পড়তে স্বাতি বলল—"ওটা আমাদের মতন লোকেদের পরিহার করে থাকার একটা মিথ্যে ছুতো, তাই না বাবা? যাদের হাতে হাতুড়ি-বাটালি তারাই তো আজকের পৃথিবীটা গড়ে তুলছে। বলুন।"

দু'সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে প্রশান্তর দিকেই অনুযোগের দৃষ্টি তুলে বলল—"একটা মিথ্যে অপযশ জিনিসগুলোর।"

কর্তার মনে ঘুরে এসেই গেল নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা খানিকটা। তবে লঘুকণ্ঠেই একটু হেসে বললেন—"কলমের যশটাই কি সত্যি মা, অন্ততঃ যতখানি করে তোলা হয়?"

তারপর যেন ওটুকু তিক্ততাও মন থেকে মুছে ফেলে বললেন—"থাক্ স্কুল-ডিবেটের সেই—'পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড'

(Pan is mighties than the sword)—না, বলব হ্যামার (Hammer) ?"

বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ দাঁড়িয়ে গেছে, যার জন্যে এক সময় প্রশান্ত ওঁর ওকে সমাই করে 'আপনি' বলবার জন্য অনুযোগও করল, তারপর আরও একটা প্রসঙ্গ এনে ফেলল যেটা কতকটা যেন অনধিকারচর্চার মতোই শোনায়।

বিশেষ করে সে-বিষয়ে আগেই একটু কৌতূহল দেখিয়েছিল বলে। বলল—"আপনি যেন কোথায় যাচ্ছিলেন আজ, আমিই বাধা হয়ে দাঁড়ালাম, ঠিক করেছেন সকালে যাবেন।"

সঙ্কোচটা যায়নি দেখে বলল—"আমি তাহলে মটোরটা পাঠিয়ে দিতে পারতাম। না, নিজে আমায় আসতে হবে না। ড্রাইভিং জানে এমন লোক আছে আমার।"

একটু ছন্দপতন হোলই যেন। একটু অপ্রস্তুত হয়েই এসেছে প্রশান্ত, লাহিড়ীমশাই হেসেই বললেন—"ব্যবস্থাতো ভালই। কিন্তু যাওয়া আসা ক'রে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেলেই পাওয়ার মতন কাজ; রথে চড়ে গেলে চলবে না। ....না গো মা স্বাতি ?"

মুখটা নাচু ক'রে একটু ম্লান হাসি হাসল স্বাতি।

কর্তা আর স্থায়ী হতে দিলেন না ঘরের এ গুমোট ভাবটা। হেসেই প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললেন—"মাষ্টারির উমেদারি...... প্রাইভেট টিউটার।"

আজ দুষ্টু-সরস্বতী যেন জিহ্বায় আসন পেতেছেন প্রশান্তর; মিথ্যা-সরস্বতী বললেই আরও স্পষ্ট হয় কথাটা। শুধু কি করে যে সত্যের, কল্যাণের ফসল ফলিয়ে যাচ্ছেন তা এক তিনিই জানেন। একটু দেরিও তো হোল না, ওঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে করবার মতো ক'রে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—"এই দেখুন, আসল কথাটাই ভুলে বসে আছি, যার জন্যে অফিস থেকে ছুটে আসা। অনাথের চা-হালুয়া চাপা দিয়ে দিলে নাকি ? রজত আমায় বলছিল—ওর বোনের বছর দুয়ের মধ্যে ম্যাট্রিকটা প্রাইভেট করিয়ে দিতে চায়—

লোক খুঁজছে—তা এ অজ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে—শেষে আমার হঠাৎ মনে পড়ে যেতে……তা আপনি যদি দয়া ক'রে……"

—হঠাৎ সাফল্যের উত্তেজনায় শরীরটা একটু একটু কাঁপছে, মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লাহিড়ীমশাই হেসেই শান্ত কণ্ঠে বললেন—"তা বেশ তো, আসবে।"

কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল সাফল্যের বাধা আছে। সেইটুকু আন্দাজ করেই "কিন্তু……" বলে কথাটা স্পষ্ট করতে যাচ্ছিল, উনিও যেন উদ্দেশ্যটা আন্দাজ ক'রেই হেসে বললেন—"কিন্তুর কিছু নেই তো। যথেষ্ট সময় আমাব। আর, পথও বাঁধা।" স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন—"কি গো মা ?"

উল্লসিত হয়ে উঠেছে স্বাতি, তবে উদ্দেশ্যটা ও-ও বুঝেছে, তাইতে উল্লাসটা চাপা। বলল—"আমি তো তাহলে বর্তে যাই বাবা। আর কিছু না হোক, সঙ্গী পাই একজন। মরে গেলুন যে!……তুমি সেখানে পড়াতে গেলেও বসিয়ে রাখব।"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত বলল—"আমি ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম—আর বাইরে পড়াতে যাওয়ার কথা আসে না তো……।……তাহলে আমার মনের সন্দেহটা বলেই ফেলি—আপনি বোধ হয় বলতে চান……"

"বুঝেছি। আপনি বোধ হয় চান আপনাদের কাছ থেকে একটা দক্ষিণা আদায় করি।" —ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললেন লাহিড়ীমশাই।

একটু যেন এলিয়ে গেল প্রশান্তর দেহটা। "তাহলে…" বলে একটু নিষ্প্রভ ভাবেই আরম্ভ করেছিল, আবার বেশ সোজা হয়েই বসে বলল—"সে আমার বোন হ'লে হ'তে পারত। রজত রাজি হবে না যে।"

"কেন ?"

"কেন ?…… কেন ?……"

কারণটা বের করাবার জন্যেই যেন ঘুরে ফিরে চাইল একটু

চারিদিকে, তারপর উৎসাহের সঙ্গেই বলে উঠল,—"বাঃ, আপনি তো নিজেই সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন—ফি'টা নেওয়ালেন না জোর করে সেদিন ?"

যুক্তিটা কি হতে পারে আগেই বোধহয় স্বাতির মাথায় এসে গিয়েছিল, বাপের পরাভবে মুখটা ঘুরিয়ে এবার স্পষ্ট করেই হেসে ফেলল। তবে তখনই আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েই বাপকে সমর্থন করে প্রশান্তকে বলল—"ডাক্তারের ফি আর টিউটারের মাইনে ?"

"বাঃ, তফাতটা কোথায়, বলুন ? না স্বাতি দেবী, আপনি অন্যায়ভাবে ওঁর পক্ষ নিচ্ছেন। যুক্তি কোথায আপনাদের দিকে ?··· না, আপনি অন্ততঃ আমার দিকে হোন—মানে, যুক্তির দিকে আসুন। অন্ততঃ এই জন্যে যে বিশাখার পড়াটা তাহলে বন্ধই থাকবে। বেশ, উনি অল্প নিন, কিন্তু একেবারে কিছু না নেওয়ার পথ উনি নিজে হতেই যে বন্ধ করে দিয়েছেন এ কথাটা মানতেই হবে—আপনাদের দু'জনকেই।"

[এগারো]

একটা দিনে ঘটনাস্রোত একেবারে এতটা এগিয়ে যাবে এটা কেউ আশা করতে পারেনি। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দু'দিকের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। দুই বন্ধুতেই এই দুঃস্থ পরিবারটিকে যতদিক দিয়ে সাহায্য করা যায় তার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠল।

ভগ্নীর পড়াশুনা নিয়ে রজতের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। অনেকটা নিরুপায় হয়েই। ব্যাপারটার সঙ্গে ওদের পারিবারিক ইতিহাস জড়িত। বিশাখা ওদের কলকাতার বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করছিল। বাবা ভবানীপুরে একজন প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার, কিন্তু প্রায় বছর দুই পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করায় দুই পক্ষের মধ্যে একটা মনোমালিন্য এসে যায়। এবং কিছুদিনের

মধ্যেই চাকরি পাওয়ার পর রজত পিসিমা আর ভগ্নীকে নিজের কাছে সরিয়ে নেয়। এরপর থেকে চাকরিস্থলই ওদের তিনজনের বাড়ি; বিশাখার পড়াশুনার কোনও নিশ্চয়তা নেই এবং সুযোগ তথা নিশ্চয়তার অভাবে কোন তাগিদও নেই বা পরিষ্কার ধারণা নেই রজতের মনে। ভবিষ্যতে সুবিধা হয়তো নাম লিখিয়ে দেওয়া হবে, ইতিমধ্যে বিবাহের কোন সুযোগ এসে পড়ে তো পড়াশুনা ঐ পর্যন্তই। এই রমক চলছিল।

এক-আধদিন কথাটা উঠেছিল দুই বন্ধুর মধ্যে, একেবারে গোড়ার দিকে, রজত যখন নূতন চাকরি নিয়ে আসে। তাও নেহাত স্থূল-বিতর্কের মতোই; অলস ধূমপানের মধ্যে কতকটা অবসর-বিনোদনের আকারেই। প্রশান্ত সপক্ষে, রজত বিপক্ষে। বিপক্ষে এজন্য নয় যে সে একেবারেই বিরোধী; হয়তো এই কারণেই যে সে অপরাধী, আত্মসমর্থনে না নেমে উপায় ছিল না।

কোন পথ খোলাও তো ছিল না, তাই ও প্রসঙ্গটাও উঠেনি আর। নূতন কাজের হিড়িকে আর মনেও ছিল না, দু'জনের কারুরই। তারপর নিতান্ত আকস্মিকভাবেই প্রশান্ত আবিষ্কার করল একটা পথ। নিতান্ত স্বাতিদেরই একটা সুরাহা হিসাবে। রজত রাজি হয়ে গেল। স্বাতিদের জন্যে একটা সহানুভূতি জন্মেই গিয়েছিল, উপরন্তু বোধ হয় বিশাখারও সুরাহার কথা ভেবে থাকবে। শুধু পড়াশুনার দিক দিয়েও নয়; সেটাতো আছেই। প্রশান্তর সেই বিশাখার পক্ষ নিয়ে তর্ক করাটা ওর ভালো লেগেছিল। একটা নূতন চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে। অবসর সময়ে ভাবে কখন কখন একটা রঙ্গীন সম্ভাবনার কথা।

চারিদিক দিয়েই যতটা সম্ভব সুবিধা করে দিল প্রশান্ত। দুপুরের আহার সেরে খানিকটা বিশ্রাম করে বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময়—আফিসে যায় নিজেই ড্রাইভ ক'রে। ঠিক হোল এর পরই গোপেশ্বর ড্রাইভ ক'রে বিশাখাকে রেখে আসবে স্বাতিদের বাসায়। ওর ফিরে আসবার ব্যবস্থা হোল-সন্ধ্যার একটু আগেই :

মোটামুটি ঘণ্টা দু'য়েক পড়াশুনা ক'রে। মাইনের কথা ওরা কি করে তুলবে ভাবছিল, লাহিড়ীমশাই নিজে তুলে সহজ করে দিলেন। একটু হেসে বললেন,—"এর মধ্যে আসল কথাটাই তুলতে দেখছি আপনারা ইতস্তত করছেন। আমি বলি—ওটা থাকই না, আমি না হয় বেশি ক'রে অসুখে পড়েই কল দোব, শোধ হয়ে যেতে থাকবে।"

ওরা দু'জনে ঠিক করল—ও-কথা আর তুলবে না, যথাসময়ে বিশাখা গিয়ে পায়ের কাছে পাঁচখানি ক'রে দশ টাকার নোট রেখে দেবে।

তাও করা হোল না শেষপর্যন্ত। মাসটা পূর্ণ হয়ে এলে সাত-পাঁচ ভেবে প্রশান্ত এ-বিষয়ে স্বাতিকে নিজেদের যুক্তি পরামর্শের মধ্যে নিয়ে আসাটা সমীচীন ব'লে মনে করল। যেটা আন্দাজ ক'রে করল, দেখল সেটা ঠিকই। স্বাতি বলল—হাত পেতে কিছু নেওয়া, বিশেষ ক'রে এমন লোকেদের কাছ থেকে যাঁরা ওদের এতবড় বন্ধু হয়ে উঠেছেন, ওঁর পক্ষে শুধু কষ্টকর নয়, বাধ্যতার মধ্যে মর্মন্তুদই হয়ে পড়বে। ওরও ইচ্ছা ছিলই না, তবে রজত যে শুনবে না, এবং পরিণামে মাঝখান থেকে বিশাখার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, প্রশান্ত বুঝিয়ে দিতে এ কথাটা বুঝল। ও ভেবেচিন্তে পরামর্শ দিল—লেনদেনের ব্যাপারটা নেপথ্যেই থাক—টাকা পয়সার দিকটা অনাথই দেখে এসেছে, কি এল না এল ওই দেখবে।

বেশ ভালো সমাধান। প্রশংসা করল প্রশান্ত; আরও মাসখানেকের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে প্রশংসার অনেক কিছু তো পেয়েছে আরও, জিভ চুলকায়। বলল—"যে বলেছিল স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ংকরী তাকে একবার দেখবার ইচ্ছা হয় স্বাতিদেবী, বোঝাপড়া করতে চাই তার সঙ্গে।"

বলবার ঝোঁকে ডান হাতটাতে আপনিই ঘুষি পাকিয়ে গেছে, সেইদিকে একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে স্বাতি হেসে বলেছিল—"আমি মেয়েদের দিক থেকে তার ওপর শোধ নিয়ে বিশেষণটা না হয়

আপনাকেই দিচ্ছি, তাতে যদি শান্ত হন। একটা প্রলয়েরই তো তোড়জোড় দেখছি।"

হ্যাঁ, অনেকখানিই কাছাকাছি হয়ে পড়েছে দু'জনে এই একটা মাসের মধ্যে। তার একটা কারণ ওদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া রয়েছে—একটা কথা যা বাইরে গোপনীয়, কিন্তু ওদের নিজেদের নয়! সেটা হচ্ছে, ওর বাবাকে যতটা সম্ভব নিশ্চিন্ত এবং এ-অবস্থায় যতটা সম্ভব সুখী করে রাখতে হবে, এবং তা অনেক কিছুর সহযোগে যার সম্বন্ধে উনি কিছুই জানেন না, জানবে শুধু প্রশান্ত আর স্বাতি।…… ··গোপন কথা হোল আত্মীয়তার স্বর্ণসূত্র।

স্বাতিদের এখানে প্রশান্তর আসাটাও গেল বেড়ে। রজতের এখানে একটু একটু করে পশার হচ্ছে। সমস্ত তল্লাটটা বিরল-বসতি, তবে দূরে দূরে কয়েকটা বড় গ্রাম আছে, কিছু কিছু ক'রে ধনী লোকও, ভালো ডাক্তারের চাহিদা আছে। যানবাহন সাইকেল কিংবা গোরুর গাড়ি। আরম্ভ হোল তাইতেই; পরে প্রশান্ত যখন টের পেল, জীপেরই করল ব্যবস্থা। প্রথমে গোপেশ্বরই রইল নিয়ে যেতে নিয়ে আসতে, তবে ইতিমধ্যে বন্ধুকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে এবিষয়ে আত্মনির্ভর করে তুলল। রাস্তা খারাপ (সব জায়গায় যেতেও পারে না জীপ) তবু পথ চলার দিক দিয়ে জীপগাড়ি অনেকটা সব্যসাচীই। রুগীর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে, নেহাত না পারলে, সাইকেলটাকে ঘাড়ে ক'রে নেয়, নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, রজত বাকি পথটুকু তাইতেই নেয় সেরে। তবে জীপের সাহায্য নেয় কমই; তেমনি দূরে হোল, কিংবা তেমনি খারাপ কেস্, তবেই। একদিন বিকালে এইরকম একটা কলে গিয়ে আটকে পড়ল। যখন ফিরল, রাত প্রায় আটটা। লাহিড়ীমশাই খবর নিতে অনাথকে পাঠিয়েছেন, আরও একটু দেখে নিয়ে প্রশান্ত নিজই উঠবে বিশাখাকে নিয়ে আসবার জন্য, এমন সময় রজত এসে উপস্থিত হলো! কেস্টা খুব বাঁকাপথ ধরেছিল, ভালো করে সামলে দিয়ে তবে এসেছে।

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গেই জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল অনাথকে তুলে নিয়ে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতে পারল না। অনাথকে সন্ধ্যার পরই পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু অনাথ মানেই গল্প, তাই সে সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে স্বাতি এর মধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসেছে। প্রশান্ত গিয়ে ছ্যাখে বাড়ির এদিকে কেউ নেই; ভেতরের দিকে গিয়ে ছ্যাখে লাহিড়ীমশাই রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে পিরিচ আর একহাতে কাপ নিয়ে চা পান করছেন, ভেতরে কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্বাতি কড়ার মধ্যে প্রবলবেগে খুন্তি নেড়ে যাচ্ছে, একটু তফাতে বিশাখাও অনুরূপ সজ্জায় বাটনা বাটায় রত! পেছন থেকে অঙ্গ সঞ্চালন আর শিল-নোড়ায় শব্দ-সঞ্চার দেখে মনে হয় কাজটাকে যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়েই সমস্ত শক্তি নিয়ে লেগে গেছে সে।

কড়া-খুন্তি আর শিল-নোড়ার দ্বৈতনির্ঘোষের জন্যই এদের আসার কথাটা টের পাওয়া যায়নি, লাহিড়ীমশাইয়ের নজরে পড়তে উনি স্বাতিকেও বললেন। স্বাতি ঘুরে দেখে কোমরে জড়ানো আঁচলটা খুলে তাড়াতাড়ি সম্বৃত করে নিল নিজেকে, বিশাখাও। দাঁড়িয়েও উঠল বিশাখা।

সঙ্কোচের মধ্যে পড়ে গেল প্রশান্তও; হঠাৎ-ই তো, আর গার্হস্থ্যের একেবারে মাঝখানটিতে। তবে সঙ্কোচটা উভয় পক্ষেই খুব ক্ষণস্থায়ীই হোল। একটা অন্য ফিকড়ি বেরুল ব্যাপারটুকুর মধ্যে থেকে। প্রশান্ত ভেবেছিল স্বাতিদের নিজেদের জন্যেই রোজকার মতো রাত্রির আয়োজন। সেই হিসাবেই যখন বিশাখাকে বলল ও সামলে দিক, ঘরে গিয়ে বসছে প্রশান্ত, লাহিড়ীমশাই জানিয়ে দিলেন আয়োজনের মধ্যে ওরাও এসে পড়েছে, বরং ওদের তুজনই আসল উপলক্ষ্য। এরপর একদিকের আপত্তি আর এক-দিকের জিদ-অনুরোধের মধ্যে সঙ্কোচটা কেটে গিয়ে সব বেশ সহজই হয়ে এল।

জিদটা অবশ্য স্বাতির দিক থেকেই বেশি। ভেতরের কথা—

অনাথকে পাঠিয়ে দিয়েই ও মতলবটা এঁটে কাজে নেমে পড়েছিল, কিন্তু যুক্তি হিসাবে সোজা কথাটাই ধরল, বলল—বিলম্ব দেখে করতে হয়েছে ওকে ব্যাবস্থাটা—ও তো ধরে নিয়েছিল, বিশাখাকে তাহলে বুঝি থেকেই যেতে হোল রাত্রিটা ; তা শুকিয়ে তো রাখা যায় না।

তর্ক উঠল একটু। প্রশান্ত বলল—"বেশ তো, তা খেয়ে নিক বিশাখা। যেমন বলছেন আমার জন্যে আয়োজন তো হওয়ার কথাও নয়।"

"বিশাখা যে বললে আপনি নিশ্চয় আসবেনই নিতে।" স্বাতি তর্ক তুলল। "তাহলে আয়োজনের দরকারটাই তো ছিল না"—উত্তর দিল প্রশান্ত।

"বাঃ।..... তা কেন ?......তা কি ক'রে হয় ?......বাঃ।"—খুন্তি হাতেই একটা ভালো উত্তর খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল স্বাতি ওর দিকে চেয়ে, তারপর যেন হার মেনে ওদিকটাই ছেড়ে দিয়ে বলল—"নাঃ, আপনি বসুন গিয়ে ভেতরে। নিয়ে যাও বাবা তুমি ওঁকে। একে জানিই না রাঁধতে—এর ওপর বাজে তর্ক এনে ফেললে নুন-মসলার গোলমাল হয়ে আরও যে কি কাণ্ড হবে ! · না, খেয়ে যেতে হবে দু'জনকেই।"

আনাজগুলা ভাজছিল, মসলাগোলা ঢেলে দিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজটুকু বন্ধ করে দিয়ে তর্কটা ঐখানেই শেষ করে দিল। আবার লাহিড়ীমশাইয়ের দিকে চেয়ে বলল—"বাবা, শুনলে না ?"

উনি বিশেষ কিছু অংশ গ্রহণ করেননি এই বিতর্কে ; শুধু হাসি দিয়ে মেয়েকে যেটুকু সমর্থন করা যায় তাই করে যাচ্ছিলেন—যেন এই নিশ্চিন্ততার জন্যই যে স্বাতি রেহাই দেবেই না। উপভোগই যে করছেন সবটুকু, পূর্ণ-সমর্থন আছে ওঁর, এটা প্রকাশ পেল অন্যভাবে। স্বাতির প্রশ্নে চায়ের কাপটা একটু বাড়িয়ে ধরে বললেন—"তোমাদের চা আর আছে কেটলিতে ? তাহলে দিতে আর একটু। হয়েছে ভালো।"

সময় পেয়ে আবার তর্ক উঠল। প্রশান্তর হঠাৎ যেন নেশা

ধরে গেছে তর্ক করবার। বলল—বিশাখাও দেখছি ওঁর দিকেই হয়েছ। লেগেও গেছ বেশ উৎসাহের সঙ্গে, তারপর কৈ আমার হয়ে একটা কথাও তো বললে না।"

"ওর এটা গুরুগৃহ।"—কথাটা হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল স্বাতি যে সবার মধ্যেই একটু হাসি পড়ে গেল। ও-ও গাম্ভীর্য ভেঙ্গে যোগ দিল একটু।

প্রশান্ত যেন লাহিড়ীমশাইকে সাক্ষী মেনেই বলল—"এর ওপর তাহলে আর কি বলা যায় বলুন।"

তখনই আবার স্বাতির দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু দেখছি তো গুরুর কাছ থেকে ভাঙিয়েই নিয়েছেন আপনি—নিয়ে নিজের শিষ্যা করে নেওয়ার মতলব এঁটেছেন।"

"ঠিকই তো।" উত্তর করল স্বাতি। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার দিকে চেয়ে বলল —"তুমি ওঁর কোনও কথার উত্তর দেবে না বিশাখা। নতুন গুরুর আদেশ।"

উপভোগ করছিল সবচেয়ে অনাথ। মুখে একটি হাসি নিয়ে পেছন দিকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—"আমারও একটা কথা বলার হক্ আছে মা-মণি, আয়োজন তো বিদুরের খুদ-কুঁড়ো, এর জন্যে আবার ওনাকে কেলেশ দেওয়া কেন? আমিই বাটনাটা······" বলতে বলতে দুপা এগিয়েছে, স্বাতি যেন জ্বালাতন হয়ে বলে উঠলো—"আঃ, তুমিও আবার এলে অনাথকাকা! এখন বাগড়া দেবে, তারপর দেখবে কে বেশী খুঁত ধরতে পার, তোমাদের যা কাজ।" চা ঢালছিল লাহিড়ীমশাইএর কাপটা নিয়ে। বলল—"এঁদের নিয়ে যাও বাবা ঘরে, লক্ষ্মীটি।"

বেশ রাত হয়ে গেল। ওরা যখন ফিরছে, মাঝপথেই রজতের সঙ্গে দেখা; কোন বিপদ আশঙ্কা করে, হয়তো মোটরের কিছু গোলমাল—একজন মেকানিক ড্রাইভারকে নিয়ে আসছিল।

নিজের বাসার বারান্দায় বসে ছিল প্রশান্ত। সময়টা মাঘের শেষ। শীত আছে, বিশেষ করে গভীর রাত্রি তো, তবু সেই শীতল

হাওয়ায় বসন্তও যেন কোথা থেকে এসে তার আঙ্গুল বুলিয়ে যাচ্ছে এক একবার। শুক্লপক্ষের প্রথম দিক—বোধ হয় অষ্টমী কি নবমী, আকাশে অর্ধস্ফুট জ্যোৎস্না। এর সঙ্গে আজ যেটুকু হোল তার কোথায় একটি বেশ মিল রয়েছে যেন—এই রকম নীরব, এই রকম অর্ধস্ফুট। এও কি জ্যোৎস্নার শতদল হয়ে ফুটবে না কোন পূর্ণিমায়?

চাঁদ একেবারে পশ্চিমে নেমে গেলে প্রশান্ত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

[বারো]

মাস কয়েক হয়ে গেল; এর মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে। প্রশান্তর আসা শুধু যে বেড়েই গেছে এমন নয়, একরকম নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকেও যেমন রজতের দিক থেকে আবার বারকয়েক দেরী হয়ে গেল, তেমনি স্বাতিও বিশাখাকে আটকে রাখতে লাগল মাঝে মাঝে। প্রথম দিন মোটর এসে দাঁড়িয়েই রইল, তারপর থেকে অনাথ এসে বলেই যেতে লাগল বিলম্ব হবে। প্রশান্তই গিয়ে নিয়ে আসতে লাগল স্বাতিকে। ক্রমে এই ব্যবস্থাটাই যেন নিঃসাড়েই কায়েমী হয়ে গেল। একটির জায়গায় দুটি ছাত্রী নিয়ে পড়েছেন লাহিড়ীমশাই, সময়ের জ্ঞান থাকে না। এ ছাড়া স্বাতিও ছাড়তে চায় না বিশাখাকে সহজে। অনেক দিক থেকে জড়িয়েও ফেলেছে। তার একটা হোলো বাগান। বাড়ির পেছনে বেশ খানিকটা জমি জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে একটা বাগান করেছে; ফুলপাতায় আরম্ভ হয়েছিল, তারপর তরিতরকারি এনে ফেলে তার বৈষয়িক গুরুত্বটাও বাড়িয়েছে অনাথ।

বাগানটি এখন সকলেরই একটা আকর্ষণ। পড়া শেষ হয়ে গেলে, ওরা দুজনে বাগানেই চলে যায়। অনাথ তো যতটা সময়

পায় দেয়ই, যদি হাট বার না হোল তো এ সময়টাও ওদের সঙ্গেই থাকে। না থাকলেও ক্ষতি নেই, বাড়িটার অন্তরাল রয়েছে, জল সিঞ্চন থেকে নিড়ানি দেওয়া, আবর্জনা পরিষ্কার করা—সব ওরা দুজনেই করে। পাশে একটা ছোট-খাট ডোবাও আছে।

একটা বাঁধা রুটিনের মতো হয়ে গেছে। ওদের পড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে যান লাহিড়ীমশাই। উনি যতক্ষণে ফেরেন, ততক্ষণে প্রশান্তও এসে পড়ে অফিস থেকে পোশাক ছেড়ে সোজা এখানে। কোনদিন যদি ওদের দিকে বেড়াতে গেলেন লাহিড়ীমশাই তো পথেই তুলে নেয়; দুজনে একসঙ্গেই এসে পড়ে। এর পরেই বাগান।

বেশ বাগানটি করেছে স্বাতি। রুচি আছে, এছাড়া গাঁয়ে ভালো বাগানই ছিল। যতটা পেরেছে তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ করবার চেষ্টা করেছে। মাঝখানে বেশ খানিকটা লন্ বা ঘাসজমি, তার চারিদিকে ফুলের গাছ; একটা গেট করে তার ওপর একটি মাধবী-লতা। নূতন নূতন সংগ্রহে মেতে গেছে সবাই, এদিক দিয়েও একটা কাজ বেড়ে গেছে অনাথের। সামনেও যে একটু বাগান তা সম্পূর্ণ তারই চার্জে। বাড়িটাও আর সেরকম নেই যে বাগানটুকু নেহাত বেমানান হবে তার সঙ্গে। অবশ্য কাঠামোটা সেই আছে—তিনখানি ঘর, একটি মেটে রান্নাঘর, মাঝখানে একটু উঠান, ওপরে সেই গোল-পাতার ছাউনি; তবে জানলা বসেছে ঘরের দেওয়ালগুলোও সংস্কার করিয়ে কলি ফিরিয়ে নিয়েছে অনাথ। বাড়তির মধ্যে কঞ্চির বেড়ার জায়গায় ইটের দেয়াল টেনে উঠানটুকু ঘিরিয়ে নিয়েছে। চৌকি দুটাও নিয়েছে ঠিক করে, একটি বাড়িয়েছেও। খরচ হল একটু। তার ব্যবস্থা অনাথই করল।

খরচ করবার মস্ত সুবিধা, লাহিড়ীমশাই ওদিকটা একেবারেই বোঝেন না; কোন কালেই যেমন বোঝেন নি। তবু একটা হিসাব দেখাতে হয়—টাকাটা যোগাড় হবে কোন্ সূত্রে, তারপরে তো খরচ।

একদিন পাড়ল কথাটা কর্তার কাছে। কর্তা প্রশ্ন করলেন—

"আগে দরকারটা কিসের তাই বল আমায়। তারপর খরচের কথা আসছে।" —একটু কড়াভাবেই প্রশ্ন।

এমনতর অবস্থায় উদ্ধত না হয়েও, শক্ত হয়েই জবাব দেয় অনাথ। ধাত বোঝেতো। তোয়ের হয়েই নামে, বলল—"আছে বৈকি দরকার এখন আপনার নজরে যদি না পড়ে। মানলুম মুনিঋষির কুঁড়ে, মাথার ওপর একটা পাতার ছাউনি থাকলেই হোল, যাতে তালপাতার পুঁতিগুলো না বরবাদ হয়। কিন্তু আর চলে ?" পুঁথির ওপর একটা আক্রোশ আছে। লাহিড়ীমশাই ব্যথা পাবেন বলে তোলে না ও প্রসঙ্গ, তবে অবসর বুঝে আবার তুলতেও হয়।

"বুঝলুম পুঁথি মস্ত অপরাধ করেছে, তা দরকারটা কি না হয় খুলেই বললে।

"একটা ভদ্রলোক আসছে বাড়িতে, একরকম নিত্যই। কেউ-কেটা নয়, ধরতে গেলে রেলের একজন কেষ্ট-বিষ্টুই ; আর ঐ একটি মেয়ে, পড়তে আসছে। কী ইস্টাইলে থাকে বাড়িতে, কী আসবাব-পত্র......"

"কিছু বলে ওরা ? নাক সিঁটকোয় ?"—বাধা দিয়েই প্রশ্ন করলেন লাহিড়ীমশাই, ভ্রূ দুটিও কুঁচকে উঠেছে। অনাথ বলল—"ওনারা সেই ধরনের মানুষ ? দেখছ তাই আপনি ?"

"তবে ?"

"নিজেদের একটু আক্কেল করতে হবে তো—কি করছি, কোথায় বসাচ্ছি।"

"সব আক্কেলের গোড়াতেই তো টাকা। তোর বুঝি ঐ পঞ্চাশটার ওপর নজর পড়েছে ? পড়বেই, আমি জানি। তারপর ? চারিদিকে ভেবে দেখতে হয় গেরস্তকে, আর জমিদারি আছে ?"—বেশ একটু অন্যমনস্কই হয়ে গেছেন, যুক্তিটুকু তো লেগেছেই মনে। হিসাবের দিকে সারা জীবনে খেয়াল রইল না বলে, হিসাবের কথা উঠলে যেমন বেশি জোর দিয়েই বলেন সেইভাবে বলে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অনাথ বলল—"নেই-ই তো! থাকলে এই তুচ্ছ কথাটা

তুলতে আসত কে কানে। নেই বলেই তো একটা সলা-পরামর্শ নেওয়া।”

মুখের ভাবটা অনুকূল, আর দেরি করল না, বলল—“মোটা বুদ্ধিতে একটা ঠিক করেছি ভেবে, মা-মণিকেও বলেছি এখন আপনি ছাখো একটু ভেবে! ইন্‌জিয়ারবাবুর কাছ থেকে একটা আগাম চেয়ে নি—শত খানেক ট্যাকা—যেটা লাগবে আন্দাজ করছি—তারপর মাঝে মাঝে চুকিয়ে দিলেই হবে—ধরো এই গোটা পাঁচ—না রাজি হয় দশটা করেই—দশ মাসে কর্জ-ফর্স—কর্জ তো নয়ও, আগাম নেওয়া কটা টাকা, সুদ চান দেওয়া যাবে···”—গোঁফের ওপর হাত ফিরিয়ে নিল একবার।

“সুদ নেবে, ঐ মানুষে? তুই গুনতে যাবি মুখ্যুর মতন? খবরদার! টাকার হিসেবটাই বুঝতে শিখেছিস্, মানুষের হিসেব বুঝবি সে বুদ্ধি তো দেননি ভগবান।”

মনে হটাৎ কোথা থেকে একটা আবেগ এসে গিয়ে এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বলে যেন এলিয়ে গেল কণ্ঠস্বরটা, বললেন—“তা যা ইচ্ছে করগে, আমায় জিজ্ঞেস করা কেন—যেটা ধরিস্ সেটা না করে তো ছাড়িস্ না····কিন্তু ল্যাজে-গোবরে হয়ে পড়বি অনাথ, পারবি না সামলাতে। কথাটা আমার কোথাও বরং লিখে রাখ।”

একটির জায়গায় দুটি ছাত্রী; মেতেই আছেন। হয়ে যাচ্ছে এইটুকুই জানেন, তার বেশী আর খোঁজ রাখেন না।

স্বাতিকেও ঐ ভাবেই বুঝিয়েছে।

অনাথের ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু আগাম নেওয়ার কোন স্থানই নেই। গয়না ছাড়াবার জন্যে প্রশান্তর কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছে—কিন্তু ছাড়ায়নি গয়না। ঠিক করেছে দশ, পনের, বা ততোধিক, যেমন পারে মাসে মাসে শোধ দিয়ে যাবে। এদিকে রইল মবলিক এই দু'শ টাকা—বাড়ি ঘর ঠিক করে নিয়ে যেটা বাঁচবে, হাতে থাকবে। গৃহস্থের একেবারে নিঃস্ব হয়ে থাকা ঠিক নয় তো। এই করে চলে আসছে।

হাট থেকে একদিন একটা লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। তার কাঁধে দুটি বেতের চেয়ার আর একটা বেতের টেবিল বাঁশে লটকানো। স্বাতি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল—"একটু সবুজ রং জোগাড় করো অনাথকাকা—কোথায় বিক্রি হয় দ্যাখো।...আরও দুটো চেয়ার যদি হতো—বাগানে চারজনে বসবার।"

লাহিড়ীমশাই বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন, একটু আড়চোখে চেয়ে বললেন,—"আর উৎসাহ দিও না, ওর বে-হিসেবীপনার জন্যে এবার হেঁসেল বন্ধ হতে যা বাকি।"

গোড়ার দিকের কথা এসব। এখন চারদিক দিয়ে একটা শ্রী ফুটেছে বাড়িতে। বাগানে লনের মাঝখানে বসে অনেকক্ষণ গল্প-সল্প হয় সবার। এক একদিন রজতকেও ধরে আনে প্রশান্ত। গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়, বিশেষ করে যদি জ্যোৎস্না রইল। লাহিড়ীমশাই আর স্বাতিরও কবার আসা হল কলোনিতে। একদিন মোটরে করে দুজনকে পুলের দিকটাও দেখিয়ে নিয়ে এলো প্রশান্ত। দুদিন ডাক্তারের বাড়ি একটু প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হোল। একদিন নিজের বাসায়ও ব্যবস্থা করল প্রশান্ত। ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে স্বাতি আর বিশাখাই হেঁসেল নিয়ে রইল। কাজের চেয়ে বেশি সরঞ্জামের মধ্যে, মুক্ত আনন্দে এমনভাবে দিনটা কেটে গেল, বিশেষ করে অনাথের যে, সে সংযম হারিয়ে স্বাতির একটা গোপন কথা প্রকাশ না করে পারল না প্রশান্তর কাছে। সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু ছমছমে হয়ে পড়েছে, যেন একটা কিসের সুযোগ খুঁজছে, তারপর একবার একান্তে পেয়ে হটাৎ মাঝখান থেকেই গলা নামিয়ে বলে উঠল—"সব তো হচ্ছে, সব ভালোই হবে দেখবে আপনি—পাকা একটা গিন্নিই তো মা-মণি, কিন্তু আসল জিনিসটেই তো বের করছে না।"

"কী ?"—কৌতূহলী হয়েই প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"কী তা বলি কি করে ?" একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল অনাথ, বলল—"শক্ত দিব্যি দিয়ে রেখেছে যে উঁদিকে। টের পেলে

রঙ্কে আছে ?···খুব ভালো ব্যাঞ্জো বাজাতে পারে।····ঐ নিন, গেলই কথাটা বেরিয়ে মুখ ফসকে।”

“সত্যি নাকি ? কৈ টের পাইনি তো কোনদিন।”—

“এই দেখুন ! টের পেতে দেবার মেয়ে কিনা ! কি রকম আট-ঘাট বেঁধে বসা। কত্তা বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন, সিন্দুক থেকে বের করে সাগরেদ নিয়ে গুছিয়ে বসল ! আমার ওপর হুকুম····।”

“সাগরেদ ! ইস্কুল খুলেছেন নাকি ?”

“এই দেখুন। কোন কথা তো পেটে থাকতে দিলেন না আপনি। সাগরেদ বিশাখা-ঠাকরুন—স্কুলই বলুন, কালেজই বলুন।”

“সেও তো কৈ বলেনি কখনও।”

“কার সাগরেদ সেটা দেখতে হবে তো। ইন্‌জিয়ারবাবু বলেন—কৈ বলেনি তো কখনও ! কত্তা বেরিয়ে গেলেন, গোজগাছ করে বসল দুজনে। আমার ওপর হুকুম ‘অনাথকাকা, –তুমি বাইরে গিয়ে বসে থাকো। মোটরের আওয়াজ শুনলে—‘হ্যাট্‌-হ্যাট—বেরো বেরো’ করে একটা আওয়াজ করবে—যেন ঘোষেদের গোরু, কি ধোপাদের গাধা ঢুকেছে ”

—হঠাৎ প্রশান্তর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠতে বলল—“এই ছাখো ! পেত্যয়ই যাচ্ছেন না ইন্‌জিয়ারবাবু ! আমি ইদিকে বারান্দায় বসে কার গোরু,কার গাধা তাই তাড়িয়ে হয়রান। সদর রাস্তা—সামনেই কলোনিতে কাজ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-আধখানা মটরগাড়ি করছেই তো আসা-যাওয়া—কেটে কেটে তো যাচ্ছে বাজনা উদিকে —‘অনাথকাকা, তোমার আর বস্তু নেই,’—তা অনাথ কাকা কি করে বলুন ?—বিরাম তো নেই মোটরের—তার মধ্যে কোনটে মাখন ঘোষের গোরু কোনটে বা তারিণী ধোপার গাধা।······”

—বেশ সাজিয়ে একটু সরস করে বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সম্বিত হওয়ায় থেমে গিয়ে অপ্রতিভভাবে মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

অতটা হয়ত কানেও যায়নি প্রশান্তর। অন্যমনস্ক হয়ে একটা

কথা ভাবছিল, বলল—"তার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে অনাথ। এমন কিছু শক্ত নয়। সত্যিই তো, পদে পদে যদি বাধাই পড়ে তো বাজাবেই বা কখন্ শেখাবেই বা কখন্? আমার মোটরের হর্ণটা তো জানা আছে—আজ যাওয়ার সময় না হয় ভাল করে শুনে নিও —একটু আলাদা রকম কির্-র্-র্ করে শব্দ হয়—ওইটে বাজালেই বুঝবে আমি এলাম—'হ্যাট হ্যাট' করে শব্দ করবে। নইলে বাজিয়ে যেতেই দিও। কেমন তো?"

[তেরো]

প্রশান্তও সরস করেই নিল সাধ্যমত। আজকের রাতটি বড় উপযোগী। শেষ দিকে যদি একটু সঙ্গীতের রণন্ থাকত—তাও স্বাতির হাতেরই—ষোল কলায় পূর্ণ হোত আনন্দসমাবেশটুকু। ব্যবস্থা হয়েই যেত; তবু তাড়াহুড়া করে এনে ফেলতে—কেমন যেন মন সরলো না প্রশান্তর। রাগ নয়—এ ধরণের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে রাগ করে না কেউ; তবু একটু বিব্রত হয়ে পড়বেই স্বাতি। ও সেটুকুও চায় না। চায়না যে কর্মচঞ্চলতার মধ্যে ওর যে মুক্ত রূপটি ফুটেছে, আরও উঠেছে ফুটে কোথাও থেকে কিছু এসে সেটাতে এতটুও ব্যতিক্রম ঘটায়।

অনাথকে বাঁচাতে পারা যায় তো দেখতে হবে ভেবে। ও বেচারী আজ নিজের মধ্যে এঁটে উঠতে না পেরেই তো ভুলটা করে বসল। এ-ভুলের ফসলটুকু প্রশান্তর কাছেই মিষ্টি, ওর কাছে তো না হওয়ারই কথা। অন্ততঃ মিষ্টি ফসলের জন্যে একটা কৃতজ্ঞতাও তো থাকা দরকার। কটা দিন ব্যবস্থামতোই কাজ হোল। তারপর একদিন মোটরটা খানিকটা আগেই দাঁড় করিয়ে বেড়ার আড়ালে আড়ালে হেঁটে এসে একেবারেই সামনাসামনি হয়ে দাঁড়াল। একেবারে হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনাথ. সতর্ক করে

দেওয়ার সেই 'হ্যাট-হ্যাট' শব্দ ভুলে গেছে ; "ইন্‌জিয়ারবাবু !" বলে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্যাঞ্জোর ঝনঝন ভেসে আসছে, খানিকটা যেন দূর থেকেই। ক'দিন নিশ্চিন্ততাবে বাজাতে পেরে ওরা বাগানেই গিয়ে বসেছে।

প্রশান্ত বলল—"আজ আর গোরু-গাধা তাড়িয়ে কাজ নেই অনাথ। মোটরটা একটু আগেই ছেড়ে আসতে হোল আমায়,—হর্ণটা বাজাতে গিয়েই দেখি বিগড়ে বসে আছে—তুমি গিয়ে ঐখানেই··"

"মা-মণি বন্ধ করতে পেলে না তো।"—ব্যাপারটুকু আকস্মিকতার জন্যেই বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে অনাথ। প্রশান্ত বলল—"ভালোই তো হোল অনাথ, হোল না ? ভেবে ছাখো না। তুমি আমায় বলেছিলে—উনি মানা করলেও মুখ ফসকে অবশ্য বেরিয়েই গিয়েছিল তোমার—তা সে দোষটা তো কেটেই গেল—যাও। বসেই থেকো মোটরটার মধ্যে।"

ভেতরে চলে গিয়ে অনেকক্ষণ শুনল উঠানে বেশ একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে। স্বাতিই বাজাচ্ছিল, তবে শিক্ষকতা হিসেবেই। একটা গতের খানিকটা বার চারেক বাজিয়ে হাত থামিয়ে বলল—"লক্ষ্য করে দেখলে তো ? নামবার মুখে তোমার ভুলটা হয়ে যাচ্ছে, নিখাদ থেকে পঞ্চমে নামতে মাত্রার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে একটু, আরও একমাত্রা টেনে রাখতে হবে।·· নাও, ধরো।"

জীবনে এক একদিন যোগাযোগগুলো ঘটে অদ্ভুতভাবে। দৈবের দানের হাতটা যেন খুলে যায় ; শুধু প্রচুরই দেয় না, যা দেয় যেন সোনার পাতে মুড়ে যতটা পারে মধুর করেই দেয়।

বিশাখা বলল—"আজ কেমন যেন আসছে না ঠিক স্বাতিদি। তা ওটুকু হয়ে যাবেখন ভেবো না। আজ বরং তুমি বাজাও।··· হ্যাঁ, ঠিক কথাই বাজাওই স্বাতিদি', এর পরে যে গৎটা দেবে—কেদারা বলছ না ?—সেইটে বাজাও শুনি।"

"একটা না শিখে একটা লাফিয়ে ধরতে যাওয়া—ঐ তোমার এক রোগ বিশাখা। পড়ার দিকেও তাই দেখেছি। ও হয় না।"

"বেশ হয় স্বাতিদি; মনের দিক দিয়েও ছাখো না। সামনে কিছু একটা আকর্ষণ থাকলে—লোভের একটা কিছু,—উৎসাহের চোটেই মনটা এগিয়ে যায়।"

"আগেরটা অসম্পূর্ণ রেখে? না, সেটা এমন কিছু বুদ্ধির ”

এর পরেই একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল স্বাতি। বলল—"তোমার কথা শুনে আমার সেই গাধাটার কথা মনে পড়ে গেল বিশাখা—পা বাড়াতে চায় না দেখে তার মনিব ধোবা লাঠিতে একমুঠো ঘাস ঝুলিয়ে মুখের কাছে টাঙ্গিয়ে…উফ! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর—উফ!…"বলতে বলতে হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল একেবারে। বিশাখাও যোগ দিল। নিশ্চিন্ত রহস্যালাপটা হাসির দিকেই পড়ল ঝুঁকে, যেমন হয় এসব ক্ষেত্রে। একচোট হেসে নিয়ে বিশাখা হঠাৎ সুর বদলে রাগের ভান করে বললে—"যাও, বললাম বাজাতে—ফল হলো—গাধা হয়ে গেলাম, কুকুর হয়ে গেলাম…"

"ওরে বিশাখা!—জানিস? গাধারা আবার গানে ভক্ত হয়!" হাসির স্রোতে হটাৎ যেন কোথা থেকে এনে যুগিয়ে দিচ্ছে। দমকের মধ্যেই কেটে কেটে বলে যেতে লাগল—"সেই যেরে সেই গল্পটা 'এ্যান্ডারসন্‌স ফেয়ারী টেলস'এ আছে না?—মনিব-বাড়িতে গান শুনে গাধার হটাৎ খেয়াল হোল—এতো কম খাতিরের জিনিস নয়—জানালার ওপর পা ছুটো তুলে দিয়ে—একেবারে গলা ছেড়ে—উফ!…তারপর খাতিরের ঘটা!—মনিব লাঠি ঘাড়ে করে এসে—উফ!…বাবা গো!…"

মুক্ত হাসির চোটে সমস্ত জায়গাটা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে—ছুজনেরই হাসি—বিশাখাও কি বলতে যাচ্ছিল—হয়ত অনুরূপ কোন গল্প বা ঘটনা মনে পড়ে গিয়ে, স্বাতি হটাৎ যেন ভীত হয়ে থেমে গিয়ে বলল—"ওরে থাম, আজ যে কী অদৃষ্টে আছে, যত হাসি তত কান্না না হয়…"

"কেন?" একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করল বিশাখা। তারপর

আবার চাপা হাসিটাই বেরিয়ে আসবে, স্বাতিও একটা বেগ চেপেই বলল—"কেন ! অনাথকাকা ওদিকে—'হ্যাট-হ্যাট' করে ··"

তার পরেই হটাৎ এবারে আরও ফুকরে হেসে উঠল একেবারে, ভেঙে ভেঙে বলে চলল—"আর ঐ এক উজবুক—অনাথকাকা—জিজ্ঞেস করলাম—তা উনি এসে পড়লে কি করে জানাবে—বললে—উফ ! মুখে একটুও আটকাল না—অম্লান বদনে বললে—'হ্যাট-হ্যাট' শব্দ করব—যেন ঘোষেদের গরু কি তারিণী ধোপার গাধা··· উফ ! বাবাগো আর পারছি না—পেটে খিল ধরে গেল····"

অনেক চেষ্টা করে দম চেপে চেপে বন্ধ করল হাসির স্রোতটা দুজনে। একটু চুপচাপ গেল। বিশাখা কি বলতে যাচ্ছিল—বোধ হয় তার গল্পটাই শুরু করবে—স্বাতি যেন হাসির ক্লান্তির একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল—"না ভাই, আর হাসিও না। বেটাছেলেদের···"

চুপ করে গিয়ে একটু যেন দ্বিধা কাটিয়ে বলল—"বেটাছেলেদের যেন একটা ক্ষমতাই আছে—কোথা থেকে যে ঝুপ করে এসে পড়ে·· "

"আকাশ থেকে তো পড়বেন না।··তুমি বাজাও গৎটা স্বাতিদি—যে কথা হচ্ছিল আমাদের·······"

"না, পড়ে না যেন !···তুমি যদি পড়তে 'শকুন্তলা'খানা···"

"বলি তো পড়িয়ে দাও, না, সংস্কৃতটা আগে রপ্ত হোক ! রপ্তও হয়েছে, আমিও পড়েছি।"

কোনও উত্তর হোল না ; বেশ বোঝা যায় যেন হাসির আসরের বাতি নিভিয়ে হঠাৎ অন্য এক আসরে উঠে গেছে স্বাতি। একটা শান্ত নিঝুম ভাব রইল ছেয়ে খানিকক্ষণ। তারপর ব্যাঞ্জোয়—টুং টুং করে গোটা তিনচার শব্দ উঠল—খুব ধীরে থেমে থেমে। ব্যাঞ্জো যেন তন্দ্রার ঘোরে কি স্বপ্ন দেখছে। এক সময়—ঝনঝন করে তারের ওপর আঙ্গুলগুলি বুলিয়ে নিয়ে স্বাতি বলল—"তাহলে—ছাড়বেই না তো না হয় বাজাই-ই, শোন তবে। তোমার কেদারাটা নয়। একটা পুরবী ধরি—সময়টা তো তারই।"

আর একবার পর্দাগুলো ঝনঝনিয়ে আরম্ভ করে দিল, টানা বিলম্বিত লয়ে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি শোনা হোল না প্রশান্তর। একটা ভয় লেগে রয়েছে। লাহিড়ীমশাই যে কোন সময়ে বেড়িয়ে ফিরতে পারেন। তা'ভিন্ন অনাথও রয়েছে। এদের সাবধান করে দিতে পারেনি বলে একটা ধুকপুকানি আছেই লেগে, খেয়ালী মানুষ, কতক্ষণ যে মোটর আগলে বসে থাকতে পারবে ধৈর্য ধরে, কিছুই বলা যায় না। এ তো আছেই, একটু কৌতুকের লোভও উঁকি মারছে মনে, যেন দুষ্টু হাসি ঠোঁটে করে। এ রস তো খানিকটা খানিকটা উপভোগ করা গেল, একটা পথও তো খুলে যাচ্ছে, "শকুন্তলাও" না হয় এসে পড়ুক না একটু ; দুর্লভই তো জীবনে।··· লোভটা শুধু আজকের জন্যেই নয় ; যদি তেমন সৌভাগ্য হয়, কোন দূর ভবিষ্যতেও যদি রহস্যটা প্রকাশ করবার সুযোগ আসে জীবনে ; সঞ্চয়টা তো রইল। ওরা দুজনে বেতের চেয়ারে সামনাসামনি হয়ে বসেছিল, খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুতেই বিশাখার দৃষ্টিটা প্রথমে এসে পড়ল ওর ওপর। যেন ভূত দেখেছে! 'কিরে ?" বলেই হাত থামিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে স্বাতিও স্থানুর মতো নিশ্চল হয়ে গেল সেই ভঙ্গিতে।

প্রশ্ন হবে, তার আগেই একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়বার ভাব নিয়ে প্রশান্ত বলতে বলতে এগুলো—"মাফ করবেন ; আমি মনে করলাম নতুন কেউ বুঝি এসেছেন কোথাও থেকে।"

একখানা চেয়ারে, বসে পড়ে বলল—"চমৎকার হাত-তো আপনার ? কৈ, আমি তো এতদিন জানতে পারিনি !"

ঘেমে উঠেছে স্বাতি, মুখটা রাঙা হয়ে উটেছে। বাঁ-হাতে আঁচলের কোণ তুলে কপালটা মুছে নিয়ে বলল—"ইয়ে···অনাথকাকা ছিল না বাইরে ?"

নিজের কানেই নিশ্চয়ই বেখাপ্পা শুনিয়ে থাকবে অবান্তর প্রশ্নটা ; বিশাখার দিকে চেয়ে বলল—"ভাখ তো ভাই,থাকে তো উনুন ধরিয়ে চায়ের জলটা বসিয়ে দিক এসে।"

প্রশান্ত বলল—"সে রাস্তায় আমার মোটর আগলাচ্ছে। অনেকখানি ওদিকেই ছেড়ে আসতে হোল তো!"

"আজকেও আবার বিগড়েছে?"

এবার রাঙা হয়ে ওঠবার পালা প্রশান্তর। স্বাতির দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যাতে মনে হয়—মোটরের কথাই যখন, তখন একটা রহস্য থাকা আশ্চর্য নয়। সেই প্রথম দিনের মিথ্যা রচনা যেন মনে পড়ে গেছে তার। সেদিনও চোখের চাউনির ধরণটা এই রকমই ছিল; শুধু আজ যেন আরও একটু স্পষ্ট। দুজনের মধ্যেকার সে দূরত্বটাও অনেকখানি কমেছে তো।

একটু থতমত খেয়ে যাওয়ার জন্য উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারল না প্রশান্ত। একটু সামলে নিয়ে সোজা উত্তর না দিয়ে বলল—"সেরে নিয়ে এলেই হোত। এসে আমি এক বিষম দোটানায় পড়ে গেলাম। বাজনা শুনি, কি, মোটরটাই আগে ঠিক করে আনি।"

"আমরা ওঁকে একদিকের টান থেকে মুক্তি দিতে পারি, কি বল ভাই?—বিশাখাকেই কথাটা বলল স্বাতি। সে যেন হতভম্ব হয়ে বসে আছে, সব ছেড়ে 'শকুন্তলা' কথাটাই যেন ওর সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। এমন আশ্চর্য মিল হয় কি করে জীবনে?

একটা কাজ হলো। দুদিকেই ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে এক ধরণের যেন শোধবোধ হয়ে দুপক্ষেরই সঙ্কোচটা কেটে গেল খানিকটা; আজকাল বেশিক্ষণ থাকেও না আর। ওর প্রশ্নে বিশাখা জড়তা কাটিয়ে বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্বাতি উঠে পড়ে প্রশান্তকে বলল—"না, মোটরটা ঠিক করেই আসুন, আমরাই চায়ের দিকটায় যাচ্ছি।……অনাথকাকা থাকুকগে ঠেলাঠেলির জন্যে দরকার হতে পারে।"

"উঠে পড়লেন একেবারে?……বেশ তাই থাক্ তাহলে। ভাঙা মোটরের চিন্তা নিয়ে ব্যাঞ্জো শোনা চলে না।"

"আমার যা ব্যাঞ্জো, শুনলে অবশ্য ক্ষতি হোত না।"—হেসে বলল স্বাতি। ওরা এগিয়েছে বাড়ির দিকে। প্রশান্ত উত্তর করল—"সেটাই না হয় ঠিকমত প্রমাণ করে দিন। লোভ থাকে না আর।"

"আমার প্রমাণ বিশাখা। সাগরেদ করার দুঃসাহস অন্য কারুর ওপর দিয়ে খাটত না তো।"

"উল্টো বললেন: বিশাখা আমার দিকেরই প্রমাণ। শক্তি না থাকলে কেউ শক্ত কাজ ধরে না। যাক্ আমি কিন্তু আপত্তি শুনছি না, এসেই বসে যাব।"

মোটরটা নিয়ে খানিকটা খুটখাট কোরতেই হোল। ভাল সাক্ষী দিয়ে স্বাতির সংশয়ের ধারটুকু ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য অনাথকে ঠেলতেও বলে ও উঠে স্টীয়ারিং ধরছে; আরও ভাল সাক্ষী গেল জুটে। লাহিড়ীমশাই বেড়িয়ে ফিরছেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"ব্রেকডাউন করেছে আবার সেদিনকার মতন? একলা পরবিনি তুই অনাথ, দাঁড়া।"

প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দেখে কিছু বোঝবার আগেই কোঁচাটা গুঁজে নিয়ে হাত লাগিয়েছেন।

একরকম লাফিয়ে পড়েই ছুটে এলো সে, বলল—"ওকি করছেন আপনি।"

"দোষ কি? একলা পারবে না ও।"

"তা বলে আপনি?"

—কী যে করবে বুঝতে পারছে না। তারপরই দু'হাতে ওঁর ডান হাতটা ধরে বলল—"আপনি বরং স্টীয়ারিংটা ধরুন। আমি ঠেলছি ওর সঙ্গে।"

"ক্ষতিটা কি ছিল? আমিও যে না পারতাম……"

ওঁর কথার মধ্যেই ওঁকে বসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে অনাথের পাশে দাঁড়াল, বলল—"নাও জোর দাও অনাথ।"

ঘেমে উঠেছে, সে কিন্তু ততটা মেহনতে নয়, যতটা লজ্জায় আর কুণ্ঠায়। হাসিও কোথায় যেন গুড়গুড়িয়ে উঠছে ভেতরে। মিথ্যা বলার সত্যসদ্যই প্রায়শ্চিত তো। খানিকটা নিয়েই যেতে হোল ঠেলে। জমিদার মানুষ, একেবারে গাড়িতে বসিয়ে ভাঁওতা দিতে সাহসও হচ্ছে না। শেষে অতটা আর না ভেবেই খানিকটা মিথ্যে

কলকব্জা টেনে উঠে এসে স্টার্ট দিয়ে বলল—"এবার ঠিক হয়ে গেছে।"

লাহিড়ীমশাই বললেন—"ভাল হোল বাপু। চড়ি, কিন্তু আমি আবার বুঝি না কিছু। কোন রকম সাহায্য করতে পারতাম না, এক ঐ ঠেলা ছাড়া।"

[চৌদ্দ]

সেদিন ব্যাঞ্জো আর হোল না। স্বাতি তুলেই রেখেছিল, সময় পেয়ে ঠিকও করে রেখেছিল কিভাবে কাটান্ দেবে। লাহিড়ীমশাই এসেই মোটর বিড়ম্বনার কথা তুলতে এমনভাবে সেকথা নিয়ে পড়ল যে গানের প্রসঙ্গ আর উঠতেই পেল না। তোলবার অবশ্য চেষ্টাও করল না প্রশান্ত। ও তো রইলই হাতের পাঁচ। আজ বেশি যেন লজ্জায় পড়ে গেছে স্বাতি। হঠাৎই তো।

শুধু শেষের দিকে একটু ছুঁয়ে গেল। উঠে পা বাড়িয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এইভাবে ঘুরে বলল—"আজ একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম—স্বাতি দেবী চমৎকার ব্যাঞ্জো বাজাতে পারেন।„

"কেন, জানতে না তুমি আগে?"—একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন লাহিড়ীমশাই।

"লুকুলে কি ক'করে জানব বলুন। আজ এসে পড়ে ...."

"লুকুবার কি আছে? একটা ভালো জিনিস।"

স্বাতি বলল—"কে বলছে মন্দ জিনিস বাবা! তবে ভালো হাতের হওয়া চাই তো!"

"আমিও অনেকদিন শুনিনি।" প্রশান্তর দিকেই চেয়ে বললেন লাহিড়ীমশাই। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে স্বাতির কথাটা যেন কানেই যায়নি। পরে স্বাতির দিকেই চেয়ে বললেন—"তোমার

ব্যাঞ্জো শেষবার শুনি সেই তুমি আই-এ পাশ করতে যে একটু প্রীতি-ভোজের আয়োজন হয়···অনেক দিনের কথা তারপর আর ··

অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকেই চেয়ে কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ দৃষ্টিটা আকাশের এক কোণে স্থির হয়ে গেল! ভ্রূ-ছুটো কুঁচকে যেন লক্ষ্য করে বললেন—"দেখোতো, মেঘ উঠেছে কি? ঝড় হবে?"

স্বাতিও কি রকম হয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে বলল—"মেঘ কোথায় বাবা? এখুনি তো জোছনা উঠবে। তুমি যাও আগে জামা উড়ুনি ছেড়ে এসো। হাত-পা ধোও। ব্যাঞ্জো না হয় বাজানই যাবে, এমন আর কি? যাই বাজাই, তুমি মেয়ের নিন্দে করবেই না, তারপর উনি······"

প্রশান্তর দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে বলল—"দাঁড়ান, আমি আসছি এখুনি।"

একটু পরে ফিরে এসে হাসিটাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ করে নিয়ে বলল—"চলুন।······বিশাখা এসো।"

নিঝুম হয়েই গেছে স্বাতি। মাথা নীচু করেই দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে পাশে-পাশে যাচ্ছিল। বিশাখাকে বলে উঠল—"যাও তো বিশাখা—ভুলে গেলাম ব্যাঞ্জোটা রেখে এসো—যেমন থাকে—ঢাকনাটা পরিয়ে দিও ভালো করে। এই নাও চাবি।—নইলে হয়তো আবার এখুনি বাজাবার জন্যে জিদ করে বসবেন। যাও।"

বাড়ি থেকে নেমে খানিকটা এসেছে। বিশাখা চলে যেতে একবার ঘুরে দেখে নিয়ে বলল—"একটা কথা প্রশান্তবাবু—একটা অনুরোধ।"

দাঁড়িয়েও পড়েছে। বিশাখা ফিরে এলে যাতে দেখতে পায়।

প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"কি কথা স্বাতি দেবী?"

"মানে—কি বলি—পুরানো কথা হঠাৎ উঠলে—এমন কতকগুলো জিনিস আছে—বাবা মনের ব্যালেন্স্ হারিয়ে ফেলেন······"

"কৈ আজ সেরকম তো কিছু······"

"হয়নি—আজকাল হয়ও না ততটা। —তবে আপনাকে বলে রাখা এই জন্যে যে—এই জন্যে যে—কি সব মনে পড়ে গিয়ে—হঠাৎ কখনও কখনও রূঢ়ও হয়ে পড়েন—তাই যদি এমন কখনও হয় · ”

"আমি জানি স্বাতি দেবী, আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। অনাথ আমায় বলেছিল।"

"কী বলেছিল!"—একেবারে চমকে উঠল স্বাতি ; প্রশান্ত শান্ত কণ্ঠেই বলল—আপনিই বলে দিয়েছিলেন বলতে, মনে নেই আপনার। সেই প্রথম দিন আমার প্রতি ওঁর ব্যবহারটা। আপনার রূঢ় মনে হয়েছিল, তাই · ”

"মনে রাখবেন দয়া করে একটু—মাফ করবেন আমাদের।" —বিশাখা বেরিয়ে এসেছে। নিরতিশয় মিনতির স্বরে কথাগুলো বলে বিশাখাকে বলল—"এসো তাড়াতাড়ি, তুমি যে বুড়িয়ে গেলে।"

ক'মাস ধরে একটানা বেশ হাসিখুশি চলে আসছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটু বিষন্নতার ছায়া এসে পড়ল।

তা পড়ুক ; সুখই দুটি মনকে বেশি কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে, কি দুঃখ, তাওতো ঠিক বলা যায় না। মিনতি করে বলবার সময় স্বাতির চোখ দুটি যে একটু সজল হয়ে উঠেছিল সেটা আর মন থেকে যেতে চায়নি প্রশান্তর। ওর বেদনা এই জন্য যে, সমস্তটুকুর গোড়ায় ওই রয়েছে ; ও না ব্যাঞ্জোর কথা তুলত, না এটুকু হোত। অনাথের কাছে শুনে ও সমস্তটুকু জানে বলে ওর কাছে ঘটনাটুকু যেন আরও মর্মন্তুদ হয়ে উঠল। ঠিক করল ব্যাঞ্জোর কথা আর আনবেই না মুখে, কাল গিয়ে বিশাখাকে একটু ছুতো করে সরিয়ে দিয়ে—যেমন স্বাতি দিয়েছিল—ক্ষমা চেয়ে নেবে স্বাতির কাছে। কি বলে সরাবে, যাতে একটু বেশি সময় পায়, তারপর কি করে, কি বলে ক্ষমা চাইবে তার একটি পরিপূর্ণ রূপ যতক্ষণ না দাঁড় করাতে পারল মনে মনে ততক্ষণ বিছানাতেও শুয়ে অস্থির হয়ে কাটাল।

তার পরদিন বেলা একটার সময় আফিস থেকে খেতে এসেছে, ছাখে অনাথ বারান্দায় বসে চাটুয্যের সঙ্গে গল্প করছে ; এদিকে

যাওয়া আসা বাড়ায় বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে নিয়েছে ওর কাছে।

প্রশ্ন করতে, ও যেমন সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আসল কথার দি এগোয় সেই ভাবে নীচে থেকেই আরম্ভ করল—আজ বিশাখ একটু সকাল সকাল পাঠিয়ে দিতে হবে। সেই কথা বলবার জন্যে ঘণ্টাখানেক হোল এসে বসে আছে—না গেলে ফিরতে আবার হয়ে যাবে—হ'বে না দেরি?—মা-মণি অবশ্য একলাই কোমর বেঁধে লেগেছে, কিন্তু একলা পেরে উঠবে?—না পেরে উঠবার কারণ, আজ তো শুধু ডাক্তারবাবু, প্রশান্ত আর বিশাখাঠাকরুণ নয় যে খুদকুঁড়া যা জুটল খাইয়ে বিদেয় করে দিলে—মা-মণি তো আবার সেই অন্ন-পুন্নোর রূপ ধরেছে—গাঁসুদ্ধ সবাইকে ভোজ দিতে হবে—ছোট গাঁ তবু এ্যাণ্ডা-বাচ্ছা, বুড়ো-হাবড়া মিলিয়ে গুটি পঞ্চাশেকের পাতা তো পড়বে উঠানে—সবাই অনুগত, বাদ দেওয়া তো চলে না……

অন্যমনস্ক হয়েই শুনে যাচ্ছিল প্রশান্ত—একটা ট্রাজেডীই একদিক দিয়ে, তার গোড়াতে প্রশান্তই তার ব্যাঞ্জো শোনবার শখ নিয়ে—স্বাতির রাত কেটেছে তার চেয়েও বেশি অস্থিরতার মধ্যে—কি করে সামলাবে তার যেন হদিস পেয়ে উঠছে না বেচারি।

অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল, হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে উঠল—"আমি নিজেও যাব অনাথ। চট্ করে একমুঠো খেয়ে নিই।"

—এ অপচয়, এই অবস্থার মধ্যে। বন্ধ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে প্রশান্ত।

"আপনি তো গিয়ে রাঁধবে না মশাই। সাত-তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে ভাত গুঁজে গিয়ে হবেটা কি?"—বেশ বিস্মিতই হয়ে পড়েছে অনাথ।

"সবাইকে বলা হয়ে গেছে?"

"তা বলে এলুম বৈকি। কখন ফিরব, তারপর বলব—ওরা সকাল সকাল রেঁধে-বেড়ে খেয়ে নেয়, যার যা জোটে—সবার তো পিদিমের বালাই নেই যে……"

অন্যমনস্ক হয়েই শুনছিল প্রশান্ত, প্রশ্ন করল—"এর খরচ? পঞ্চাশ জন বলছ, অনেকগুলি টাকা লাগবে তো।"

"খর—চ, তা—"

একটু টান দিয়ে কথাটা ছেড়ে ছিল অনাথ। তারপর একবার চারিদিক থেকে দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে এনে ওর মুখের ওপর আবার দাঁড় করাল। এর মধ্যে একবার চাটুজ্যের ওপরও গিয়ে পড়ল দৃষ্টিটা। প্রশান্ত তাকে ভেতরে চলে যেতে বলল। একটু নড়েচড়ে বসল অনাথ।

বলল—"খরচ—সেকথাটা যে বুঝিনে ইন্‌জিয়ারবাবু, এমন নয়—হাজার দুহাজার নিয়েও হাতে মেখেছি, আজ দুটো ট্যাকার জন্যে—কি যে বলে ·· খরচ বুঝি বৈকি, কিন্তু প্রাণটার কাছে তো খরচ কিছু নয়। কাল ঐ যে ব্যাপারটুকু হোল—ছিলুমই তো দাঁড়িয়ে একটু তফাতে—ঐ করতে করতেই সব মনে পড়ে গিয়ে কাণ্ডটা তো ঘটে শেষ পজ্জন্ত। তা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বাপকে তো সামলাল ত্যাখন-ত্যাখন। অমন হলে শরীরটা তো আবার কাহিল হয়ে পড়ে—আপনাদের বিদেয় দিয়ে গিয়ে গিন্নি মা'টির মতন করে সামলালো তো কচি ছেলেকে। তারপর, ওমা! সকাল থেকে নিজের মুখ শুকনো! এদিক'কোর পাট সেরে হেঁসেলে ঢুকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখি, আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। · 'হ্যাগা মা মণি, বলি সকাল থেকে মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছ—একটু সময় পাচ্চি না যে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করি—তারপর এখন আবার এ কি!…'

আর বলতে দেয়?—এসে ঝাঁপিয়ে তো বুকে পড়ল…… 'কি হবে অনাথকাকা?'…· ··আগে কি হয়েছে তাই বল?'—না,'বাবার আবার সেই রকম হতে আরম্ভ হয়েছে দেখলে তো '…' দেখলুম বৈকি, ভাবচিও; তোর মতন এই রকম হেদিয়ে পড়লে হবে, না, এর ওষুধ বের করতে হবে?'

এই ওষুধ বের করেছি ইন্‌জিয়ারবাবু—ব্যাঞ্জোর কথায় মনে পড়ে গিয়ে আর সে রকম পিত্তি-ভোজ হচ্ছে না বলে দুঃখ, তা গাঁসুদ্দু

ডেকে খাইয়ে দিলেই তো হোল। তা বৌ-রাণীমার আশীর্বাদ আছে তো ওপর থেকে—ধরেছে ওষুধ—বাপ-বেটি দুজনেরই ওপর। আপনি গিয়ে দেখবেনই…. ”

“পঞ্চাশটি টাকা আয়ের ওপর পঞ্চাশ জনকে পাতপেতে খাওয়ান অনাথ—বেশি দিতে গেলে নেবেনও না….”

“নেবার মালিক তো এই বান্দা ইন্‌জিয়ারবাবু। নিচ্ছি না? না, না দরকার পড়লে নোব না বলেছি কখনও?—অবিশ্যি আপনকার কাছেই। তা, এখন তো দরকারটা হচ্ছে না।”

“তার মানে?”

“তার মানে—ঐ ওপর থেকে তানার আশীব্বাদ এই দাসানুদাসের ওপর। একটা মস্ত সুবিধে, কত ধানে কত চাল—কোন্ কাজটায় কত খরচ পড়বে কত্তা তো তা একেবারেই বোঝেন না। যেমন বোঝেন না, তেমনি মাথাও ঘামাতে যান না। মেয়ে ঘা খেয়ে খেয়ে কিছু বোঝে, তবু তাকে ট্যাকাকড়ির হিসেবের মধ্যে পুরোপুরি টানি না—ভাঁওতা চলে—তা ভিন্ন একটা বিশ্বেস দাঁড়িয়ে গেছে, অনাথ কাকা অঘটন ঘটাতে পারে—আর যখন বলে তার হাত খালি, তখনও কিছু থাকেই হাতে—দেখলেও তো।”

“আমায় তো সেই ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে না অনাথ।”—একটু হেসেই কথাটা বলে ঘরের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত; বলতে বলতেই—“না, এর খরচটা তোমায় নিতেই হবে অনাথ, দাঁড়াও।”

অনাথ খপ করে উঠে পড়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরল,—বলল, “গঙ্গাজলের মতন শুদ্ধ মন দুজনের, তবু করেছি পাপ লুকিয়ে লুকিয়ে, করতেও হবে—হাতের আঁজলা পেতে নোব, আপনাকে কথা দিচ্ছি—তবে য্যাদ্দিন আছে হাতে…”

“কোথা থেকে থাকবে অনাথ?—বললুম তো, আমায় তো লাহিড়ীমশাই পাওনি, তোমার মা-মণিও নয়।”

“আছে ইন্‌জিয়ারবাবু, না পেত্যয় যান, চলুন, আজই গুণে দেখিয়ে দোব। পুরো টাকা দিয়ে গয়নাগুলো ছাড়াইনি তো।

দশ পনেরো করে যামন পারছি দিয়ে যাচ্ছি মাসে মাসে—একেবারে হাত খালি করলে তো চলবেও না। বলবেন, তবুও পঞ্চাশজনের ভোজ। তা ভোজও তো তেমনি, বাপ-বেটিকে একটু ভুলিয়ে রাখা —খিঁচুড়ি, একটা চচ্চড়ি, একটা ভাজা, একটা টক। কত্তা বললেন, 'শেষ দিকে একটু করে দই আর একমুঠো করে বোঁদে রেখে দে অনাথ, তুই খরচের দিকটা যেন বড্ড ভাবিস!' একদিনের লুটিসে ঢাঙ্গোয়া দইয়ের ব্যবস্থা হয় না, তবু পাঁচু ঘোষকে বলেছি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে যতটা পারে, দেখতে। টোকো দই, ওদের তো আর মগরা থেকে সে মাল এনে দিতে হচ্ছে না। বোঁদেটাকেও চিনিতে এনে দাঁড় করিয়েছিলুম ইন্‌জিয়ারবাবু, ঐ বলেই—শহর জায়গা নয়, একদিনের লুটিসে মিলবে না, তা মা-মণি ধরে বসল—বাবার ইচ্ছে, ওটা তোমায় করে দিতেই হবে অনাথকাকা; পাঁচ-ছটার কমে তো মিষ্টি হয়নি কোন ভোজে, ওটা তোমায় ক'রে দিতেই হবে।'

"এই হোল রিতিহাস ভোজের, কোনরকমে বাপ-বেটিকে একটু ভুলিয়ে রাখা। আমার ইষ্টিমিট্ হোল……"

চুপ করে মাথাটা হেঁট করে নিল অনাথ, পা দুটো ধরেই আছে। প্রশান্ত বলল—"তা শুনি এষ্টিমেট্‌টা কি তোমার।"

অনাথ আবার কুণ্ঠিতভাবে মুখটা তুলল, বলল—"তা একরকম বললে তো চলবে না। বাপকে বলেছি—দশ টাকাতেই হয়ে যাচ্ছে আমার। ভগবানের দয়া, হিসেব জিনিসটে তো একেবারেই মাথায় ঢুকতে দেননি। দিব্যি বুঝে নিয়েছেন। মেয়ে, অত কি যে বলে —ইয়ে নয়, তবু খানিকটা ভাঁওতা চলে, তাকে বুঝিয়েছি—অত কমে কখনও হয়? পনেরোটা টাকা লম্বা হয়ে যাবে, তবে ওকেই বললুম, কত্তা যেন না টের পান। তারপর……"

"হ্যাঁ, তারপর আমার জন্যে কি রেখেছ?" কি ভেবে এক দুঃখের 'রিতিহাসে'ও কোথা থেকে এসে একটু হাসি জুটে গেছে প্রশান্তর ঠোঁটে। পায়ে একটু টান দিয়ে বলল —"পা দুটোও ছাড়বে তো?"

একটু চেপেই ধরল অনাথ। মাথাটাও চেপে বলল—"তিরিশটে টাকার মায়া কাটাতে হবে ইন্‌জিয়ারবাবু, ছ্চারটে বেশিই হয়তো। তা ওটা আর আপনি জোর করে নেওয়াবেন না। তুজনকে ঠকিয়ে লুকিয়ে নেওয়া তো, ও মহাপাতকটা আর করাবেন না আমায় দিয়ে। তারপর—মানুষ তো নয়, সাক্ষাৎ ছাবতা—নোব বৈকি প্রয়োজন হলে, কার কাছে আর দাঁড়াব গিয়ে?"

ফোনে ড্রাইভারকে ডাকিয়ে এনে জীপটা বের করিয়ে দিল প্রশান্ত। কো-অপারিটিভ থেকে এদিককার জন্যে সওদাপাতি করে, রজতকেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিশাখাকে নিয়ে চলে গেল অনাথ।

[পনেরো]

একদিনেই সব ব্যবস্থা, গাঁয়ের নিমন্ত্রিতদের বিদায় করে এদিককার খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত দশটা হয়ে গেল।

হাতঘড়িটা দেখে রজতই জানাল, সময়ের কথা। স্বাতি পান দিচ্ছিল সবাইকে বলল—"তাব'লে এক্ষুণি যেতে পাবেন না। রুগী নেই তো হাতে?"

"রুগী আমি নিজেই এখন একটি।"—হেসে উত্তর করল রজত। বলল—"চলচ্ছক্তিহীন, যা খাইয়েছেন। তবে, একেবারে গিয়ে বিছানায় পড়লেই ভালো হোত।"

রাগ করল স্বাতি। বলল—"তুমিই বলো বাবা। আমার কোন অনুরোধই রাখেননি খাওয়ার সময়, অথচ দিব্বি বদনাম দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আর বলবই না।"

লাহিড়ীমশাই প্রশ্রয়ের কণ্ঠে রজতের দিকে চেয়ে বললেন—"চলো না হয় একটু বসবে।"

ওরা সবাই গিয়ে বাগানে বসল।

বৈশাখের শেষ, বেশ গরম পড়েছিল, তবে তুদিন আগে একটা

বড় রকম কালবৈশাখী উঠে তাপটাকে অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, একটি ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে; একবার যখন বসল, আর সব কিছু ভুলেই বসে রইল সবাই।

রজত দেখল একটা ভুলও হয়ে যাচ্ছিল। বাগানের দিকে একটু আয়োজনও করে রেখেছে—নিশ্চয় স্বাতিই, ওরা তিনজন বেটাছেলে যে সময় আহার করছিল, সেই ফাঁকে কোন্ সময়। বিশেষ কিছু নয় অবশ্য, চৌকির ওপর একটা মাদুর বা সতরঞ্চি পেতে তার ওপর একটা ধোপদুরস্ত চাদর বিছানো। মাঝখানে একটা রেকাবিতে সদ্য তোলা বেলফুল। তবে এটা যে আগে ছিল না তাই থেকেই মনে হয় উৎসবটুকুর মেয়াদ আরও একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কর্মব্যস্ততার মাঝেই এই পরিকল্পনা।....চলে গেলে ভুলই হোত।

রজত এইটুকুই ভাবল, স্বাতিদের সঙ্গে তার সম্পর্কও তত ঘনিষ্ঠ নয়। প্রশান্ত কিন্তু ভাবছিল, এ-আয়োজনের এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া অনুচিত, শেষ হয়ে যেতে দেওয়া যেন একটা অপরাধ। পূর্ণতার একটা চিত্রও তার মনে মনে রেখেছে; স্বাতির ব্যাঞ্জো। কিন্তু ব্যাঞ্জো নিয়ে কাল শেষপর্যন্ত যা হয়ে গেল, একরকম সংকল্পই করেছে আর তার কথা তুলবে না—অন্ততঃ লাহিড়ীমশাই যতক্ষণ কাছে-পিঠে আছেন ততক্ষণ তো নয়ই। আজকে তাই সব কিছুর মধ্যেই সে একটু বেশি নীরব। লোভ ক্রমাগতই ওর সংকল্পের ওপর আঘাত হানছে—গোড়া থেকেই; তারপর বাগানে এসে আরও বেশি করেই, ও কিন্তু নিজের জিহ্বাকে যেন সভয়ে লাগাম টেনে রেখেছে।

লাহিড়ীমশাই অবশ্য বেশিক্ষণ বসলেন না, অথবা পেলেনই না বসতে। কিছুক্ষণ যেতেই ওদিকে একটু গোছগাছ করে নিয়ে অনাথ এসে বলল—তাঁর শুতে যাওয়া দরকার। বললেন—"দরকার তেমন দেখিনে, তবে সেকথা তুইও মানবিনি, ডাক্তারবাবুও তোর দিকেই হবেন। যাই তা'হলে।"

উনি উঠে গেলেও প্রশান্ত ভুলতে পারল না কথাটা। তবে অন্যভাবে উঠল।

স্বাতিও কি মনে মনে পূর্ণতার ঐ একই চিত্র নিয়ে আয়োজন করেছে? সেকথা অবশ্য কখনও প্রকাশ পাওয়ার নয়। তবে যদি করেই থাকে তো আজ বিধি তার অনুকূল। নিজের বলা চলে না, প্রশান্ত ত বলতে পারছে না, তবু কথাটা অন্যদিক দিয়ে উঠলই শেষপর্যন্ত।

কর্তা চলে যেতে প্রশান্ত বলল—"শোওয়াব কথা বলছিলে রজত, ডাক্তার মানুষ, ভয় নেই এই ভরসায় যদি খেয়েই থাক বেশি তো না হয় গড়িয়েই নাও না একটু চৌকিটার ওপর। আর তো উনি নেই।"

রজত বলল—"আমিও অরসিক ডাক্তারই, বলা মানায় না আমার, তবে তুমি দেখছি নিতান্তই হাতুড়ি-পেটা ইন্‌জিনিয়ার— অমন চমৎকার ধবধবে চাদর বিছানো, মাঝখানে বেলফুলের রাশ, একপেট খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মানায় ওখানে? তার চেয়ে যদি···"

ব্যাঞ্জোর কথা জানে না রজত। প্রশান্তের প্রায় ঠোঁটের আগায় এসে গেছে, কোনরকমে সামলে রেখেছে নিজেকে। বিশাখাই বলে উঠল—"চমৎকার ব্যাঞ্জো তো বাজাতে পারেন স্বাতি-দিদি'।"

"তোমার সাগরেদি গেল বিশাখা আজ থেকে।" —মুখটা খুব ভারি করে নিয়ে বলল স্বাতি। বলল—"তোমায় না বারণ করে দেওয়া হয়েছিল?"

বিশাখা বলল—"কাল প্রশান্তদা তো জেনে গেলেন স্বাতিদি,।"

"অথচ দেখো সাগরেদ না হয়েও কেমন চুপ করে আছি আমি···। নয় কি স্বাতি দেবী?"

এমনভাবে ওকে সাক্ষী মেনে মাঝখান থেকে বলে উঠল প্রশান্ত যে একটু হাসি পড়ে গেল। কপট গাম্ভীর্যই স্বাতির। সেটুকু কেটে গিয়ে সে সাধারণভাবেই আপত্তি তুলল খানিকটা—গাইতে বাজাতে বললে সবাই যেমন তোলে—শোনাবার মত নয় বলেই প্রকাশ করতে

মানা করেছিল বিশাখাকে—অনেকদিন অভ্যাস নেই—রাত হয়ে গেছে অনেকটা। শেষ পর্যন্ত বিশাখার ওপর চাপাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে (সফলতা চায়নিও তো) বলল—"তাহলে নিয়ে এসো তো বিশাখা ; একবার দিই-ই শুনিয়ে, তাহলে আর তো বলবেন না।"

বিশাখা উঠতে বলল—"থাক্, আমিই যাচ্ছি।"

ভেতরে গিয়ে ডাকল—"বাবা !"

একটু তন্দ্রাই এসে গিয়েছিল লাহিড়ীমশাইয়ের। ভেঙে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"স্বাতি-মা ? কেন গা ?"

"না, ঘুমুচ্ছিলে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম। ওঁরা ছাড়লেন না, ব্যাঞ্জোটা বাজাতে হবে। তোমার আবার ব্যাঘাত হবে।"

"কিছু না, তুমি বাজাওগে, বলছেন যখন সবাই।"

গাইয়ে-বাজিয়ের মনের সঙ্কোচ তার গান-বাজনাতেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আরও একটা কথা আছে, সেটা আসে কাকে বা কাদের শোনাচ্ছি তাই নিয়ে। প্রশান্ত আর রজত উপলক্ষ্য হলেও স্বাতির আজকের সংগীত ঠিক তাদের জন্য ছিল না ; অন্ততঃ প্রারম্ভে তো নয়ই। আজকের সমস্ত আয়োজনটুকুই তার পিতার জন্য। কালকে তাঁর মনে পুরানো স্মৃতির ঢেউ উঠে যে আঘাতটা দিয়েছিল তার প্রতিষেধ হিসাবে। অনাথের মাথা থেকে বেরিয়েছিল ভোজের কথাটা। ও ঠিক করেছিল বাজনা। আশা করেছিল প্রশান্তই তুলবে কথাটা, প্রায় নিরাশ হয়েই এসেছে, এমন সময় বিধি অনুকূল হোল, একটু ঘুরে এসেই পড়ল অভীপ্সিত ফরমাসটুকু।

বাপের জন্য আয়োজন বলেই, নিজেই গিয়ে তাঁর ঘুমটুকু ভাঙিয়ে এল।

তারপর অবশ্য আর সবকিছুই পড়ল এসে। মনের একটি স্পষ্ট বাসনার দীপ্তির নীচে অস্পষ্ট অনেকগুলি ঘোরাঘুরি করে, শুধু আলোর নীচের অন্ধকারের জন্যই তাদের স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। লাহিড়ীমশাই ছিলেন, কিন্তু সলজ্জ নিভৃতে কি আর কেউ ছিল না ? স্বাতি আশা করেছিল ফরমাসটা আসবে প্রশান্তর কাছ থেকে।

ও আশাভঙ্গের বেদনা কিন্তু স্থায়ী হতে পেল না। এই স্নিগ্ধ গভীর জ্যোৎস্নার রাত্রি, এই প্রিয়-সমাগম, কোন্ অজানা দূরের অতিথি যারা এত কাছাকাছি এসে পড়েছে জীবনে—এত কাছে যে নিজের জীবনের চেয়েও কাছে বলে মনে হয়,—বাপকে শোনাবার বিপুল আনন্দের মধ্যে দিয়ে, সবাই, সব কিছুই একে একে এসে পড়ল মনে। বাবার প্রসন্নতাই যেন আশীর্বাদ হয়ে সবকিছুরই নবতর রূপে এনে দাঁড় করিয়েছে স্বাতির সামনে।

ইচ্ছা করছে যতটা পারি বাড়িয়ে যাই, এই রাত্রিটিকে—যতটা পারি সুরে সুরে ভরে দিই এ-রাত্রি। কৈ, আসেনি তো আর এমন একটি রাত্রি এ-জীবনে।

আজ বিধি ওর অনুকূল।···মনে পড়ে একদিন এক সিদ্ধ-পুরুষ এসেছিলেন ওদের বাড়িতে—"তুমি কি চাও সোনামণি ?"

আর সবাই চেয়েছিল মিষ্টি, কেউ অন্য কিছু। স্বাতি চেয়েছিল গোলাপ ফুল; তখন বাগানে নূতন গাছ বসানো হয়েছে ফুল ফোটেনি, ঐটেই মাথায় ঘুরছিল।

"এই নাও তোমার গোলাপ ফুল"

—হাত দুটো অঞ্জলিবদ্ধ করে একটু নেড়ে মেলে ধরলেন সিদ্ধ-পুরুষ।

সেইরকম একটা কিছু যেন কোথা থেকে হয়ে যাচ্ছে আজ; যে বাসনা মনে উঠছে কোথা দিয়ে কি হয়ে পেয়ে যাচ্ছে স্বাতি।

গোটা তিন গৎ বাজানো হয়ে গেলে, কতকটা অভ্যাস মতোই রজত হাত-ঘড়িটা উলটে দেখেছে, স্বাতিই প্রশ্ন করল—"কটা বেজেছে ?"

"পৌণে বারোটা"—রজত উত্তর করল।

"ওরে বাবা !" বলে স্বাতি ব্যাঞ্জোটা কোলে নামিয়ে রেখেছে, বিশাখা বলে উঠল—"রেখে দিলেন যে স্বাতিদি !"

"শুনলে তো—রাত বারোটা।"

"পৌণে বারোটা। বারোটা এখনো হয়নি। হ'লেও বারোটা

কি এমন রাত গরমকালে? আমরা সেদিন রাত দুটো পর্যন্ত নদীর ধারে কাটিয়ে দিলাম। নতুন পুল থেকে পুরনো পুল, তারপর পুরনো পুল পেরিয়ে নদীর ওপারে—সে যে কী চমৎকার!—দাদা, আমি, প্রশান্তদা ওভারসিয়ারবাবুর ভাই—কলকাতা থেকে এসে-ছিলেন।....."

"নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাতে বেড়ানো আর বসে বসে একঘেয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া......"

তিনজনেই একটু বিস্মিত হয়ে বিশাখার দিকে চেয়ে ছিল, স্বাতিই তার কথার ওপর কথাটা বলল।

বিশাখা ছেলেমানুষের মতোই বলে উঠল—"বেশ, তো, চলো নদীর ধারেই বেড়াতে তাহলে।"

"একি জ্বালা!"—খিল-খিল করে হেসেই উঠল স্বাতি। বলল—"না বাজনা বাজাও তো নদীর ধারে বেড়াতে চলো। নদীর ধারে যদি না যাও তো......না যাও তো......আর একটা ভোজের বাটনা বেটে রাখি এসো...উঃ কী বাটনাই বাটতে পারে মেয়েটা!"

—হেসেই চলল স্বাতি। বিশাখার হঠাৎ-প্রস্তাবে একটা অসঙ্গতি ছিলই, তার ওপর স্বাতির টীকা-মন্তব্যে ওরা দুজনেও না একটু যোগ দিয়ে পারল না। বিশাখা কিন্তু একটুও যেন দমল না। উঠে পড়ে বলল—"যতই বলো আমি শুনছিনে কিন্তু। চলো নদীর ধারেই, সেদিন তুমি ছিলে না, আমার এত আপসোস হচ্ছিল। আমি জ্যাঠামশাইয়ের হুকুম নিয়ে আসছি..."

এগিয়েছে, স্বাতিও সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"ওরে শোন কী পাগল ছাখো তো? অথচ এদিকে সাত চড়ে কথা কইতে জানে না! ক্ষেপে গেলো নাকি?"...ওরে, বাবা ঘুমোচ্ছেন!"

থামাবার জন্যে ওকে অনুসরণ করে ভেতরে এসে দেখল লাহিড়ী-মশাই এই দিকেই মুখ ক'রে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু থমকেই দাঁড়ালো স্বাতি, বিশাখাও দাঁড়িয়ে পড়েছে চুপ ক'রে, নিশ্চয় ওঁকে একেবারে এমন সামনাসামনি পেয়ে যাওয়ার জন্যই।

স্বাতি যে থমকে দাঁড়াল তা বহুদিনই বাপকে এ-রূপে দেখেনি ব'লে। মনে হোল উঠানে পায়চারি করতে করতে বাজনাই শুনছিলেন, তারপর ওদের সব কথাবার্তাও শুনে তোয়ের হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মুখে একটি শান্ত হাসি, স্বাতির মনে হোল কতদিনের গ্লানি নেমে গিয়ে একটি প্রসন্নতার আবরণ সর্বাঙ্গে রয়েছে ছেয়ে। দাঁড়িয়ে পড়েছেন পশ্চিমে হেলা চাঁদের একেবারে মুখোমুখি হয়ে।

উনিই কথা বললেন প্রথমে, বললেন—"তা বিশাখা-মার সাধ হয়েছে তো যাও না মা। আমার অবশ্য আরও দু'-একটা বাজনা হোলেই ভালো হোত।······সে তো পরেও হবে। না, যাওই, বেশ রাত্তিরটি ; হয়ে এসো।"

[ষোল]

বিশাখা আজ স্বাতির এঞ্জেল হয়ে উঠছে ; দেবদূতী।

এমনি মেয়েটি বড় লাজুক প্রকৃতির। যেখানেই দু'জনের বেশি, কিংবা দ্বিতীয়ের মধ্যেও অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত এমন কেউ যে মেয়ে নয়, ও সাধ্যমতো একটি মানসিক নিভৃত রচনা ক'রে সাধ্যমতো চুপ করেই ব'সে থাকে। যখন নিতান্ত উপায় না থাকে, একটি অবগুণ্ঠিত হাসি দিয়ে নিজের অস্তিত্বটা প্রকট ক'রে। এর জন্যই স্বাতি বলল—সাত চড়ে কথা কয় না। এর জন্যেই একসঙ্গে অতগুলো কথা ফরফরিয়ে বলে যাওয়ায় প্রশান্ত ওর মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে ছিল ; ওর দাদাও। আর এইজন্যেই বাটনা বাটা বা ঐ ধরণের দৈহিক পরিশ্রমের কাজ পেলে যেন ও বর্তে যায়, কারণ আর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আত্মগত করে ফেলতে দৈহিক শ্রমের মতো আর কিছু নেই।

প্রথমটা রাত-দুপুরে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়াটা অদ্ভুতই

লেগেছিল সবার, বিশেষ ক'রে, পূর্ব-কল্পিত নয় বলেই, তারপর বিশাখার উৎসাহটাই সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ওই যেন অগ্রণী হয়ে নৈশ অভিযানটা চালিয়ে নিয়ে গেল। শুনিয়ে যাচ্ছে—কোথায় নদীর একটি সুন্দর চড়া জেগে উঠেছে, কচি-কচি ঘাস উঠেছে গজিয়ে, ঝিরঝিরে খানিকটা জলের স্রোত ভেঙে যাওয়া, এক হাঁটুও জল নয় ; কোথায় নদীর পাড় সোজা নেমে গিয়ে বেশ একটু ভয়-ভয় করে ; কোথায় কি এক সাদা সাদা ফুলের রাশ বিছিয়ে আছে ; মনে হয় যেন·····

"হ্যাঁরে বিশা, তোর পেটে এত !"—ওর দাদাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, বলে—"আমরাও তো ছিলাম সেদিন, তুই যে পেছনে চুপচাপ করে থেকে এমন খুঁটিয়ে দেখে গেছিস সব, পারিস এমন করে দেখতে, কৈ জানতাম না তো।"

ওই টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ব'কেও যাচ্ছিল একরকম ওই, আর তিনজনে চুপ করেই ছিল বিশেষ করে প্রশান্ত আর স্বাতি, রজতের কথার উত্তরটা স্বাতিই দিল, বলল—"নাঃ, বড় বিশ্রী জায়গায় আপনি বাধা দিলেন রজতবাবু, কী যে মনে হয় সেটা শুনতে দিলেন না। নৈলে দেখতেন বোন আপনার একটি নীরব কবিই।"

"তা নয় হোল, চাপা মানুষকে চেনা যায় না, কিন্তু নীরব কবি হঠাৎ এত সরব হয়ে উঠল কোথা থেকে তার তো হদিস পাচ্ছি না।······হ্যাঁরে বিশা ?"

"হঠাৎ হয়নি ; এসব একদিনে হয় না।"—স্বাতিই উত্তর দিল। বিশাখা একটু গুটিয়ে গেছে এর মধ্যে।

প্রশ্ন হোল—"তবে ?"

স্বাতি বলল—"তবে······সব কথা না-ই বা শুনলেন।—মানে, গল্পের দিকে মন দিলে দেখবেন কখন ? আমাকেও দেখতে দিচ্ছেন না।"

মিনিট কয়েক বিরতি দিয়ে আবার বলে উঠল—"হ্যাঁ, ওভারসিয়ারবাবুর যে ভাইটি এসেছিলেন রজতবাবু—আপনাদের

সঙ্গে এখানে বেড়াতেও এসেছিলেন সে রাত্তিরে—তিনি আবার আসবেন কবে? এলে আমাদের ওখানে নিশ্চয় নিয়ে আসবেন—শুনেছি নাকি বেশ মিশুক।"

একবার বিশাখার পানে চাইল। চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"কার কাছে শুনলেন আপনি?"

"আপনি থামুন তো, অমন ইয়ের মতন প্রশ্ন করবেন না। জানবার জন্যে শুনতেই হবে কারুর কাছে এমন কথা যেন ধ'রে লেখা আছে কোথাও!"—একটু ধমক দিয়েই বলল স্বাতি।

প্রশান্ত উত্তর করল—"না, আপনি বললেন কিনা খুব মিশুক, তাই বলছি। আমি তো একরকম টেরই পেলাম না কবে এল সে, কবে চলে গেল—এক সেই রাত্তিরে একটু যা দেখেছিলাম।"

"আপনি হলেন এ-বনের সিংহ, মিশতে নিশ্চয় সাহস পায়নি, তাব'লে হরিণের সঙ্গেও যে মেশেনি, একথা বললেন কি করে?"

এবার বেশ একটু ঘাড় ফিরিয়েই চাইতে হোল বিশাখার দিকে, সে আরও পেছন দিকে সরে গেছে।

আসল কথা, শোধ তুলে নিচ্ছে স্বাতি।....তাহলে আরও আগের দিকে চলে যেতে হয়—আজ বিশাখা যে হঠাৎ মুখরই হয়ে উঠেছে এমন নয়, ওর মধ্যেকার কৌতুকপ্রিয় নারীটি হঠাৎ চারিদিক দিয়েই সজাগ হয়ে উঠেছে। গোড়া থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছে ও।

আসবার আগে স্বাতির কাপড় আর ব্লাউজটা ছাড়ালো ওই। ইচ্ছেটা ছিল স্বাতির, কিন্তু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, বিশাখাই একটু পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল—"কাপড় জামাটা পাল্‌টে নাও স্বাতিদি।"

"কেন বেশ তো আছে। মিছিমিছি দেরি হয়ে যাবে।"

"তা হোক্। বেটাছেলেরা বড্ড পিটপিটে, জানই তো। বিশেষ ক'রে প্রশান্তদা।"

"দুষ্টুমি হচ্ছে? তবে রইল।"—একটু চোখ পাকিয়েই বলল স্বাতি।

বদলেই নিল অবশ্য। বিশাখা ছাড়ল না। মোটামুটি একটা ভালো শাড়ি আর ব্লাউজ পরেই ছিল আজ, বিশাখা যুক্তি তুলল, ওগুলোর ওপর দিয়ে খাটা-খাটুনি গেছে সমস্ত দিনের।…আজ স্বাতির এঞ্জেল হয়েই তো দেখা দিয়েছে। ও যা চাইছে অথচ করতে পারছে না, এ তা করবার সুযোগ রচনা করিয়ে দিচ্ছে, যতটা পারছে না, করিয়ে ছাড়ছে না।

যাওয়ার সময় রেকাবির বেলফুলগুলা তুলে নিয়ে আঁচলে আলগা ভাবে বেঁধে নিয়েছিল। জীপের পেছনের সীটে বসেছিল ওরা, রজত আর প্রশান্ত সামনে; ফিসফিস করে বলল—"ফুলগুলো খোঁপায় গুঁজে দিই স্বাতিদিদি।"

"কেন ? শুনি। এবার মরবি তুই মার খেয়ে।"

"কেন আবার ! দিব্যি বেলফুল।"

"তুইও গুঁজবি তো নিজের খোঁপায়।"

"আমার তো দাদা রয়েছেন। দাদার বন্ধু, তিনিও দাদাই।"

"এবার তুই সত্যিই মার খাবি বিশাখা। বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস আজ।"

ওটা সত্যসত্য হোল না। তবে তর্কে-তর্কেই রইল বিশাখা এবং যখন সফল হোল তখন ভালোভাবেই হোল, কেন না এবার প্রশান্তকেও নিল টেনে।

গাড়ি থেকে নেমে আসতে আসতে বার দুই যেন স্বাতির মনে হোল প্রশান্তর দৃষ্টিটা ওর মাথার ওপর গিয়ে গিয়ে পড়ছে। সন্দেহটা ছিলই, একবার খোঁপায় হাত দিতে টের পেল, কখন, হয়তো নামবার সময় গোলমালে গোটা তিনেক ফুল খোঁপায় আটকে দিয়েছে বিশাখা। আলগাভাবে আটকানো, হাতে উঠেই এল। বিশাখার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে দেখে নিয়ে মাটিতে ফেলেই দিল স্বাতি। হয়ত না দিয়ে, উপায়ও ছিল না, যেমনভাবে প্রশান্তর নজরটা আবার পড়ে গেল।

বিশাখা ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে দল ছেড়ে পেছিয়ে পড়ছিল।

"বাঃ! মাটিতে ফেলে দিলে স্বাতিদি?" বলে কুড়িয়ে নিল ফুল তিনটে। তারপর নূতন পরিস্থিতিতে নূতনতর মতলব আঁটতে লাগল।

একটু এগিয়ে গিয়ে ওরা তীরঘেঁসে এক এটুরো ঘাস জমির ওপর বসল—স্বাতি, তারপরে ও, তারপরে প্রশান্ত, সবশেষে রজত। দূরে সেই সাদা ফুলের মাঠটা জ্যোৎস্নায় একটা ধোপদস্ত ফরাসের মতো পড়ে রয়েছে। ঐটে নিয়েই কথা উঠতে, বিশাখা সুযোগ খুঁজছিলই একটা কোনও, বলে উঠল—"তা বলে, বেল ফুলের মতন নয়—আমি বাপু তোমার গুনো চুরি করে নিয়ে এসেছি স্বাতিদি—রাগ করো আর যাই করো। এই আঁচলে রয়েছে আমার।"

স্বাতি বলল—"দোষ স্বীকার করছিস, ক্ষমা করলাম।" প্রশান্ত ঘুরে এইটু হাসল মাত্র। বড় মৌন আজ। রজত বলল—"তাই বুঝি একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি তখন থেকে?"

"হ্যাঁ, তোমরাও একমুঠো করে রাখো না রুমাল বেঁধে দাদা। এই নাও।"

আঁচলের আলগা গেরো খুলে দিল ওকে। তারপর আর একমুঠো নিয়ে নিতান্তই যেন অন্যমনস্কভাবে বাঁ-হাতের স্বাতির খোঁপার সেই তিনটে ফুল মিশিয়ে দিয়ে বলল—"আপনিও নিন, প্রশান্তদা। এ তিনটেতে একটু ধুলো....না, লাগতে পায়নি। ঘাসের ওপর পড়েছিল।"

যেন যা করল তার অর্থ কিছুই বোঝে না এইভাবে স্বাতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে নিতান্তই শিশুসুলভ নিরীহ দৃষ্টি মিলিয়ে বলল—"তা বলে তোমায় দিচ্ছি না, তিনটে ফুল তো ফেলেই দিলে মাটিতে!"

গোড়া থেকেই এই করে এসেছে যখন যেমন সুবিধা পেয়েছে। সুবিধা পেয়ে স্বাতি যখন ওভারসিয়ারবাবুর ভাইয়ের কথা তুলে পাল্টা জবাব আরম্ভ করল, খানিকটা চুপ করে গেল, কিন্তু শেষবারের জন্যে একেবারে মোক্ষম অস্ত্রটা ওই রইল হাতে করে।

মুখের তাগাদা বার কয়েক দিতে হোল স্বাতিকে; সমস্ত দিন

খাটুনি গেছে—অনেকখানি যেতেও হবে ওকে—বাবা রয়েছেন ; কাটান দিয়ে দিয়ে আটকে রাখল বিশাখাই। ঘুরে বেড়িয়ে সান্ধ্য ফুলের মাঠ আর নদীর মধ্যেকার চড়ায় বসে, গল্প করে ওরা যখন বাড়িমুখো হোল তখন একটা-সাতান্নর গাড়িটা পুলের ওপর উঠছে।

মতলব ভেতরে ভেতরে এঁটেই চলেছে বিশাখা, আজ ওকে ভূতে পেয়েছে। ও যেন শুধু এই সংকল্পটুকুই ধরে আছে যে আজকের রাত্রের পূর্ণ সুযোগটুকু নেবেই ; তাতে কোথায় সীমা লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে সেদিকে যেন হুঁস নেই। ওর স্বপক্ষে ওর এতদিনের স্বল্পবাক নির্লিপ্তভাব, আর আজকের শিশুসুলভ নিরীহ দুটি চোখ। ……রজতের এদিকে তেমন মন নেই ; প্রশান্ত দেখেশুনে একটু ধোঁকায়ই পড়ে গেছে, বিশাখার পক্ষে জ্ঞানতঃ কিছু করা সম্ভব কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

বুঝেছে স্বাতি। মেয়েদের রহস্য মেয়েদের বুঝতে খুব দেরি হয় না। বুঝেছে বলেই ওভারসিয়ারের ভাইকে টেনে পাল্টা উত্তর দিয়ে গেল। মিথ্যা হলে অবশ্য এমন করতে যেত না। ও বুঝেছিল বিশাখার মনের এই উন্মেষ হঠাৎ নয়। নারীর মন নিয়েই বুঝেছিল এর সূত্রপাত—ওদের সেদিনকার নদীতীরের ভ্রমণ। সেদিন ওর মনে যা উঠেছিল, আজ নদীতীরের স্মৃতিতে, তারপর নৈশ-অভিযানের পুনরাবৃত্তিতে স্বাতি-প্রশান্তের মধ্যে দিয়ে যেন ফলিয়ে নিচ্ছে বিশাখা।

মিষ্টিই লাগছিল অবশ্য স্বাতির, আর শোধ তোলা—সেও তো মিষ্টি করেই।

ওর পাল্টা জবাব পাওয়ার পর থেকে বিশাখা খানিকটা গুটিয়েই গেল, ওর সেই নিভৃত বিলাসের মধ্যে। হঠাৎ কথা বন্ধ, নিতান্ত নিরুপায়ে সেই একটু হাসি। ……আবার সেই বহুপরিচিত বিশাখা।

জীপে এসে উঠল ওরা।

ওদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে যাবে জীপ। কাছাকাছি এসে মৌনের ওপর বেশ একটু অবসাদের ভাব টেনে এনে বলল—"আমার মাথাটা ধরেছে দাদা—গাটাও কেমন করছে যেন।"

"তাই বুঝি হঠাৎ এমন লক্ষ্মীটি হয়ে পড়েছে?"—প্রশান্তই আগে প্রশ্নটা করে নিল। রজত বলল—"তা চল্, নামিয়ে দিই তোকে। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়্গে যা।"

"তুমিও নামো। প্রশান্তদা রেখে আসছেন স্বাতিদি'কে। একটু যেন বেশি মনে হচ্ছে আমার।"

স্তম্ভিত হয়ে গেছে স্বাতি ওর দুষ্টুমির বহর দেখে, সামলাবার বুদ্ধি জোগাচ্ছে না হঠাৎ। প্রশান্ত ওর ক্লান্ত শিশুসুলভ দৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে। একটা যে সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছে বোকা, অনভিজ্ঞ বোন এটা সহজভাবেই বুঝে রজত নিজের ব্যবসাগত অভিজ্ঞতায় সহজ সমাধান করেই বললে—"নামিয়ে দিয়েই তো চলে আসছি—মিনিট দশেক ; তুই ঐ করগে।"

বিশাখা বলল—"তবে না হয় আমিও ঘুরে আসব! হাওয়া লেগে যদি ঠিক হয়ে যায় মাথাটা।"

"অন্ততঃ এই দশ মিনিটে মরবিনি, এটুকু বলতে পারি আমি"—স্বাতি যেন এ ঝালটুকু না ঝেড়ে পারলই না—সাহসও পাচ্ছে না আর এ মেয়েকে সঙ্গে রাখতে।

[সতেরো]

সফল হোল না বিশাখা, তবে সফলতার কি একটি রূপই আছে?

যা ছিল দুজনের মনে মনেই এতদিন, বিশাখার ষড়যন্ত্রে দুজনের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়ে দুজনকে পরস্পরের আরও কাছে টেনে নিয়ে এল। স্বাতি তার এই ধরা-পড়ে-যাওয়া ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিল বিশাখাকে গালাগালের অভিনন্দন জানিয়ে ; যা গোপনীয় তার অভিনন্দনও তো প্রচ্ছন্নরূপেই আসবে।

প্রশান্ত ও-দিকেই গেল না একেবারে। প্রথমতঃ প্রচ্ছন্নতার ব্যাপারে পুরুষ অত দক্ষ নয়। দ্বিতীয়তঃ রজতের সম্পর্কে বিশাখার

সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও এমন যে, যা হোল সেটা নিয়ে কোন রকম অভিনন্দন দিয়ে ওর কাছে মনের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইবে। এই সম্বন্ধ ধরে ও নিশ্চিন্তও তো হতে পারেনি যে বিশাখা যা বলল বা করল তা জ্ঞানতঃ বলেছে বা করেছে।

তবু একটা ব্যাপার করল সে। তাতে বিশাখা যদি ভেবে থাকে এ তার সেই নদীতীরের রাত্রির পুরস্কার তো ভাবুক, প্রশান্তর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু সে-রাত্রে যা-কিছু হোল সেসব স্বাতির কাছে স্বীকার করে নেওয়া—খোঁপার তিনটি বেলফুল পর্যন্ত। কাজ উপলক্ষ্যে কলকাতায় প্রায় যেতে হয়, এবার গিয়ে বিশাখার জন্যে একটি ভালো ব্যাঞ্জো কিনে নিয়ে এল।

আরও একটি জিনিস ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলেছে, সেটি কিন্তু আপাততঃবেদনার কারণই হয়ে রইল।

একটি হাতে-চালানো সুদৃশ্য সেলাইয়ের কল। যখন কিনল, তখন কিছুই অসম্ভব বা অসংগত মনে হয়নি। তখন নদীর তীরের স্মৃতিটাই মনের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় কথা। কেন দেওয়া যাবে না স্বাতিকেই, যেমন বিশাখাকে দিতে পারছে? এইতেই কি বেমানান হবে না যে, দুটি সখী, তার মধ্যে একজনকে দেওয়া হচ্ছে আর একজন হচ্ছে বঞ্চিত? এরচেয়ে যদি স্পষ্ট হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যটা তো তাইতেই বা ক্ষতি কি? স্বাতি আর ওর মাঝে কি আর রইল কিছু অস্পষ্ট? তারপর, লাহিড়ীমশাইয়ের কথা। অতরাত্রে স্বাতিকে যেতে দিলেন ওদের সঙ্গে। অবশ্য, প্রশান্তকে ভালো করে দেখেছেন এর মধ্যে, গেছেও একটি পুরো দল—তবু একটা কিছু দেখতে না পেলে, ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট চিত্র সামনে না থাকলে পারে না তো কেউ। বিশেষ করে ওঁর মতো মানুষ।

কেনার উল্লাসে, কিনেই ফেলল; দেবে স্বাতিকেও।

তারপর গাড়ি ছাড়ার পর থেকেই যুক্তির উলটা স্রোত বইতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে মনটাকে লজ্জায়-সঙ্কোচে অভিভূত করে ফেলতে লাগল…এমন অপরিণামদর্শীর মতো কাজ করতে পারল কি

করে সে। তখন যেটাকে একটি দেওয়ার মতো উপহার বলে মনে হয়েছিল, দেখল, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা অপমানই। স্বাতিরা যে অবস্থায় তাতে সেলাইয়ের কল তাদের উপজীবিকার সহায় মাত্র, শৌখীন জিনিস তোয়ের করে অবসর বিনোদনের সামগ্রী নয়।... উপহার হিসাবে দেওয়াও যে কত শক্ত, সে কথাটাও ওর কাছে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল, তবে স্বাতিদের দারিদ্র্যের কথাটা আর সব কিছুকেই দিল চাপা। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, প্রথম শ্রেণীর কামরায় একাই বসেছিল প্রশান্ত, ক্রমে এটা নিয়ে নামাও ওর পক্ষে এমন সঙ্কোচের ব্যাপার মনে হোল যে একবার সত্যই ভাবল ওপরের বাঙ্কের ওপর জিনিসটা ভুলে নেমে যাবে। এ মতিভ্রমের বা পরিতাপ তার কাছে শ'তিনেক টাকার ক্ষতিও যেন তুচ্ছ মনে হলো।

এ কথাও তো রয়েছে এর সঙ্গে যে স্বাতি এখন ওর মানসআকাশে কত উর্ধ্বের এক দীপ্ত তারকা।

তা অবশ্য করল না। নিয়ে এসে ভগ্নীর জন্য কেনা, দেশে গেলে নিয়ে যাবে বলে, ঘরের একজায়গায় রেখে দিল। কয়েকদিন অবহেলায়ই রইল পড়ে, তারপর একদিন করুণা-বশেই একটা লাল ভেলভেটের আস্তরণ করে দিল।.......একটা সেলাইয়ের কল, কিন্তু তারও যেন একটা নীরব আবেদন রয়েছে।

আরও কিছুদিন গেল। আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে ওরা দুজনে। ভেতরের দেওয়া-নেওয়া বাইরেও প্রকাশ খোঁজে। একদিন বিশাখা স্বাতিদের বাড়ি আসবার জন্যে মোটরে ওঠবার আগে প্রশান্তর হাতে একটা রুমাল দিল। একটি কোণে প্রশান্তর নামের আদ্য অক্ষর, নীচে একটি ছোট্ট সবুজ পাতার সঙ্গে রাঙাফুল। প্রশান্ত দেখে বলল—"বাঃ, এমব্রয়ডারিতে তোমার বেশ হাত তো!"

বিশাখার এখন আবার সেই অল্প হাসি অল্প কথার যুগ চলেছে, তবে কথাগুলায় একটু করে ধার থাকে মাঝে মাঝে। বলল—"এই তো দুঃখু, আপনি হাত চেনেন না।"

"তোমার নয়?" প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

দুজনে বারান্দা থেকে নেমে মোটরের কাছে চলে গেছে, উঠতে উঠতে বিশাখা বলল—"আমার কেন হতে যাবে ?"

ঐটুকুই। মোটরও ছেড়ে দিল।

সন্ধ্যের পর ওকে আনতে গিয়ে প্রশান্ত বলল—"আপনার দেওয়া রুমালটা পেলাম স্বাতি দেবী, ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

স্বাতি একেবারে শিউরে উঠে বিশাখার দিকে চাইল, বলল—নিশ্চয় তোমার কাজ বিশাখা। কী সর্বনেশে মেয়ে বাবা ? আমি এদিকে সারা বাড়ি এক করছি, গেল কোথায় রুমালটা।"

"ঠিক জায়গায় যায়নি ?" ঐটুকুই প্রশ্ন করে কথাটা ঘুরিয়ে নিল বিশাখা। ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল, শিক্ষানবিশী, বলল—"এবার তুমি বাজাও স্বাতিদি।"

"কি হোল ?" প্রশ্ন করল স্বাতি।

"চটেছ, ভুল হলে আরও চটবেই তো।"

পথটা খুলল এইভাবে ; এরপর দেওয়া-নেওয়ার স্রোত বয়েই চলল। অবশ্য একতরফা স্রোত, একজনই দিচ্ছে আর একজনই নিচ্ছে। দেওয়ার সুবিধাটাও তো স্বাতির, তারা উপকৃত, তার হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতার পর্দার আড়ালে টেবিল ক্লথ, বেড্-কভার, বালিসের ঢাকনা, আরও সব নানা রকম নানা জিনিস উপস্থিত হতে লাগল, জামা মোজা পর্যন্ত। শুধু ফুল তোলার জন্যই নয়, রিফু-সেলাইয়ের জন্যও। বিশাখা নিয়ে যায়, চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বাবা দেখেন বৈকি। তিনটি ঘর আর একটা বাগান নিয়ে বাড়ি, লুকুনো থাকবে কোথায় ?

দরকারই বা কি লুকুবার ? তবু—

"আহা একলা মানুষ, চাকর-বাকর সম্বল—কী যে বাড়ির অবস্থা করে রেখেছে বাবা, দেখলে কষ্ট হয়। গেছলাম তো সেদিন, বিশাখাদের বাড়ি যেদিন নেমতন্ন ছিল,—বিশাখা বলল—চলো গিয়ে ডেকে আনি—কী যে ছিরি করে রেখেছে বাড়ির তিনটিতে মিলে ! ..... বুঝি, তোরা ফ্যাশান-দুরস্ত করে রাখতে পারবি না—কেউ

আশাও করে না সেটা—তবু একটু ছিমছাম করে তো রাখতে হয়। ঘরের পর্দাটা এতখানি ছিঁড়ে ঝলমল করে ঝুলছে। কী, না কুকুর আর বেড়ালটায় ঝগড়া করতে করতে ঐ করেছে। তা একটু সেলাই করে দিবি তো ছুঁচের ছটো ফোঁড় দিয়ে ?—না পারিস দর্জির বাড়ি থেকেও তো সারিয়ে আনতে পারিস · ”

দেওয়ার একটিই সূক্ষ্মসূত্র, সেটাকে চাপা দিতে একরাশ কথা এনে ফেলে স্বাতি।

একটু করে হাসেন বাবা, বলেন—“যতটুকু পার, দেখো, ছজনে রয়েছ তো।”

ওঁর হাসিতে আজকাল একটা যেন নূতন কি ছাখে স্বাতি, প্রসন্নতাটা ওঁর অভ্যাস, তার সঙ্গে একটা যেন করুণা মেশানো থাকে।

শ্রী-হীন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নূতন শ্রী নিয়ে ফিরে আসে প্রশান্তর জিনিসগুলো।

ওর দৃষ্টিটা গিয়ে গিয়ে পড়ে ভেলভেট-ঢাকা সেলাইয়ের কলটার ওপর। এক এক সময় লোভটা এত বেড়ে যায় যে, প্রায় সংযম হারিয়ে তুলে দিতে বলে মোটরে। কিন্তু পারে না।

ওর তো ঢাকবার কিছু নেই। কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তো সারতে পারে না। তারপর একদিন বিনা আয়াসেই পৌঁছে গেল সেলাইয়ের কল। ইতিমধ্যে পৌঁছুবার প্রস্তুতি পর্বটা ধীরে ধীরে নিজের পথ করে এগিয়ে চলল। ছদিকের দূরত্ব ধীরে ধীরে আরও কমিয়ে এনে।

এসব ব্যাপারের গন্ধ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। একটা যে কিছু চলছে, বিবাহেরই প্রস্তুতি, এ খবরটা চাকরদের মহলে ছড়িয়ে পড়েছে; এদিকে অনাথ, ওদিকে প্রশান্তর পাচক-ঠাকুর চাটুজ্যেমশাই, বেয়ারা গোপেশ্বর, রজতের ঠাকুর, চাকর। তাদের থেকে আরও পাঁচ কান। অলোচনা হয়। ছোট জায়গা, নেইও তো আলোচনার বেশি কিছু।

বেশি আলোচনা হয় অবশ্য যাদের বেশি সম্বন্ধ ব্যাপারটুকুর সঙ্গে, অনাথ আর পাচক ঠাকুরের মধ্যে। গোপেশ্বর রইল তো সেও যোগ দেয়। অনাথের আসা-যাওয়া বেড়েছে আজকাল। প্রয়োজন থাকে। না থাকে তো সৃষ্টি করে নেয়। বেড্-কভারে ফুলতোলা শেষ হয়ে গেছে, বিশাখার জন্য না রেখে নিজেই হাতে করে নিয়ে এল। বাগানের শাক-সব্জি আছে, তেমন কিছু যদি বা করল স্বাতি বাড়িতে; নেহাত কিছু না রইল চাটুজ্যেকে হাটের সঙ্গী করেই নিয়ে গেল একটু ঘুর পথে এসে।

সেদিন সকাল বেলায় এসেছে, প্রায় এগারোটার সময়। একটা টিফিন-কেরিয়ার হাতে। স্বাতি কয়েকরকম তরকারি করে পাঠিয়ে দিয়েছে। ডোবাটায় মাছ করেছে অনাথ। আর, একটা কথা আছে লাহিড়ীমশাইয়ের, প্রশান্তকে বলতে হবে।

এটুকু অবশ্য মিথ্যা; লাহিড়ীমশাইয়ের কোন কথাই থাকে না। ভেতরকার কথা, মা-মণি রান্নায় অন্নপূর্ণা, চাটুজ্যেকে বিশ্বাস করে না অনাথ, লোভে পড়ে যেতে কতক্ষণ? তার ওপর গোপেশ্বর আছে, এখানেই খায়। অন্নপূর্ণার হাতের রান্না দুজনের লোভ কাটিয়ে কতটা পৌঁছবে প্রশান্তর কাছে, কোনটা হয়তো আদৌ পৌঁছবে কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত নয় অনাথ।

বারান্দায় বসে বসে দুজনে গল্প করছিল। যে কথা নিয়েই উঠুক, আজকাল বিবাহের কথাতেই এসে পড়ে শেষ অবধি।

অনাথ বলল,—"সে তো বুঝলুম চাটুজ্যেমশাই, এ বিয়ে কে না চাইবে বলো। তুমিও চাও, আমিও চাই, চরাচরে সবাই চাইবে। একধারে শিব আর একধারে অন্নপুন্নোই তো গো; কিন্তু হবে কি করে তাও তো চম্ম-চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছিনে।"

"বাধছেটা কিসে?"—চাটুজ্যে প্রশ্ন করল, বলল "—শিবও চান, অন্নপুন্নোও চান, চুকে তো গেল ল্যাঠা।"

"আসলটিকেই যে বাদ দিয়ে বসলে আপনি। দক্ষ মহারাজ কেউ নয়? এ তো আর সায়েব-মেমের ব্যাপার নয়।"

"তা বেশ তো, রইলেন তিনি। অপছন্দের কিছু আছে কি? শিবকে তো আজ থেকে দেখছিনে। বিলেত গেলেন পাশ করতে—সঙ্গে চাটুজ্যে না গেলে যাব না—নাগাড়ে এই পাঁচ বছর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি, অপছন্দের তো কিছু 'নজরে' পড়ল না আজ পজ্জন্ত।"

"নেইও তো, পড়বে কোথা থেকে? পাঁচ বছরে যেটা লোকের চোখে ধরা পড়বে না, পাঁচদিনেই এই ছুটো চোখে দেখে নেয়। অনেক দেখলে তো। তবে আপনিও তো কিছু অলেহ্য কথা বলছ না, বলি, নেই-ই কোন দোষ তো দেখবে কোথা থেকে। তবে আর শিবতুল্যি বললুম কেন? কিন্তু……"

সামনাসামনি হয়ে বসেছিল ছুজনে। চাটুজ্যে একটা মোড়ায়—অনাথ এলে একটা মোড়াই টেনে নিয়ে নিজের আভিজাত্যটা রক্ষা করে—অনাথ নীচে একটু দূরে, "কিন্তু…" বলে এগিয়ে গলা নামিয়ে বলল—"কিন্তু একজায়গায় যে একটা মস্তবড়,—কি যে বলে ভালো—গরমিল থেকে যাচ্ছে…"

"শুনব তবে তো বুঝব। তবে তো তার উপায় হবে।"—ভারিক্কে হয়েই জবাব দেয় চাটুজ্যে।

"ভয়ানক নিষ্টি যে। বংশটা তো যে-সে নয়। বর্ণচোরা আমটি হয়ে বসে আছে তাই, নইলে বংশটা তো যে-সে নয়। কে, কেন কোথা থেকে আবির্ভাব হোল—সে পরে টের পাবে আপনি, আগে ছু'হাত এক হোক—আর করতেই হবে এক, শিব আর অন্নপুন্নোকে তো আলাদা করে রাখা যায় না; তবে, ঐ যেমন বললুম—ভয়ানক নিষ্টিবান যে বুড়ো—মেয়েও বাপকা বেটি·· ···ঐখানেযে আটকাচ্ছে।"

ব্যাপারটা কিছুই নয়, সেই চিরন্তন শুক-শারীর দ্বন্দ্ব। শুক বলে আমার কৃষ্ণ এই রকম, শারী আর এক ধাপ বাড়িয়েই বলে আমার রাধা এই। আসল যা বোঝাপড়া তা রাধা-কৃষ্ণের মধ্যেই, মাঝখান থেকে যার কৃষ্ণ আর যার রাধা তাদের মধ্যে একটা আলাদা বোঝাপড়া; একটা বড়াই, সব বড়াই তো শেষ পর্যন্ত আবার নিজের বড়াই-ই।

…খানিকটা রেশারেশি আবার খানিকটা মেলামেশা, মাঝখানে স্বার্থ তো একই। চাটুজ্যে বলল—"বুঝলুম, তা আমার শিবঠাকুরের নিষ্টির অভাবটা দেখলে কোথায়? মদ নেই, গাঁ্যাজা নেই, ভাঙ নেই —ওর নাম কি, কোন রকম……"

"পুজো-আচ্চা কোথায়?"—বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে অনাথ।

"পুজো-আচ্চা? · …" একটু থতমত খেয়ে গিয়ে চারিদিক চায় চাটুজ্যে, কিছু না দেখতে পেয়ে, সময় নেয়, বলে—"পুজো-আচ্চার কথা বলছ? তা …তোমার গিয়ে ….."

বিজয়ার হাসি ফোটে অনাথের মুখে, মাথাটা আস্তে আস্তে দোলায়। বলে—"আর সেখানে গিয়ে ছাখো—তা তোমার য্যাখন খুশি যাও না, সকাল হোক, ছুপুর হোক—দেখবে বাপ-বেটিতে পুঁথি খুলে অং-বং সংস্কেত মন্তর পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে; সামনে ছাবতা—ঐ শিবঠাকুর—এই দাড়ি, এই কপাল, এই জটার রাশ লুটিয়ে পড়ছে, এই ঢুলুঢুলু ছুটি লয়ান—গলায় মালা, ধূপ-ধুনোর গন্ধয় সারা ঘর ম-ম করছে।—এখন ধুলোবালির সময়, বেশির ভাগ ঢাকা-ই থাকেন ঠাকুর। তবে এসো না একদিন, ফুলকাটা ঘেরাটোপ করে দিয়েছে মা-মণি, তুলে দেখিয়ে দোবখণি তোমায়। তাক নেগে যাবে।"

—ঠাকুর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সেই আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি।…শুক-শারীর লড়াই-ই তো। সময় পেয়ে চাটুজ্যে সামলে নিয়েছে। একদিন কবে কি একটা কাজে গিয়েছিল নজরেও পড়েছিল। দেবত্বটা অস্বীকার করতে পারল না, তবে একটু অবহেলার সঙ্গেই বলল—"তাই কও, সেই পুজো। আমি বলি ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, ফুল-বিল্বিপত্তর, ভোগ-আরতি দিয়ে নিত্যি সেবা বুঝি……."

"তা ও টুকুনও তো চাই ইদিকে—সমানে সনানে না হলে……."

হর্ণ্ বাজিয়ে কলোনির মধ্যে প্রবেশ করল প্রশান্তর জীপ। চাটুজ্যে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেই তার দৃষ্টিটা সামনের ঘরের মধ্যে দিয়ে ওদিকের ছোট ঘরটায় গিয়ে পড়ল। প্রশান্তর মা যতদিন ছিলেন ঐটে পুজোর ঘর করে নিয়েছিলেন। এখন অবশ্য পুজোর

ব্যবস্থা নেই সে ধরণের, তবে ঠাকুর একজন আছেন। তিনি অন্তত সত্ত পরাজয় থেকে চাটুজ্যেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখেন।

ঘরের ভেতরে ছোট একটা টেবিলের ওপর ভেলভেটের ঘেরা-টোপ দেওয়া প্রশান্তর ঠাকুর দেখিয়ে দিল চাটুজ্যে, বলল—"তা যখন তখন মন্তর পড়তে থাকবে, তুমি শুনবে, সে-ফুরসত কোথায় ইদিকে? একদিন রাত দুপুরের পর এসো, দেখবে নিষ্টির ঘটা—শিবঠাকুর ছাবতা সামনে করে যোগাসনে বসে আছেন চোখ দুটো বুজে।"

অনাথের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বিজয়ের হাসিটুকু আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাটুজ্যের। প্রশান্তর জীপ মোড় ঘুরে বাসার রাস্তায় ঢুকল।

[আঠারো]

যে নিজের হয়ে আসছে সে একাই আসে না, তার যারা আপনজন তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। স্বাতি নিয়ে এসেছে তার পিতা লাহিড়ীমশাইকে।

লাহিড়ীমশাইকে সেই বর্ষার রাতে প্রথম দেখলেও প্রশান্ত তাঁর আসল পরিচয়টি পায় সেদিন যেদিন তাঁর অসুখের কথা শুনে রজতকে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেল। সহানুভূতির সঙ্গে একটি শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে ফিরে আসে প্রশান্ত। এর পর অনাথের কাছে ওঁর জীবন-কাহিনী শুনে এবং সাক্ষাৎ পরিচয়ে এই ভাবটি দিন দিন পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের পাশা খেলায় বরাবর হেরেই এসেছেন, আজও ঠিকমতো বুঝলেন না জীবনকে, তবু একজন যে জ্ঞানতপস্বী, যতি পুরুষ তাতে তো আর সন্দেহ নেই।

স্বাতি প্রশান্তর জীবনে প্রবেশ করতে আর একটা নূতন জিনিস দেখা দিল এই সম্বন্ধের মধ্যে। যা মাত্র শ্রদ্ধাই তা একটা দূরত্ব রক্ষা করা চলে, স্বাতি মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দূরত্বটুকু আনল কমিয়ে।

শ্রদ্ধা রইলই, তার সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তার ভাব ; স্বাতির পিতা, সুতরাং কত আপন, কত কাছের, কত অন্তরঙ্গ !……

কত আনন্দের ! কিন্তু সত্যই যা নিছক আনন্দের ব্যাপারই হয়ে থাকতে পারত, অবস্থাগতিকে তাতে একটু খাদ মিশে রইল। লাহিড়ীমশাই তো তাঁর জীবনের ট্রাজেডীটাকে পেছনে ফেলে আসতে পারলেন না।

তবে ট্রাজেডীর অন্য অংশগুলো অতটা নয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন এ-সব জীবনের অঙ্গ, সমবেদনা জাগায় নিশ্চয়, কিন্তু ঠিক ততটা গভীর ভাবে নয়। আসল বেদনার বিষয় হয়ে রইল যা লাহিড়ীমশাইয়ের মনে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আলাদা করে একটা গভীরতর রেখাপাত করে রয়েছে। তাঁর এই টুইশনি। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, পড়াচ্ছেন বলে এই পঞ্চাশটি ক'রে টাকা নেওয়া ; সেইটাই তাঁর উপজীবিকা হয়ে থাকা। ওঁর পূর্ব-ইতিহাসের সঙ্গে, বিশেষ করে, ওঁর চরিত্রের সঙ্গে এই ব্যাপারটুকুর যে কত অসামঞ্জস্য, এটাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁকে অবস্থার সঙ্গে যে কতটা আপোস রক্ষা ক'রে নিতে হয়েছে সেটা তো বোঝে প্রশান্ত। ওঁর লজ্জাটা তার নিজের লজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাবে মাঝে মাঝে, কি ক'রে এটুকু ওঁর জীবন থেকে অপনোদন করা যায়। সম্ভব কি ? এইটুকুই তো রুজি, অনাথের হাতের সেই ক'টা টাকা ফুরিয়েই তো আসছে।

এরপর, যেটা ছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসরের চিন্তা, সেটা কাজের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। একদিন স্বাতির নিজের মুখেও ঠিক এই কথাটাই শুনে প্রশান্ত দেখল যেটা এতদিন পর্যন্ত তার মনের একটা আন্দাজ রূপেই ছিল, সেটা অতি সত্য এবং সেটা স্বাতি, লাহিড়ীমশাই—দুজনের মনেরই গভীর বেদনা এবং লজ্জার কারণ হয়ে রয়েছে।

হেড-অফিস থেকে বড়সাহেব তদারকে আসায় সেদিনও অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটল। সেই যে সকালে প্রাতরাশ করে

এসেছে প্রশান্ত আর বাড়ি যেতে পারেনি। গোপেশ্বরের ফুরসত ছিল না, প্রশান্তর নিজেরও মনে পড়েনি বিশাখাকে স্বাতিদের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা! ওটা একেবারেই বাদ পড়ে গেছে দিনের প্রোগ্রাম থেকে।

খুব অন্যমনস্ক রয়েছে। দেখা-শোনা শেষ করে সন্ধ্যার সময় বড়সাহেব চলে গেল। মনটাকে ছুটি দেওয়ার জন্যে, এবং কতকটা অভ্যাসবশেই মোটর নিয়ে স্বাতিদের বাড়ির পথে আধা-আধি এগিয়েছে, মনে পড়ে গেল বিশাখা আসেইনি আজ। একবার ভাবল ফিরবে, তারপর এগিয়েই গেল।

আজকে একটু অন্যরকম পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বিশাখা এলে লাহিড়ীমশাই ওর পড়া নিয়েই থাকেন। প্রশান্ত যখন আসে, প্রায়ই দ্যাখে ওঁর কাজ শেষ ক'রে উনি বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন, বিশাখা ব্যাঞ্জো নিয়ে স্বাতির সাগরেদি করছে। ওরা তিনজনে রাস্তায় বা গ্রামের ভেতর একটু বেড়িয়ে এসে বাগানে বসে, ততক্ষণে অনাথের চা-জলখাবার তোয়ের হয়ে যায়, সামনে ক'রে তিনজনের গল্প চলে। স্বাতির ব্যাঞ্জো এসে পড়ে কোন কোন দিন লাহিড়ী-মশাইও ফেরেন।

আজ বিশাখার অনুপস্থিতিতে স্বাতিকেই নিয়ে বসেছিলেন লাহিড়ীমশাই। ওঁর,—শুধু, ওঁরই বা কেন—বাপ-মেয়ে উভয়েরেই বা প্রাণের বস্তু সেই সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। পড়ছিলেন 'উত্তর-রামচরিত'।

ভেতরের বারান্দায় বসে পড়ছিলেন। আলো কমে এসেছে, সেদিকে খেয়াল নেই। একটা শ্লোক নিয়ে টোলের পণ্ডিতের মতো বসে লাহিড়ীমশাই কি ব্যাখ্যা-আলোচনা করে যাচ্ছেন, একটু দুলে দুলে, নিজের পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে, স্বাতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে শুনে যাচ্ছে, এমন সময় প্রশান্ত এসে প্রবেশ করল।

প্রশান্তকে দেখে আবিষ্টভাবেই লাহিড়ীমশাই চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে। তারপর যা প্রথম কথা তা থেকেও বোঝা গেল তাঁর

মনটা তখনও অন্য কোথাও মগ্ন। প্রশ্ন করলেন—"তুমি উত্তর-রামচরিত পড়েছ প্রশান্ত?"

প্রশ্নটা এতই অপ্রত্যাশিত, অধিকন্তু অদ্ভুত যে টপ ক'রে একটা উত্তর জোগাল না প্রশান্তর মুখে। একটু মূঢ় হাসি নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, স্বাতি বলল—"সংস্কৃত কি ছিল ওঁর?......মনে তো হয় না।"

প্রশান্তর মুখের দিকেই চেয়ে কথাটা শেষ করতে সে বলল—"না, ওটা বাদই প'ড়ে গেছে ; এখন আফসোস হয়!"

"আজ যে বিশাখা এল না প্রশান্তবাবু?"—ও প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল স্বাতি। প্রশান্তও ঐ কথাটা নিয়ে পড়ল—বড়সাহেব হঠাৎ এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে গেছে—আগে থাকতে জানলে ওকে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করতই। এসে পড়ার পর থেকে যতক্ষণ ছিল অন্যকথা ভাববার ফুসরতই হয়নি তার। ক্ষতি হোল বেচারির পড়াতে .... উত্তর-রামচরিত না পড়ার লজ্জাটা সাধ্য-মতো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো অযথাই, বিশাখার কথাটা বড় করে দিয়ে।

বইটার দিকেই আবার চেয়ে বসেছিলেন লাহিড়ীমশাই, মুড়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"প্রশান্ত এসেছে, আমি তাহলে একটু বেড়িয়েই আসি মা-স্বাতি।"

একটা শ্লোকই গুনগুন ক'রে আওড়াতে আওড়াতে কামিজ প'রে চাদরটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, স্বাতি এগিয়ে গিয়ে টর্চ আর লাঠিটা হাতে তুলে দিল।

একটা অস্বস্তির ভাব যে এসে পড়েছিল দুজনেরই মধ্যে ওঁর অসংযত প্রশ্নটার জন্যে সেটা আরও বেড়েই গেল। একটা অসংযত কাজও করে বসলেন তো লাহিড়ীমশাই। অনাথ হাটে গেছে, এখনও ফেরেনি, খালি বাড়িতে মাত্র ওরা দুজনেই রইল।

যেন সমস্তটুকুই ধ'রে নিয়ে কিছু একটা বলে অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যই প্রশান্ত বলল—"আজ বড্ড যে অন্যমনস্ক রয়েছেন।"

"ঠিক তাই।"—মুখ খুলতে পেরে স্বাতি যেন বাঁচল,

বলল—"আসল কথা, আজ অনেকদিন পরে উনি যেন পড়িয়ে বেঁচেছেন প্রশান্তবাবু। বিশাখা না আসায় আমায়ই তো পড়াচ্ছিলেন।"

"বিশাখাকে পড়ানোটা পছন্দ করেন না নাকি!"—একটু চকিত হয়েই প্রশ্নটা করল প্রশান্ত।

"আমার বলতে ভুল হয়ে গেছে।" লজ্জিতভাবে স্বীকার করল স্বাতি, বলল—"চলুন বাগানে গিয়ে বসা যাক—তেমনি গরম পড়েছে আজ। টুইশন নিয়ে একটা কথা অনেকদিন থেকে বলব মনে করছি আপনাকে, বিশাখা থাকলে স্থবিধে হয় না।···· একটু দাঁড়ান, চেয়ার দুখানা রেখে আসি আগে।"

একখানা তুলেছে, প্রশান্ত অন্যটাও তুলে নিল, বলল—"ওটাও আমায়ই দিন বরং।······ আমাদেরই কাজ ওটা।"

স্বাতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে স্পষ্ট হওয়ার অবসর না দিয়ে বলল,—"আসুন—তাহলে নিজের নিজের।"

একটু হেসেই বলল। যখন চেয়ার পাতল তখন আবার গম্ভীর হয়ে গেছে, একটু বিষণ্ণও। প্রশান্ত বসলে নিজেও বসে বলল—"মাফ করবেন, আমার বলতেই একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। বাবা বিশাখাকে পড়ানোটা যে অপছন্দ করেন এমন নয়—মোটেই এমন নয়—পড়া আর পড়ানোই তো ওঁর জীবনের আনন্দ—এমন দুঃখের মধ্যেও ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে—বিশাখাকে পড়িয়েও আনন্দ পান—তবু—কোথায় যেন······"

যেন ভাষার অভাবেই কথাটা অসমাপ্ত রেখে তখনই আবার বলল—"আসল কথা টুইশানি বলতে যা বোঝায় সেটা মনে ধরছে না বাবার।"

একটু চুপচাপ গেল। স্বাতি এর বেশি যেন স্পষ্ট করতে পারছে না।

প্রশান্ত সামনের আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে বলল—"টাকা নেওয়াটা কষ্টকর হচ্ছে ওঁর পক্ষে।"

"ঠিক তাই। অথচ ভয়—না নিতে চাইলে বিশাখাকে আপনারা

পাঠাবেন না। আমার ভয় তো আরও বেশি। একবার ব'লে এই উত্তরই তো পেয়েছিলাম।"

একটু ম্লান হেসে আবার তখনই আরম্ভ করল যাতে যে-সুযোগটা পেল সেটা নষ্ট না হয়ে যায়; বলল—"দেখেছি, যেদিন খুব মন লেগে যায় সেদিনও যেন কোথায় একটা ব্যাথা লেগে থাকে বাবার—সেদিন যেন আরও বেশি করেই—আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না আপনাকে —যেন এই রকম আনন্দটায় এতবড় একটা লজ্জা লেগে রইল……"

"লজ্জা, স্বাতি দেবী?—নিজের মনের কথার সঙ্গে এতটা মিলে যাওয়ায় একটু চকিত-বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করল প্রশান্ত।

স্বাতি বলল—"লজ্জাই। আপনি যদি ওঁর সমস্ত জীবনের কথা ……" চোখ দুটি ছল ছল করে উঠেছে, হঠাৎ হুঁস হ'তে থেমে গেল।

ওর সামনে চোখের জল এসে পড়তে এই প্রথম দেখল প্রশান্ত। মনটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর, তবে এ-বেদনায় একটা অভিনব আনন্দও আছে; খুব কাছে না এসে পড়লে তো মন এমন তরল হয়ে অশ্রুরূপে দেখা দেয় না।

অশ্রুবিন্দু দুটি কিন্তু মাঝপথেই গেল থেমে; একটা আশঙ্কা এসে পড়েছে মনে, বেদনার সঙ্গে সমবেদনায় অসতর্ক হয়ে প'ড়ে যেটুকু বলে ফেলল তাতে ওঁর জীবন সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে উঠে প্রশ্ন না করে বসে প্রশান্ত। একটু চুপ করেই রইল, তারপর কিন্তু মনের গোলমালে আরও অসতর্কভাবেই বলে ফেলল—"আপনার বোন হলে অন্য কথা ছিল, বন্ধই করে দেওয়াতাম টাকাটা, কিন্তু রজতবাবুর কাছে জোর খাটাতে গেলে …"

"মা-মণি বাগানে নাকি গো?"

বারান্দা থেকে অনাথের প্রশ্নটা ভেসে আসতে বাধা পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, এবার অসতর্কতায় মনের আর এক কোন্ গোপনতর কক্ষের চাবি খুলে বসেছে, সে-কথাটা ভেবে দেখবার আর অবসরও পেল না স্বাতি।

এর পরেও না। যেটার দিকে মন গেলে খুবই লজ্জায় পড়ে যেতে হোত, সেটাকে আর এক লজ্জা দিয়ে একেবারেই চাপা দিয়ে দিল অনাথ। প্রশ্নর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল—"এই যে ইন্‌জিয়ারবাবুও এসে গেছেন, বেশ হোল। এনছান মিঁয়া এ্যাদ্দিন পরে আজ ফটোকের ফেরেম ছুটো বাঁধিয়ে দিলে। এই যে।"

র‍্যাশন ব্যাগের ভেতর থেকে কাঠের ফ্রেমে আঁটা ছুটো ফটো বের করল। একটাতে স্বাতি, তার পাশে বিশাখা, তার পাশে রজত, একটাতে রজতের জায়গায় প্রশান্ত। ওরা যেদিন নদীর ধারে বেড়াতে যায় সেদিন রজতের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ-লাইটে তোলা হয়। একটা তোলে রজত, একটা তোলে প্রশান্ত।

লজ্জায় যেন মাথা তুলতে পারছে না স্বাতি। একটা ফটো ওর হাতে দিয়েছে অনাথ একটা প্রশান্তর হাতে, যেটাতে প্রশান্ত রয়েছে। অনাথ বলে যাচ্ছে—"মা-মণি ফি হাটেই তাগাদা দিচ্ছে, উদিকে এনছান মিঁয়ার আর চাড় হয় না—এক হাটে তো এলই না—তারপর গতহাটে যদি বা এল……তা, হাত আছে কিন্তু, বেঁধেছে ভালোই……কি ক'ন ইন্‌জিয়ারবাবু? ……মা-মণি কি বলো গো? —দিব্যি মানানসইটি হয়নি?"

'মানানসই'—সে নিশ্চয় ফটো আর ফ্রেমে, স্বাতি কিন্তু রাঙা হয়ে গিয়ে উত্তর খুঁজে পেল না হঠাৎ। প্রশান্তও মৌন থাকায় যে সময়টা গেল তাইতে টীকাও করে দিল অনাথ, বলল—"ফটোক তোমার ছোট হোক, ফেরেম দিয়েছে কেমন জোড়দার!"

ঐতেই বাঁচাল।

"চমৎকার!"—বলে একটু হেসেই উঠল স্বাতি। বলল "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি!……যাও, তুমি একটু তাড়াতাড়ি চায়ের জলটা বসিয়ে দাও গে। দেরি করে ফেলেছ আজ।"

হেসে বাঁচল, প্রশান্তও; ছোট সাইজের ফটো, তাতে প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা আর বিঘৎখানেক লম্বা কালো ফ্রেম এঁটে হাতের পরিচয় দিয়েছে এনছান মিঁয়া। বলল—"আমায় দিন বরং, কাল

কলকাতায় লোক যাচ্ছে, ভালো ব্রোঞ্জ বা নিকেলের ফ্রেমে বাঁধিয়ে আনাচ্ছি—কি পছন্দ আপনার ?

"যেটা ভালো বুঝবেন। এনছানের হাত না থাকলেই হোল।"

একসঙ্গে হেসে উঠে দু'জনে বাকি জড়তাটুকু কাটিয়ে বাঁচল।

[উনিশ]

এরপর আর সব গিয়ে ঐ একটি কথাই মনে গেঁথে রইল প্রশান্তর —স্বাতি বলেছে বিশাখা তার বোন হলে বন্ধ করাতই টুইশনের টাকাটা, রজতের ওপর তো জোর নেই।

ব্যঞ্জনায় স্পষ্টই দাঁড়ায় প্রশান্তর ওপর জোর আছে।……কিসে এই জোর ?

যে কমলটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তাদের দুজনকে নিয়ে, এই কথা, এই প্রশ্ন যেন তার মধুকেন্দ্র হয়ে রইল। আরও এগিয়ে এল স্বাতির দ্বারা, স্বাতির ঘর আরও আপন ঘর হয়ে উঠল। ভালোবাসা তো শুধুই সুখ নয়; শুধুই যা সুখ তা এত অন্তরঙ্গ তো হ'তে পারে না। স্বাতিদের বেদনা, স্বাতিদের লজ্জাও আরও নিবিড় হয়ে উঠল প্রশান্তর বুকের মধ্যে।

কিছু করা যায় না ?

—এবার কিন্তু একটা নিরুপায় প্রশ্নের আকারেই শেষ হয়ে রইল না ব্যাপারটুকু। কিছু একটা করতেই হবে; না করে উপায় নেই।

যেটা ছিল মাত্র অবসর কালের চিন্তা সেটা কর্মের মধ্যে পর্যন্ত প্রবেশ করে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল।

এই সময় অভাবিতভাবে একটা সুযোগ হঠাৎ এসে উপস্থিত হোল।

কিছু বাতিল-করা কাঠ-কাটড়া, লোহালক্কড়, করগেটের শীট, এস্‌বেস্‌টস্‌ ইত্যাদি পড়ে ছিল কলোনি আর পুলটা যেখানে হচ্ছে

সেইখানে, ইতস্ততঃ ছড়ানোই। একদিন মাইল তিনেক দূরের বাবলা বলে এক গ্রাম থেকে তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখা করলেন প্রশান্তর সঙ্গে—যদি মালগুলো নিলামে পাওয়া যায় তো ওঁরা নেবেন।

"কি দরকার ?"

—প্রশান্তর কতকটা অনাবশ্যক কৌতূহলেরই প্রশ্নে ওঁরা জানালেন একটা স্কুল স্থাপন করছেন গ্রামে। এর-মধ্যে অনেক জিনিস ওঁদের কাজেই লাগবে, বাকিগুলো ওঁরা বিক্রয় করে টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন, লটে কিনলে সস্তাই তো পাবেন আশা করেন। স্কুল, সুতরাং ওঁরা প্রশান্তর সহানুভূতির আশা করেই এসেছেন।

প্রশান্তর মনে একটা চিন্তার স্রোত নেমেছে। পাচক-ঠাকুর চাটুজ্যেকে ডেকে সবার জন্যে চায়ের কথা বলে দিল।

তারপর যা কথাবার্তা হোল তা থেকে জানতে পারল বেশ ভাল-ভাবেই তোড়জোড় করে কাজে নেমেছেন এঁরা। এ প্রান্তে স্কুলের বেশ অভাব, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করতে প্রস্তুত, তবে অর্ধেকটা টাকা এঁদের যোগাড় ক'রে দেখাতে হবে। কয়েকটা গ্রাম নিয়েই উৎসাহের ঢেউ উঠেছে, একজন জমি দিয়েছে স্কুলের জন্যে, সামনের মাসেই দিন স্থির হয়েছে স্কুলের বনেদ দেওয়ার জন্যে। নূতন সেশন থেকেই যাতে স্কুলটা চালু হয়ে যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রশান্ত জানাল সে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। এখানে যে মালগুলো আছে সেগুলো যতটা সম্ভব ওঁদের সুবিধা ক'রে দেবে, তা ভিন্ন রেলের অন্যান্য জায়গাতেও যে নিলাম হয় তার সঙ্গে এঁদের সংযোগ ঘটিয়ে যাতে কিছু অর্থাগম হয় তার চেষ্টা করবে; এঁরা নিলামে কিনে যাতে সেইখানেই বিক্রয় করে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে। অবশ্য যতটা তার শক্তি আর আয়ত্তের মধ্যে সম্ভব। তা ভিন্ন অন্যভাবেও কিছু টাকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবে—ওদের হাতে অনেক ঠিকাদার থাকে তো

ওর উৎসাহের বহর দেখে ওঁরা কিছু বিস্মিতই হোলেন; একেবারেই অপ্রত্যাশিত তো। একটা এমন প্রভাবশালী লোক,

এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে। ওঁদের যে সমিতি রয়েছে তাতে একটা খুব উঁচুতে স্থান দিয়েও নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। অভূতপূর্ব সাফল্যের আশায় মনে একটা উদ্দীপনা এসে গেছে। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন সমিতির সভাপতিই। টের পাওয়া গেল এঁর মাতার নামেই স্কুলটা হবে, ইনিই জমি আর একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছেন। ইনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে প্রশান্তকেই সেখানে আহ্বান করলেন।

প্রশান্ত জানাল—ঠিক এই ধরনের কোন লোভে সে প্রস্তাব করেনি, তা ভিন্ন সরকারী কর্মচারী হিসাবে সম্ভবও নয় তার পক্ষে এইভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা। তবে তার একটা স্বার্থ আছেই।

জানাল সেটা। তার একজন নিকট-আত্মীয় আছেন, তাঁকে শিক্ষকদের মধ্যে উঁচুর দিকেই একটা স্থান দিতে হবে। জানাল—অযোগ্য ব্যক্তি তিনি নয়। এম-এ, তবে সংস্কৃতয় এম-এ। আর ট্রেনড্ নয়, শিক্ষণ-বিষয়ে সার্টিফিকেট নেই কোন, অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। এ-সবের ওপর আজকাল খুব জোর দেওয়া হয় বলেই বলল প্রশান্ত, অন্যথা তাঁর পাণ্ডিত্য বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই; তার সঙ্গে বিদ্যানিষ্ঠা, চরিত্র—সে সব দিক দিয়ে একজন আদর্শ শিক্ষকই। আর স্থানীয় লোকই।

ওঁরা তিনজনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শের জন্য একটু উঠে গেলেন। তিনজনের মুখই উৎসাহে দীপ্ত। একটু পরে ওঁরা ফিরে এলেন। যিনি সভাপতি—তিনজনের মধ্যে বয়সও তাঁরই কম, বললেন—তিনি আজই এ-সম্বন্ধে উত্তরটা দিতে পারতেন, তবে অন্য সবাই মনে করতে পারে তাঁর মায়ের নামে স্কুল বলে এবং তিনি জমি প্রভৃতি দিয়েছেন বলে একটা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করছেন, আর সবাইয়ের অভিমত না নিয়ে। তিনি এই পর্যন্ত আজ কথা দিলেন যে প্রশান্তর আত্মীয়ের জন্য একটা ভালো রকম জায়গাই রাখা থাকবে, তবে

এ-বিষয়ে পাকা-রকম বলবার জন্যে পরদিন পর্যন্ত সময় নিলেন। এই সময়ই আবার আসবেন ওঁরা।

পরদিন আরও দু'জনে এলেন ওঁদের সঙ্গে। তার মধ্যে একজন প্রস্তাবিত স্কুলের সেক্রেটারি। শিক্ষিত যুবক, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। পরিচয়ে টের পাওয়া গেল সে-ই স্কুলের হুজুগটা তুলে আর সবাইকে টেনে এনেছে এর মধ্যে। ঘোরাফিরা করা, যাঁদের হাতে স্কুলের মঞ্জুরি তাঁদের সঙ্গে দেখাশোনা করা, সব এই করে; রাজনৈতিক মহলেও খানিকটা গতিবিধি আছে। কাল যে আসতে পারেনি, তা কলকাতাতেই এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিল বলে। বেশ আনন্দ হোল যুবকটির সঙ্গে আলাপ করে প্রশান্তর। সেই জানালো, ওরা একটা জরুরী মিটিং ডেকে কথাবার্তা স্থির করে ফেলেছে। প্রশান্তর আত্মীয়কে ওরা হেডমাস্টার করেই নিয়োগ করে নেবে। উনি এম. এ., স্থানীয়, আপত্তির কিছুই নেই, যদি বা কিছু ওঠে কথা ওপর মহলে তো সে ঠিক করে নিতে পারবে।

একটু অদ্ভুত উদ্দীপনার হাওয়া এসে গেছে কাল থেকে। প্রশান্ত উঠে গেল। ভেতর থেকে একটা পাঁচশত টাকার চেক কেটে নিয়ে এসে সভাপতি ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল—"এটুকু আমার ব্যক্তিগত সাহায্য। একটা কথা আপনাদের জোরের সঙ্গে বলছি—আপনাদের কখনই একথা মনে হওয়ার কারণ হবে না যে আমি এইভাবে আপনাদের অনুগ্রহ কিনে নিচ্ছি।"

ঠিক হোল, আপাততঃ স্কুলের প্রস্তুতিপর্বের কাজ-কর্মের জন্য একশত টাকা করে দেওয়া হবে। স্কুল চালু হয়ে গেলে তখন পাকা ব্যবস্থা।

এত বড় একটা আনন্দের সংবাদ, প্রশান্তর মনে হোল তখনই মোটর বের করে ছুটবে স্বাতিদের বাড়ি। তারপর সে-ঝোঁকটা সামলে অফিসেই চলে গিয়ে নিলামের জন্য বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা চিঠি লেখালো হেড-অফিসে—বর্ষা এসে গেছে, জিনিসগুলো আরও নষ্ট হবে, তাভিন্ন চুরির ভয়ও রয়েছে—কিছু গেছে বলেই

সন্দেহ হয়—চৌকিদারি করবার জন্ত একটা লোক রাখাই দরকার, কিন্তু সে খাতে অযথা একটা খরচ না ক'রে তাড়াতাড়ি নিলাম করে দেওয়াই ভালো। চিঠিটা তখনই ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে জীপে করে ঘুরে ঘুরে একটা আন্দাজও করে নিল, কত আর কি ধরণের মাল আছে, কি মূল্য হতে পারে।

ব্যাপারটা ওকে যেন পেয়ে বসল একেবারে। সন্ধ্যায় স্বাতিদের বাড়ি গিয়ে এত অন্তমনস্ক রইল, কথাবার্তায় এমন ভুল হয়ে যেতে লাগল মাঝে মাঝে যে একটা ছুতা করে সেদিন চলেই আসতে হোল অন্তদিনের চেয়ে আগে। একটু চিন্তিতই ক'রে রেখে এল তু'জনকে।

পরদিন গেলই না স্বাতিদের ওখানে, ভাবল মনের তুর্বলতায় স্বাতির জেরায় প'ড়ে যদি বলেই ফেলে কথাটা তো সে একটা মস্তবড় ভুল ক'রে ফেলা হবে। বস্তুতঃ একদিনের কথাবার্তার ওপরই নির্ভর তো। সন্ধ্যার আগেই জীপটা পাঠিয়ে আনিয়ে নিল বিশাখাকে।

বিশাখা এসে জানাল, খুবই চিন্তিত আছেন তুজনে। মুখটা একটু ভার করেই অনুযোগের স্বরে বলল—"আমায় এগিয়ে দিতে আসতে আসতে দেখলাম স্বাতিদির চোখ ছলছল করে উঠেছে প্রশান্তদা', কাল থেকেই তো কিছু বুঝতে পারছেন না।"

নিঃসংশয়িত পথে এ আবার নূতন বিপদ উপস্থিত! প্রশান্ত গোপেশ্বরকে আটকেই রেখে একটা চিঠি লিখে দিল স্বাতির নামে। লিখল—সায়েব এবার এসে কয়েকটা বাড়তি কাজ দিয়ে গেছে, তাই নিয়েই পড়েছে। চিন্তার কিছুই নেই। তু' তিনদিন বোধ হয় এখন নিজে নাও আসতে পারে। চিন্তার একেবারেই কিছু নেই।

তারপর পুনশ্চ দিয়ে লিখল, এ চিঠিটা যেন লাহিড়ীমশাইকেও পড়ে শুনিয়ে দেয়।

এটুকু লেখবার সময় একটু আত্মগ্লানির হাসিও ফুটল মুখে। এও একটা ভুল করে বসছিল।

পরদিন সকালেই গোপেশ্বরের হাতে একটা চিঠি দিয়ে কলকাতায় হেডঅফিসে ওপর মহলে তার এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিল—নিলাম

সংক্রান্ত তার চিঠিটার কতদূর কি হোল খোঁজ নিয়ে যেন তাড়াতাড়ি বের করিয়ে পাঠিয়ে দেয় মঞ্জুরিটা। গোপেশ্বর সেইদিনই রাত দু'টার গাড়িতে ফিরে এল, সব ঠিক হয়ে গেছে। প্রশান্তর বন্ধু চিঠিটাও দস্তখত করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে গোপেশ্বরের হাতে।

অদ্ভুত দ্রুত বেগে কাজ হয়ে যাচ্ছে, যেন একটা ডাকগাড়িরই গতিতে। স্বাতিদের বাড়ি যাওয়ার জন্য মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। সেইটে সামলাতেই আবার মনটা বাস্তবের দিকে ঘুরল। এবার রূঢ় বাস্তব মনে হোল যেন চোখ রাঙিয়েই চেয়ে রয়েছে তার দিকে!

এ কি করতে যাচ্ছিল সে! নিতান্তই অপরিচিত কয়েকজন এসে কয়েকটা লোভের কথা শোনাল, আর সে হন্তদন্ত হয়ে সেই কথা বলতে যাচ্ছিল স্বাতিদের? মিথ্যা হলে দারিদ্র্যের ওপর কি একটা ক্রুর আঘাত যে দাঁড়াত সে-কথা একবার ভেবে দেখবার বুদ্ধিটা যোগাল না? এই চিন্তার সূত্র ধরেই আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গিয়ে শরীরটা যেন হিম হ'য়ে গেল; কি ক'রে কিছু খোঁজ না নিয়েই নিতান্তই ভাবাবেগে পাঁচশত টাকার একটা চেক কেটে দিয়ে দিল ওদের হাতে!.......আত্মধিক্কারে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।

অফিসেই রয়েছে। কাজের স্তূপ সামনে রেখে চিন্তা। অস্থির করে দিয়েছে। একটা কথা মনে হ'তে দেয়াল-ঘড়িটার ওপর নজর গিয়ে পড়ল। এখনও সময় আছে, ট্রাঙ্ক-কল্ দিয়ে ব্যাঙ্কে মানা করে দেবে—চেকটা আপাততঃ যাতে ক্যাশ না করা হয়।

টেলিফোন যন্ত্রটায় হাত দিয়েছে, বাইরে জীপের হর্ণের শব্দ হোল; বিশাখাকে বাড়িতে নামিয়ে চলে এসেছে গাড়িটা।

মন যখন খুব উত্তেজিত, সামান্য কিছুতেই নূতন পথ ধরে ছোটে। ফাইলগুলো তুলে রাখতে বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল প্রশান্ত। মোটরে গোপেশ্বরকে তুলে নিয়ে ছুটল স্বাতিদের বাড়ির রাস্তা ধরেই। চলেছে বাবলা গ্রামে, ঐ পথ। ছুটে যেতে যেতে চকিতে একবার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল বাড়ির দিকে। দুটি মোড়ায় দুজনে বাইরের

বারান্দাতেই বসে। একটি মুহূর্ত, তাতেই মনে হোল, মোটরে নজর পড়তেই দুজনে একেবারে চকিত হয়ে উঠেছেন। মনে হোল লাহিড়ীমশাই যেন দাঁড়িয়েই পড়েছেন উত্তেজনায়। মোটর গাছের আড়াল হয়ে গেল।

বিশাখা নেই, ওঁর তো বাড়ির ভেতর স্বাতিকে নিয়ে পড়ায় মেতে থাকবার কথা।

[কুড়ি]

যিনি সভাপতি—ত্রিলোক চৌধুরী, তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠল প্রশান্ত। বেশ সম্পন্ন পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থ বলে মনে হোল। কিছু পাকা, কিছু মেটে মিলিয়ে দো-মহলা বাড়ি। বাইরেটা খোলা উঠান, একদিকে গোটাপাঁচেক মরাই। তারই সামনাসামনি দুটো পাকা ঘর।

মোটরের শব্দ শুনে প্রথম ঘরটা থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে তিনজনকে চিনল প্রশান্ত, ত্রিলোক চৌধুরী, সেক্রেটারি নিখিল রায় আর একজন মেম্বার বামনদাসবাবু। এত বিস্মিত হয়ে গেছেন সবাই যে প্রথম অভ্যর্থনার কথাটাও বেরুল না কারুর মুখে। প্রশান্ত এগিয়ে যেতে যেতে বলল—"সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল, ভাবলাম একবার দেখাই করে যাই আপনাদের সঙ্গে, আলাপ হোল—গ্রামটা তো দেখাও হয়নি……"

"আসুন, আসুন, আস্তেজ্ঞে হোক,……আপনি দয়া ক'রে আসবেন—ভাবতেও পারা যায়নি…কল্পনাতীত…."

তিনজনেই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন; সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। একটা বড় চৌকির ওপর ফরাস পাতা, খুব পরিষ্কার নয়, কিছু কাগজপত্র, খাতা, বই ছড়ানো রয়েছে। একটা দোয়াতদানি, একটা বালির পুঁটুলি। চারিদিকে কয়েকটা মোড়া বসানো। ঘরের একধারে তিনখানা চেয়ার। জন-পনেরো লোক রয়েছে ঘরে। প্রশান্ত

একটা মোড়াতেই বসতে যাচ্ছিল, সেক্রেটারি নিখিলবাবুই তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা চেয়ার এনে বসালো। নিজেরা বসল সবাই। নিখিলই বলল—"আপনি দয়া করে, এলেন, আমাদের ভাগ্যি ; আমরা কালই আপনার ওখানে যাচ্ছিলাম।"

আবেগের মাথায় একটা হয়তো ভুলই করে বসছিল মনে হওয়ায় প্রশান্ত খানিক সতর্ক, সংযতবাক। যতটা পারছে লক্ষ্য করে যাওয়ার দিকেই মন। একটু হেসে বলল—"নতুন কিছু হয়েছে আর ?"

"অনেক কিছুই।"—নিখিলই বলল। আমাদের একটা মিটিংই ছিল আবার আজ। এঁরা সবাই মেম্বার।"

এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিল সবার। প্রথম সাক্ষাতের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে আসতে লাগল। ত্রিলোক চৌধুরী একবার উঠে ভেতরবাড়ি হয়ে এলেন।

নিখিল বলল—"আপনার চেকটা আমাদের মস্তবড় এক আশীর্বাদ হয়ে এল। হবেই তো। আপনি নিজগুণে আমাদের আপন করে নিয়েছেন, যেটা আমাদেরই কাজ ছিল সেটা নিজের করে নিয়ে বুক দিয়ে পড়েছেন, ফল হয়েছে—ক'খানা গ্রামের উৎসাহ একেবারে চরমে উঠে গেছে ক'দিনে। আমাদের এষ্টিমেট ত্রিশ হাজার টাকা জমির দাম ধ'রে, চৌধুরীমশাইয়ের টাকা আর জমির দাম ধরে পাঁচ হাজার টাকা উঠেছিল, এই দিন তিনেকে সেটা এগার হাজারে উঠে গেছে, চৌধুরীমশাই-ই নিজের নগদটা ডবল করে দিয়েছেন। আর একটা জিনিস আমরা পেয়ে গেছি। যা আপাততঃ আমাদের চিন্তার মধ্যেই ছিল না—সামন্তমশাইদের তুই সরিক মিলে একটা ফুটবল গ্রাউণ্ড ক'রে দিলেন, স্কুল থেকে খানিকটা এগিয়েই।"

মুখে মুখে খবর পেয়ে লোক জড় হয়ে গেছে বাইরের বারান্দায়, উঠানে। বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে।

বাড়ি থেকে চা, হালুয়া, চন্দ্রপুলি এল। আহার-পর্ব শেষ হলে, কমিটির সবার অনুরোধে (অগ্রণী নিখিল রায়ই) স্কুলের জায়গা, খেলার মাঠ সব দেখেও এল প্রশান্ত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি।

ঘুরে এসে আবার ঘরে বসল। একটা প্রবল আবেগ ঠেলে উঠছে ভেতর থেকে প্রশান্তর। নিলামের চিঠিটা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। পকেটে ক'বার হাতটা আপনি গিয়েও পড়ল, টেনে টেনে নিল। আশঙ্কা হয়েছিল একটা মস্তবড় ভুল হয়ে যাচ্ছিল না কি, তাই হঠাৎ কিছু ক'রে বসবে না ঠিক ক'রেই এসেছে।

এবার আরও একটা কঠিন প্রলোভন এসে পড়ল। নিখিল বলল —"এবার আমরা যার জন্যে কাল আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আজকের মিটিংটা ডাকা হয়েছে সেদিনকার কথাটা পাকা ক'রে ফেলবার জন্য।....এই আমাদের রেজোলিউশন্।"

একটা খাতা খুলে সামনে ধরল। লাহিড়ীমশাইয়ের নিয়োগের প্রস্তাবটা রয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। শুধু নামের জায়গাটা বাদ। ও যতক্ষণ পড়ছে একটা খাতার মধ্যে থেকে একটা চিঠিও বের করল, নিয়োগপত্র, বলল—"এইটে নিন্ এবার। নামটা শুধু বসিয়ে দিতে হবে, খাতাতেও, এতেও।"

একটা আবার নূতন সমস্যা এই নাম! কিন্তু এদিকে ততটা খেয়াল ছিল না প্রশান্তর। প্রশ্ন করল—"টাকাগুলো আপনারা কোন্ ব্যাঙ্কে রেখেছেন?"

সামলে বলল—"মানে বেশ সেফ্ তো, আজকাল ব্যাঙ্কগুনোর যা অবস্থা।"

ছোকরা বেশ বুদ্ধিমান্, কথাটা লুফে নিয়ে বলল—"হ্যাঁ, ঠিক। ওগুনো তো দেখানই হোল না আপনাকে—যখন পেয়েই গেছি এখানে। চৌধুরীমশাই, যান তো ব্যাঙ্কের বইটা নিয়ে আসুন—আর সেই সঙ্গে জমির দস্তাবেজটাও।"

প্রশান্ত সামলে নিল, বলল—"থাক, নিয়ে আসবার কি দরকার? বলছিলাম ব্যাঙ্কটা সেফ্ তো? এত কষ্ট করে সংগ্রহ করা টাকা··· হ্যাঁ, এই দেখুন, আমি যা করতে এলাম সেইটিই ভুলে ব'সে আছি।"

ব্যাঙ্ক-বইয়ের কথাটা চাপা দিয়ে পকেট থেকে নিলামের চিঠিটা বের করে বলল—"এই দেখুন, অর্ডার এসে গেছে—লোক পাঠিয়ে

আনিয়ে নিয়েছি কাল রাত্তিরে। এবার আপনারা গিয়ে ডেকে নিন মালগুলা তাড়াতাড়ি। সরকারি ডাকের ওপর সামান্য কিছু চাপিয়ে ডেকে নেবেন। ঠিকেদাররাই তো নেয় এ-সব। আমার টেপা থাকবে, দাঁড়াবে না কেউ।”

নিয়োগ-পত্রটাও নিল দস্তখত করে। বলল—ডাক নাম ধরে অমুক কাকা বলেই জানে বরাবর। আসল নামটা পরে বসিয়ে নিলেই হবে, বইয়ের রেজলিউশনেও। আপাততঃ নিয়ে যাচ্ছে, খুব উৎসুক হয়ে রয়েছেন তো।

আর দ্বিমত করল না প্রশান্ত। একটা তীব্র উৎকণ্ঠাতেই যে কাটছে ছুজনের, বিশেষ করে স্বাতির, তার শেষ প্রমাণও তো এই ঘণ্টা ছুয়েক আগে পেয়ে গেল আসার পথে।·· বারান্দায়ই বসে ছুজনে ; পথের দিকে চেয়ে।

যখন নামল স্বাতিদের বাড়ি, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। ছুজনের মধ্যে স্বাতি তখনও এইদিকেই ; সামনে যে ছোট বাগানটা করেছে অনাথ, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বেড়া থেকে ঝিঙে তুলে আঁচলে সংগ্রহ করছে, ওকে দেখে এগিয়ে আসতে প্রশান্ত একটু হাসি মুখেই প্রশ্ন করল—“আপনার কতগুলি হোল ?”

হাসি দেখে মুখের ভাব অনেকটা সহজ স্বাতির, প্রশ্নটাতে একটু বিস্মিত হয়ে বলল—“কি কতগুলি হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করছেন ?··· ও ! ঝিঙে ? কি করব ?—কাজ নেই কোনও···আপনি যে···”

“অকেজো লোকেরই কাজ ওটা তাহলে ?” নেমে এগিয়ে আসতে আসতে বলল প্রশান্ত। বলল—“বেশ, তার ফয়সালা হচ্ছে এখুনি, আগে অনাথকে,···এই যে অনাথ, একবার এদিকে এসো।”

অনাথ বোধহয় স্বাতির ফরমাসেই একটা ছোট্ট ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, বলল—“ওটা রেখে দাও, কুলুবে না।”

ও এগিয়ে এলে ছুজনকে সঙ্গে ক'রে আবার মোটরের কাছে গেল প্রশান্ত। খোলের মধ্যে একটা বেশ বড় চাঙারিতে নানা রকম তরিতরকারি, একটাতে কলা, আম ; ছুটো হাঁড়িতে দাদখানি চাল

আর সোনা মুগের ডাল, নীচে সের চার-পাঁচের একটা রুই মাছ। গাঁয়ের সওগাত।

দুজনেই বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল। প্রশান্ত অনাথকে বলল—"নিয়ে চলো ভেতরে। তোমার কাজ অনেক, তাড়াতাড়ি কলোনিতে গিয়ে আমার বাড়ি থেকে চাটুজ্জেকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে। রজত আর বিশাখাকেও বলে আসবে, আজ হেঁসেল এখানেই। আমি কোন সময় গিয়ে নিয়ে আসব তাদের।

"কিন্তু এসব ··" প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল অনাথ।

"সে রিতিহাস পরে শুনবে"—ওর ভাষার নকল করে বলল প্রশান্ত—"আগে নিয়ে এসো ভেতরে। বেরিয়ে যাও তাড়াতাড়ি।"

"আসুন"। বলে ঘুরে স্বাতিকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগুল। প্রশ্ন করল—"কাকা কোথায়? বেড়াতে গেছেন?"

"বাবা?"—বুঝলেও 'কাকা' কথাটা ওর মুখে নূতন বলেই প্রশ্ন করল স্বাতি। এক হিসাবে, আপনিই যেন বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা; বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছে তো। প্রশান্ত বলল—"হ্যাঁ, আজকে এই নতুন সম্বন্ধটা পাকা করে এলাম যে।"

"বাবাকে একটু জোর করেই পাঠিয়ে দিলাম বেড়াতে।···মনটা বড় চঞ্চল হয়ে রয়েছে ওঁর—কদিন থেকেই। ··আপনি···"

"আসুন ভেতরে; হচ্ছে।"—সিঁড়িতে পা দিয়ে বলল প্রশান্ত।

[একুশ]

কয়েকদিন পরের কথা। এর মধ্যে আরও বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে স্বাতিদের জীবনে; আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে লাহিড়ীমশাইয়ের জীবনে। উনি স্কুলের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শুধু প্রস্তুতি-পর্বের চিঠিপত্র লেখালেখির কাজই নয়, উনি স্কুলই বসিয়ে দিয়েছেন কিছু কিছু করে। গ্রামের জমিদার

সেনগুপ্তরা এক রকম কলকাতাবাসীই হয়ে পড়েছিল, জমিদারি যাওয়ার পর আরও সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে, লাহিড়ীমশাইয়ের চেষ্টাতেই তাঁদের বাড়িটা চেয়ে নিয়ে তাতে স্কুল বসানো হয়েছে; আরও কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করে নিয়ে। একটা সমস্যা একটু রয়েই গেল, স্কুলের বই আর নিয়োগপত্রে ওঁর নামের কথাটা নিয়ে। ওটার জন্য আপাততঃ কিছু আটকাল না। নিয়োগপত্রের প্রশ্নটা তুললেনই না লাহিড়ীমশাই নিজে, প্রশান্ত নিয়ে রেখেছে বলে একটা কথা হয়ে গিয়েছিল গোড়ায়, কাজের উন্মাদনার মধ্যে সেটা সেইখানেই রইল দাঁড়িয়ে। এঁদের দিকে। ওদিক থেকে কথাটা ওঠেনি। 'হেডমাস্টারমশাই', 'লাহিড়ীমশাই' বলেই চলল। দু'এক মুখে ক'বার যে প্রশ্ন স্বাভাবিক কৌতূহলেই উঠে থাকবে, সেটা একটা স্থায়ী রূপ নিল না। পাড়াগাঁয়ে নাম ধ'রে ডাকবার রেওয়াজও নেই, ঐভাবেই চলল। নূতন স্কুলের অন্যসব কথার সঙ্গে হেডমাস্টার মশাইয়ের পড়ানর-যশ নিয়েই গ্রামটা মেতে রইল।

শুধু একজনের মনটা এইদিকে রইল পড়ে। প্রশান্তর। এই যে উঠছে না কথাটা, এটা নিতান্তই অনিশ্চিত ব্যাপার। এখন সবই কাঁচা কাজ, চলে যাচ্ছে, তবে উঠবেই কথা কোন দিন। চিন্তা করে, উপায় ভাবে। খুব সতর্কভাবে অনাথের মনে টোকাও দিল বার দুই। আরও কিছু নতুন 'রিতিহাস' সংগ্রহ হোল; কিন্তু নামের বেলায় সতর্কই রইল অনাথ।

একটা সম্ভাবনা রইল, মাসের শেষে জানা যাবে, মাইনে নিয়ে কি নামে দস্তখত দেন। দৈবক্রমে সেটাও ওর একেবারে চোখের নীচেই হয়ে গেল। পরের মাসে গোড়ার দিকে দিন তিনেক বাড়িই বসে রইলেন লাহিড়ীমশাই একদিন বর্ষায় ভিজেছেন, শরীরটা একটু অসুস্থ ছিল। তৃতীয় দিন স্কুলের চাকর ওঁর মাইনেটা আর একটা খাতা নিয়ে এল। কুড়ি তারিখ থেকে কাজ আরম্ভ করেন— পঁচাত্তর টাকা প্রাপ্য। বিকাল বেলা, গরমের জন্য বাগানেই বসেছিল সবাই। প্রশান্ত কাছেই চেয়ারে ব'সে ছিল, নিতান্ত যেন অনবধান-

ভাবেই লক্ষ্য ক'রে দেখল লাহিড়ীমশাই দস্তখত দিলেন—ডি, লাহিড়ী।

ও সমস্যাটুকু লেগেই রইল প্রশান্তর।

তবে মাত্র ঐটুকুই। আর সব রকমেই ওঁদের জীবনের দিক-চক্রটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মনের মতো কাজ পেয়ে মনটি বেশ প্রসন্ন থাকে লাহিড়ীমশাইয়ের। স্কুলটা খুব দূরেও নয়। বাবলা গ্রামটা কলোনি থেকেই তিন মাইল, যেমন সেদিন ওঁরা বলেছিলেন। স্বাতিদের বাড়ি থেকে মাত্র মাইল খানেকই পড়ে। গ্রামের বাইরে এই দিকেই স্কুলের নিজের বাড়ি তোয়ের হচ্ছে, তাতে আরও কিছু কমেই যাবে পথ। তারপর মাঠ ভেঙে সোজা পথে গেলে আরও কম, পোটাক পথই দাঁড়াবে। বাড়ি থেকে দেখাই যাবে স্কুলটা। এখন অবশ্য প্রশান্তর জীপেই যাচ্ছেন-আসছেন। ভবিষ্যতে প্রশান্ত না থাকলেও পথটা মোটেই কষ্টকর হবে না।

বাকি থাকল ওঁর অন্য এক কষ্টের কথা। মনের কষ্ট, যেটাকে স্বাতি ওঁর লজ্জা ব'লে চালাল, অর্থাৎ বিশাখাকে পড়ানর জন্যে মাইনে নেওয়া। এরই কথা তো ভাবছিল প্রশান্ত যখন বাবলার এঁরা সব স্কুলের প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন।

এটা ওঁর দিক থেকেই ওঠা দরকার। তবে প্রশান্ত নিশ্চিন্ত আছে। এখন মনটা স্কুল নিয়েই রয়েছে; তা ভিন্ন টাকাটা নিজের হাতে করে নেন না ব'লে পড়ছেও না মনে; তবে এক-দিন-না-এক-দিন পড়বেই এবার।

ওঁর মাইনে নেওয়ার সময় আবার ওর বুদ্ধিটা হঠাৎ যুগিয়ে গেল। লাহিড়ীমশাইয়ের নির্দেশে স্বাতিই টাকাটা নিয়ে অনাথকে ডেকে তার হাতে দিয়েছে, প্রশান্ত বলল—"ভাবছি রজতকে কাল সকালে আপনার কাছে একবার পাঠিয়ে দোব, একবার দেখুক এসে।"

"যেন বেশি টাকা দেখেছেন আমার?"—কথাটা বলেই এমন জোরে হেসে উঠলেন লাহিড়ীমশাই যে স্বাতিকেও হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে হল। একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়ল প্রশান্ত, বলল—"না—সে

কথা নয়। পেমেণ্ট্ সম্বন্ধেও দেখছি ওঁরা খুব হুঁসিয়ার—তাই ভাবছিলাম—মানে, তিনদিন তো হয়ে গেল, সর্দিটা ছাড়ছে না……”

সকালবেলা নিজেই নিয়ে এল রজতকে।

স্কুলেরই কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন লাহিড়ীমশাই; মনটা ওদিকেই। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক দেখেশুনে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে উঠে যাচ্ছিল রজত, বাবলাতেই একটা কেস্ দেখতে যাবে, এসে প্রশান্তকে সঙ্গে করে ফিরবে, লাহিড়ীমশাই অনাথকে ডেকে ওর ফিটা দিয়ে দিতে বললেন।

রজত লজ্জিতভাবে বলল—আপনি এখনও সেই ভাবটা ধরে রেখেছেন?”

“দোষ প্রশান্তর, আমি কি করব? আমার অনেক টাকা দেখে বন্ধু ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এসেছে।”—নিজেও হেসে উঠলেন আর সবাইকেও যোগ দিতে হোল।

প্রশান্ত বলল—“আমি রজতের হয়েই বলি—আপনার আশীর্বাদে ওর এখন কল্ হচ্ছে ভালোই……”

“তোমাদের শুভেচ্ছায়, আমারও তো একটা আয়ের পথ খুলেছে। যখন ছিল না তখনও নিয়েছিলে—আমার যুক্তির জোর ছিল বলেই তো। না, ভেবে গ্যাখো।……অনাথ তুইও বোকার মতন হাঁ করে রইলি যে?—দেবে ফিটা ওঁর হাতে তুলে, তা নয়। ব্যাটার যত হচ্ছে ততই লোভ বাড়ছে।”

হয়তো তাই। অনাথ একটু কম্পিত হস্তেই একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেছে, ওঁর যুক্তিটা অভীপ্সিত পথ ধরল না, নিশ্চয় অন্যমনস্কতার জন্যই বিশাখার মাইনে বন্ধ করার কথাটা তুললেন না উনি দেখে প্রশান্ত একটু দমেই গেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না, স্বাতি অল্প হাসি নিয়ে ঘাড় হেঁট করেই ছিল, মুখ তুলে বলল—“আমার ধৃষ্টতা হয়, তবু একটা কথা বলি?”

“বল না মা।” লাহিড়ীমাশাই বললেন। একটা সংস্কৃত শ্লোকও বললেন। যার মনে হয়—স্ত্রীবুদ্ধি দুর্বোধ্য—প্রলয়ংকরী হয়ে সম্পদের

সময় কখনও কখনও অনিষ্ট সাধন করলেও বিপদের সময় চিরদিনই শুভংকরী হয়ে ইষ্টসাধনই করে।

প্রশান্তও বলল—"বলুন না—হ্যাঁ, বলুন—আমিও তাহলে ধৃষ্টতার একজন সঙ্গী পেয়ে বাঁচি।"

স্বাতি বলল—"একদিকের আশীর্বাদ আর একদিকের শুভেচ্ছাতেই যখন সব হয়ে যাচ্ছে, তখন সে-দুটোকেই থাকতে দিন না। আমি তো বলব টাকা দেওয়া-নেওয়ার কথা দুদিকেই বাদ থাক তাহলে।"

কন্যার প্রশংসায় মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠেছে লাহিড়ীমশাইয়ের। যেন একটা হেঁয়ালি নিয়েই ওদের দুজনের মুখের দিকে চাইলেন, একটু হাসিমুখ ক'রেই বললেন—"বেশ, আমি ফি দেওয়া বন্ধ করলাম। আর কিছু বলবার আছে তোমাদের?"

রজত বলল—"শুধু এইটুকু যে সরস্বতী লক্ষ্মীর ওপর চটা। আমিই অবশ্য লাভে রইলাম, শেষ পর্যন্ত, তবু কথাটা তো সত্যই।"

একটু হাসি উঠল। প্রশান্ত বলল—"একবার অনাথের মতটা নেবেন না?"

অর্থাৎ যেন নেওয়াতেই চায় মাইনেটা। অনাথ স্পষ্ট কিছু না বুঝলেও, সবাই হাসছে দেখেই হাসিমুখে ফিরে যাচ্ছিল, লাহিড়ীমশাই বললেন—"ও-ব্যাটার সন্ত পাঁচটা টাকা যে বাঁচল, এইতেই খুশী। কত যে ডুবল আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবে?"

একটা ঘর ফাটানো হাসি উঠল।

ওঁর মনটা খুব প্রসন্ন। বিশাখার মাইনেটা যে নিতে হবে না এতে যেন আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন দিনদিন। মনে আছে একদিন স্বাতি প্রশান্তকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিল—সংস্কৃত সাহিত্যই বাবার মনটা ভেতরে ভেতরে সরস ক'রে রেখে ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ওঁর ওপর দিয়ে যে ঝড়-ঝাপটা গেছে, অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত।······আজকাল মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গতায় আর গভীর নির্ভরতায় যেমন নিজেদের জীবনের এখানে-সেখানে পর্দাটা একটু ক'রে তুলে ধ'রে আবার তখনি সতর্ক হয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয়।

সেই সরসতাটুকু আবার আসতে আসতে ফিরে আসছে। স্বাতি না বললেও প্রশান্ত তো সব জানেই। দেখে বিস্মিতই হয়, পেছনের সবটুকুই জীবন থেকে মুছে ফেলে যা পেলেন তাই দিয়েই যেন নূতন জীবন গ'ড়ে তোলবার আনন্দে লীন হয়ে আছেন লাহিড়ীমশাই।

যা ছিল তার কাছে অকিঞ্চিৎকরই ; তবু নূতন জীবন যা দিল তাই বা কম কি? প্রাচুর্য নেই, তবে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। যা নিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন চিরদিন—বিদ্যা, তা অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়েছেন. একটা সুদূর-প্রসারী পথই খুলে গেছে জীবনের সামনে। তারপর এই গ্লানিটুকু গেল মুছে—বিশাখাকে পড়াবার জন্যে টাকা নেওয়া।

আরও আছে। সে যে আবার এই নব-জীবনের কী অপূর্ব দান—ভাবতে গেলে সে আনন্দের যেন কূল খুঁজে পান না লাহিড়ীমশাই। স্বাতি-প্রশান্তর সম্বন্ধ, সেটা দিন দিনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সন্দেহাতীত হ'য়ে উঠেছে। বাপের বুকের এ আনন্দ যে কী আনন্দ! কথাটা এখন সবাই জানে। এখানে জানে, কলোনিতে জানে, বাবলায় পর্যন্ত জানে সবাই যে, হেডমাস্টার মশাইয়ের মেয়ে স্বাতি-ঠাকরুণের সঙ্গে পুল-কলোনির বড় সাহেবের বিয়ে ঠিকঠাক ; যবে-না হয়ে যাচ্ছে। ……হঠাৎ বাইরে থেকে এসে বিশাখার ঠাট্টা শুনে বাইরে তাঁকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়েছে কিছুক্ষণ। অনাথ তো প্রায়ই বকুনি খাচ্ছে। কখনও গয়নার প্যাটার্নের কথা তুলে, কখনও আরও উদ্ভট কিছু। ……নিয়ম হিসাবে প্রশান্তর জীপ ওকে আফিসে পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টা খানেক পরে বিশাখাকে স্বাতিদের বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর তাকে নামিয়ে বাবলায় চলে যায় লাহিড়ীমশাইকে নিয়ে আসতে। একদিন কাজ না থাকায় তার আগেই বাড়ি ফিরে বারান্দায় পা দিয়েছেন, বিশাখার গলার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। সেও মাত্র এই এসেছে, বোধহয় উঠান পর্যন্ত যায়নি, হাসির দমকে দমকে বলে যাচ্ছে—"ও স্বাতিদি, কোন্ চুলোয় গেলে—শীগ্‌গির এসো—আমি পেট ফুলে মলুম।……শুনেছ?—কাল নাকি অনাথকাকা জ্যাঠা-মশাইয়ের কাছে কষে ধমক খেয়েছে—বাড়িতে নাকি দুটো নতুন

কোঠা ঘর তোলবার কথা বলতে গিয়েছিল······ কেন রে ? হঠাৎ নতুন ঘর ! বলে ইন্‌জিয়ার-জামাইবাবুর জন্যে—তোমাদের বাড়ির রেওয়াজ নাকি জামাইকে ঘরজামাই ক'রে রাখা···ধমক খেয়ে আবার সেকথা নাকি 'প্রশান্তদাকে গিয়ে বলেছে—প্রশান্তদা বলেছেন দাদাকে—শুনে পর্যন্ত আমার যে কি করে কাটছে—কখন্ রাত পোয়াবে—স্বাতিদিকে বলব খুড়ো-ভাইঝির চক্রান্ত ক'রে প্রশান্তদা'কে পিঁজরেয় পোরবার কথা—উফ !—বাবাগো !—হ্যাঁ স্বাতিদি'—সত্যি ?·······"

এতদূর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত।

লাহিড়ীমশাইয়ের মনটা সরস হোক, কিন্তু ভাবালু প্রকৃতির মানুষ নয় তিনি কোন কালেই। তবু এ-আনন্দের জন্য দোসর খোঁজেন, কোনও নিভৃত চিন্তার মধ্যে স্বাতির মায়ের জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, চক্ষু হয়ে ওঠে সজল।

[বাইশ]

শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি ; বৎসর প্রায় পূর্ণ হয়ে এল।

কদিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলেছে। প্রবল বন্যায় কূল ছাপিয়ে উঠে পড়েছে নদী। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ।

বিকেলবেলা, তবে চেহারাটা হয়েছে যেন সন্ধ্যার মতো। বাড়ির পেছনে একটা ছোট আগাছার ঝোঁপে একটা ঝিঁঝি অবিরত ডেকে যাচ্ছে।

বারান্দা থেকে দূরে নদীর খানিকটা দেখা যায়। একটা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে সেই দিকে চেয়ে বসেছিল প্রশান্ত। বৃষ্টিটা একটু নরম হয়ে এসেছে, তা ভিন্ন হাওয়া উল্ট দিকে, ছাটটা বারান্দায় ঢুকছে না। মাত্র একটু আগে এসে বসল। হাতে একটা চুরুট।

এলোমেলো চিন্তা এসে জুঠেছে মনে একটার সংস্পর্শে আর

একটা।……মা এসেছিলেন হঠাৎ। হঠাৎই মনে হোল, কিন্তু মা এসেছিলেন স্বাতিকে দেখে যেতে। ওখানে গিয়ে দেখেছেন, এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে দেখেছেন। এক-আধদিন নয়, দিন দশেক ছিলেন, তার সব কটাই এইভাবেই কেটেছে, অবশ্য বেশিভাগই এইখানে আনিয়ে।……মা যেন দোটানার মধ্যে প'ড়ে গেছেন মনে হোল। এও এমন একটা ট্রাজেডী—এই অকাল-সন্ধ্যার সুরের সঙ্গে এমন মিলে গেছে যে, মনটাকে ঝিমিয়ে দিচ্ছে। দোটানার অর্থ—স্বাতি তাঁর মনটা একেবারেই দখল করে নিয়েছে বেশ বোঝা যায়; সে তো নেবেই, স্বাতিব মতো একটা মেয়ে। কিন্তু অন্য একটা টানও আছে, খুব ক্ষীণ, খুব প্রচ্ছন্ন হলেও যেন ধরা যায়। কথাটা হচ্ছে, প্রশান্তর বিবাহে মার মস্তবড় একটা আশা ছিল মনে। স্বাভাবিকই তো খুব, বাবা হঠাৎ অমন করে মারা গেলেন। প্রশান্তকে নিয়েই সামলে উঠেছে সংসারটা। আর, এমন একটা ছেলে বিবাহের বাজারে! দোষ দেয় না প্রশান্ত। যাওয়ার সময় অবশ্য জোর ক'রে বলে গেলেন তিনি আশ্বিন পেরিয়ে কার্তিকের পর আর ঘর খালি থাকতে দেবেন না, তবু…অযথাই একটা বিষণ্ণতা ছেয়ে গেল মনে, যা হয়তো এই অকাল-সন্ধ্যা আর ঝিল্লীরবের সৃষ্টি-মাত্র।

মা থেকে মনটা বিশাখার ওপর গিয়ে পড়ল। সত্যি নাও হতে পারে, তবু এখানেও যেন কোথায় একটা কান্না লেগে রয়েছে—এই একটানা ঝিঁঝিঁর সুরের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা মিল আছে। বিশাখাই চিঠি দিয়ে আনিয়েছে মাকে। বিশাখা স্বাতি আর প্রশান্তর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতভাবে পারছে দুজনকে কাছাকাছি আনবার প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অথচ কোথায় যেন কিছু একটা আছেই এই চেষ্টার মধ্যে যা হাসির সঙ্গে চোখের জলের মতো করুণ। কবে একটা বাংলা নভেল পড়েছিল—তাতে একটা মেয়ে নিজের দয়িতকে অন্য একটা মেয়ের হাতে তুলে দিল। বড় মর্মন্তুদ ব্যাপারটা। অবস্থাচক্রে প'ড়ে বঞ্চিত হওয়া এক, আর নিজের হাতে হাসিমুখে তুলে দেওয়া এক। বড় জটিল ব্যাপার। ইন্‌জিনীয়ার

মানুষ, বুঝত না এসব, বোঝেও না এখনও অত। হয়তো কিছুই নয়ও, বইটা পড়েছিল বলেই মনে হচ্ছে এরকম।

হয়তো বা সত্যিই কিছু গেছে থেকে। একটা জিনিসের এক সময় যেন আঁচ পেয়েছিল একটু প্রশান্ত। তাকে নিয়ে রজত যেন কিছু এ-বিষয়ে আশা পোষণ করত। ভাইয়ের সেই আশা বোনের মনে কি সংক্রামিত হয়নি? তার রেশ মনের কোথাও কি আটকে নেই? ·····চাপা মেয়েদের বোঝা আরও শক্ত।

বড় শক্ত এসব। বড় করুণ। ভাবতে চায় না প্রশান্ত। কিন্তু কি আছে আজকের এই স্তিমিত বর্ষার মধ্যে, এই অকাল-সন্ধ্যার নিঃসঙ্গতায়—সরাতেও পারছে না চিন্তাগুলো।·······রেডিও শুনছিল, বন্ধ করে দিয়ে এসে বসেছে। একটা কীর্তন, মাথুর। সখী বিশাখার শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূতালি। গঞ্জনা, ভর্ৎসনা, ধিক্কার; রাধার কি অবস্থা করেছে সে—নিষ্ঠুর শ্যাম!······ঐ থেকেই বোধহয়—শুধু নাম-সাদৃশ্যেই বিশাখার কথাটা এত বেশি করে মনে পড়ছে আজ······ রাধার সখী কি শুধু রাধার হয়ে দূতালিই ক'রে গেল চিরদিন? মাঝখানে আর কিছু নয়? সম্ভব কি ছিল সেটা?

দিন চারেক আগেও আর একটা ছোট্ট ঘটনা। তখন মা ছিলেন, আসার সুবিধা ছিল বিশাখার, প্রায়ই আসত। হঠাৎ বৃষ্টির একটু ধরন পেয়ে এসে উপস্থিত সেদিন।

"চলুন, স্বাতিদিকে নিয়ে আসি প্রশান্তদা।"

"হঠাৎ!"—বিস্মিত হয়ে চাইল প্রশান্ত।

"বড় একলা একলা বোধ হচ্ছে। না হয় ওখানেই যাই চলুন। তাও না হয়, এ পোড়া বিষ্টিটা থামিয়ে দিন কোন রকমে। ইন্‌জিনিয়ার মানুষ তো; কত কি তো করছেন আপনারা।"

গাড়িতে উঠে বলল—"না, আমায় নামিয়েই দিয়ে যান বরং।"

"কেন?" আবার বিস্মিত প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"কেন······তা·······"—একটু টেনে বলল বিশাখা। "মা একলা রয়েছেন তো। দাদাও হাসপাতলে।"

কী সব রহস্যময় যেন। ওকে এসব নিয়ে কখনও যে মাথা ঘামাতে হবে তা ভাবতে পারেনি।

আরও একটা কথা—ওর মনও কি একেবারে মুক্ত ছিল? কখনই কোন রেখাপাত করতে পারেনি কি বিশাখা?……এখন অবশ্য সবটুকুই স্বাতি।

স্বাতিতে এসে মনটা একটা যেন আশ্রয় পেল। একটা স্বস্তি, তাই থেকেই ওভারসিয়ারের ভাই বিমানও এসে পড়ল—যে সেদিন পুলের দিকে তাদের নৈশ অভিযানের সাথী হয়েছিল; যাকে টেনে বিশাখাকে সেদিন অত কথা বলল স্বাতি। এও তো হতে পারে—দুই সখীতে একত্র হলে বিমানের কথা ওঠে বলেই স্বাতির কাছে যেতে চেয়েছিল বিশাখা, যেমন প্রশান্তর কথাও হয় নিশ্চয়। প্রশান্ত মনে মনে বলে—তাই হোক; হে ভগবান তাই যেন হয়।

অনাথ এসে উপস্থিত হোল।

অনাথ এল, স্বাতি যখন পূর্ণভাবে মনটা দখল ক'রে ফেলেছে। অবশেষ তো কিছু রাখেও না স্বাতি। কোথাও একটু সংশয় থাকে না। একটা বেদনা থাকে, কিন্তু সে এমনি এক বেদনা, যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে তার মধ্যে।

আজ আবার যেন আরও পরিপূর্ণ করে আনছিল; এই ভরা বর্ষা, ভরা নদী, চারিদিকে বর্ষাপুষ্ট গাছপালায় ভরা সবুজের মতোই। একটা বেদনাও আছে বৈকি, শূন্য ঘরের বেদনা, কিন্তু তাও এত মিষ্ট! তার মধ্যেই ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল প্রশান্ত, হঠাৎ হালকা বৃষ্টির শব্দর ওপরে একটা পতপত আওয়াজ শুনে রাস্তার দিকে চাইতে দেখল, মাথায় একটা বড় টোকা দিয়ে অনাথ আসছে। হাতে রেশন-ব্যাগটা।

"তুমি যে হঠাৎ, অনাথ? আজ তো হাটবারও নয়।……খবর ভালো তো?"

অনাথ রেশন-ব্যাগটা দেয়াল ঘেঁষে রেখে টোকাটা ঝেড়ে তার ওপর ঠেস দিয়ে রাখল। একটু তফাতে হাঁটু মুড়ে দুটা হাত একত্র

ক'রে বসতে বসতে বলল—"খবর ভালো।......মা-মণি বললে—একবার দেখে আসবে না অনাথকাকা ?"

কথাটা প্রায়ই বলে। কেমন একটু বেসুরা লাগে কানে, তাই একদিন একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল স্বাতিকে প্রশান্ত। স্বাতি প্রায় শিউরে গিয়ে দিব্যি গেলে ব'লে উঠেছিল—"মাইরি বলছি বলিনি আমি! আমার কি গরজ!"

—সঙ্গে সঙ্গে নিজের অদ্ভুত মন্তব্যেই বিপর্যস্ত হয়ে বলেছিল—"কী পাগল বলুন তো অনাথকাকা!"

পরে একটু হাসিও উঠেছিল। কিন্তু বারণ করে দেওয়াও হয়নি, কোথা থেকে যেন একটা কুণ্ঠা এসে পড়ে। এখন আর অনাথের ও-কথাটা ধরে না প্রশান্ত।

তবু আজ ভাবটা অন্যদিনের চেয়ে যেন একটু আলাদা। উঁকি মেরে ঘরের ভেতর দিকে বার দুই দেখল। বার দুই টোকাটার দিকেও। কি বলবে প্রশান্তও যেন বুঝে উঠতে পারছে না। পরে একটা কিছু বলবার জন্যেই যেন প্রশ্ন করল—"একটু চা দেবে? দিকই না, কি বল?"

"চাটুজ্জ্যে মশাই আছেন নাকি?"—এমন ভাবে প্রশ্নটা করল একটু চকিত হয়ে যে এটাও বেশ খাপছাড়াই মনে হোল প্রশান্তর। অনেকটা যেন না থাকলেই ছিল ভালো। প্রশান্ত হেঁকে চাটুজ্জ্যেকে দু'কাপ চা করে দিতে বলে দিল।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু যেতে চাইছে না। এই সময় বাতাসটা হঠাৎ পাক খেয়ে ভেতরের দিকে ঘুরে পড়ায় টাটকা ফুলের গন্ধে ছেয়ে গেল সমস্ত বারান্দাটা। গন্ধটা ছিলই একটু একটু, অনাথের সঙ্গে এসেছে, তবে অন্যমনস্ক থাকায় অতটা খেয়াল হয়নি। একটা বলবার কথা পেয়েই যেন প্রশ্নটা করল প্রশান্ত—"থলেয় ফুল নাকি অনাথ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—একটু নড়েচড়ে বসল অনাথ।

"জুঁইয়ের গন্ধ মনে হচ্ছে। নিয়ে এলে, না হাসপাতালের বাগান থেকে নিয়ে যাচ্ছ?"

অনাথ কিছু উত্তর না দিয়ে উঠল। একবার বাড়ির ভেতরের দিকে সেইভাবে চেয়ে নিয়ে টোকাটা সরিয়ে ব্যাগটা নিয়ে এল, তারপর তাই থেকে একটি মাঝারি গোছের জুঁইফুলের গোড়ে বের করে তুলে ধরল, মুখে একটু একটু হাসি, একটু গর্বের ভাব মনে হয় যেন সঙ্কোচও তার সঙ্গে।

"বাঃ, চমৎকার মালাটি তো! ·····"

—মালার প্রশংসাতেই কণ্ঠস্বরটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে একটু খাদে নেমে পড়ল; আমতা আমতা করেই প্রশান্ত বলল —"কে গাঁথল?—মানে তুমি এমন সুন্দর মালা গাঁথতে না, কিনলে?······"

"কিনব! কলকাতা শহর কিনা!"—চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অনাথের······আর এ-মালা অনাথ আবাগেরব্যাটার কাঠখোট্টা হাত দে বেরুবে!"

"তবে! ·····" কি যেন শুনতে হবে সেই ভয়ে গা'টা সিরসির করে আসছে।

অনাথ শুরু করেছিল—"মা-মণি ভেন্ন এমন মালা ·····"

"পাঠিয়ে দিলেন এখানে!·········আমায়! ·····"

—কথাগুলা মুখ দিয়ে বের করতেও যেন মাথা কাটা যাচ্ছে প্রশান্তর। এ কী ক'রে বসল স্বাতি হঠাৎ! শরীরটা ঝিমঝিম করে আসছে। সম্ভব হয় কি ক'রে? স্বাতি—এত শিক্ষিতা, সবচেয়ে বড় কথা, এত যার সূক্ষ্ম মাত্রা-বোধ, সে হঠাৎ কি করে এমন একটা বিসদৃশ কাণ্ড ঘটিয়ে বসল! হাত বাড়িয়ে নেবে কি ক'রে? না নিলে অনাথের কাছেও যে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা ·····

চাটুজ্যে চা নিয়ে এল। আরও যেন মাথা কাটা গেল। হাতে করে চা নিতে মালা নেওয়া না-নেওয়ার প্রশ্ন বন্ধ থেকে গুছিয়ে ভাববার একটু সময় পেয়েছে, অনাথ মালাটা একটু তুলে ধরে চাটুজ্জ্যেকেই প্রশ্ন করল এবার—"কেমন হয়েছে গো চাটুজ্জ্যেমশাই?"

কি বলবে ধাঁধায় পড়ে কোনরকমে "ভালোই তো, তুমি চা

খেয়ে লাও” বলে চাটুজ্জ্যে সরে পড়বে, অনাথ বলল—“ছ্যাবতার জন্যে পাঠ্যে দিলে মা-মণি।”

একটা অসহ্য অবস্থা যাচ্ছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাটুজ্জ্যের কুণ্ঠিত দৃষ্টিটা মনিবের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। কোনরকমে আর একবার “তা মন্দ কি?”—বলে তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়েছে, প্রশান্ত এ-প্রসঙ্গটা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই বলল—“তা বেশ, রেখে দাও ঘরে।”

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে অনাথ প্রশ্ন করল—“পরিয়ে দেবেন না ছ্যাবতাকে?”

“দেবতা!”—‘দেবতা’ সে নিজে নয় জেনে আশ্বস্ত হ’লেও বিস্মিত-ভাবেই প্রশ্ন করল প্রশান্ত। “দেবতা কোথায় এখানে?”

কোমর পর্যন্ত বেঁকিয়ে ভেতরের দিকে চাইল অনাথ, বলল—“উই যে ঘরে বিরাজ করচেন।”

যতটা পারল সমাহ করেই বলল—“আলো করে রয়েছেন ঘর।”

তবু আবিষ্কার করতে না পেরে বিস্মিতভাবেই ওর নির্দেশ লক্ষ্য করে প্রশান্ত বলল—“কৈ দেখাও তো। এসো।”

বারান্দার শেষে বৈঠকখানা; তার ওদিকে একটা ছোট ঘর। কৌচ-চেয়ার-টেবিল ঘুরে প্রশান্তর পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে হতে অনাথ বলে যাচ্ছে—“সেখেনকার মতন এখেনেও ছ্যাবতা রয়েছেন জেনে—চাটুজ্জ্যেমশাই আমায় সিদিন বললে কিনা—তাই মা-মণি কদ্দিন থেকে বলছে—মালা করে দোব অনাথকাকা, নে’ যেও। তা ফুরসতও ছেল না—আর মনের মতন মালা গাঁথবে তার ফুলও তো ছেল না……সেই যে চাটুজ্জ্যেমশাই বললেন না সিদিনকে?… অবিশ্যি শিবঠাকুরও নয়, কেষ্ঠঠাকুরও নয়, আমাদের ছ্যাবতার মতনই—তবু তো……”

মখমল-ঢাকা সেলাইয়ের কলটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল হাতজোড় করে মাথাটা হেঁট ক’রে।

চাটুজ্জ্যে দেরি দেখে নিজেই কাচের গেলাসে করে চা নিয়ে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর পা টিপে পিছু হাঁটতে-

হাঁটতে সরেও পড়ল। পেটের হাসি চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়েছে, তবু কি মনে হোল প্রশান্তর, ঢাকনাটা আর খুলল না। অনাথকে বলল—"তা রেখে দাও মালাটা ওর ওপরই।....চা'টা খেয়ে এসো তাড়াতাড়ি, তোমাদের ওখানেই যাব একবার।"

বারান্দায় ফিরে গিয়ে দুলে দুলে হাসল এক চোট। একটা কুটীল সমস্যা মিটে গিয়ে, হাসিটা যেন আরও তোড়ে বেরুতে চাইছে।......আর, এ-হাসির সাথীও চাই একজন।

[তেইশ]

এ-হাসির সাথী স্বাতির চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ হতেও পারে না। মালা দেখেই প্রশান্তর কি আশা হয়েছিল সে-কথা তাকে বলতে হবে তো—হাসিচ্ছলেই, আশঙ্কার কথাটা বাদ দিয়েই। আজকাল দুজনের সঙ্গে সম্বন্ধ ধ'রে ওদের আলাপ প্রায় এই পর্যন্ত এগিয়ে আসে, মালাবিভ্রাটের সুযোগে আর একটু এগুক না।

তারপর......আর একটা কথা মনে পড়ে গেল প্রশান্তর—মস্তবড় একটা সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় এই সুযোগে। সেলাইয়ের কলটা স্বাতির জন্যই কেনা, কিন্তু দিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছিল না, এইবার একটা রাস্তা হোল। বেশ একটি কৌতুক-অভিনয়ও হবে যার মধ্যে লাহিড়ীমশাইও যদি একটু এসে পড়েন তো এমন কিছু দোষের হবে না।

গোড়া থেকেই আরম্ভ করে দিল সেটা। অনাথকে বলল—"তোমার মালা দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল অনাথ। দেবতা এক রয়েছেন, অথচ তাঁর একটু সেবা হয় না। না থাকে দুটো ফুল, না দেওয়া হয় একটু ধূপ-ধুনো। মালার কথা ছেড়েই দাও, আজ তুমি এনে একটা দিলে, তাই, তাও দেখ না কতদিন থেকে আনব-আনব করে—আর সত্যি রোজ নিয়ে আসা তো সম্ভবও নয়—ফল

এই দাঁড়িয়েছে, নিজের ঠাকুর নিজেই ভুলে বসে আছি, সে তো দেখলেই !"

মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলও নিজের মূঢ়তায়। অনাথ বলল—"তাই তো ভেবে সারা হচ্ছি—ঘরের দ্যাবতাকে চিনিয়ে দিতে হবে এ কেমন…"

"…… নাস্তিকের বাড়ি !" —ওর কথাটা এইভাবে পূর্ণ করে দিয়ে, ওকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে এগিয়েই চলল—"তাই আমি ঠিক করলাম তোমাদের ওখানেই রেখে আসি না হয় ঠাকুরকে ; আদর-যত্ন খাবেন, সুখে থাকবেন।"

অন্যদিক দিয়েও ভাল হোল। চাটুজ্যের কাছেও মালার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেলে সে এসে চৌকাঠের একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে কৌতুকটা উপভোগ করছিল, প্রশান্ত তাকেই ঠাকুরকে তুলে দিতে বলল জীপে—কি করে সাবধানে তুলতে হয় অনাথকেও দেখিয়ে দিতে বলল। চাটুজ্যে অনেক কষ্টে হাসি চেপে কলটা নিয়ে গিয়ে জীপে বসিয়ে দিল। অনাথকে পাশে বসে ধরে থাকতে বলে, গাড়িটা গ্যারাজ থেকে বের করে স্বাতিদের বাড়ির দিকে চলল প্রশান্ত। মনটা খুব প্রফুল্ল। বৃষ্টিটা আরও ধরে এসেছে, কয়েকদিনের পরে আজ এই প্রথম। মেঘে ফাটলও ধরেছে জায়গায় জায়গায়। কৌতুক-অভিনয়ের দ্বিতীয় দৃশ্যটা কি দাঁড়াবে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। খুব আস্তে আস্তে ড্রাইভ করছে, মাঝে মাঝে অনাথকে তাগিদ দিচ্ছে, বেশ যেন সাবধানে ধরে থাকে। ঘুরে দেখছেও মাঝে মাঝে। দেবতা গড়িয়ে পড়লেই তো সব পণ্ড।

লাহিড়ীমশাই বাইরের বারান্দায় একরাশ বইখাতার মধ্যে বসে ছিলেন। প্রশান্ত আসতে আসতেই দেখল তিনজন লোক ছাতা মাথায় দিয়ে বাবলার দিকে যাচ্ছে, খানিকটা দূরে। নিশ্চয় স্কুলসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই ওদের সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল। প্রশান্তকে দেখে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—"এসো, এসো প্রশান্ত। বাঁচালে। কী একলাই যে পড়ে গেছি—মানে এই বৃষ্টির জন্যে আর

কি—তিনদিন স্কুলেও যাইনি—রেনি ডে (Rainy day) দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে—বাপে-বেটিতে পুরানো বইগুলো টেনে টেনে···এসো, বসো··· ওটা কি মালা জড়ানো ?”

যেটা মহলা দিতে দিতে আসছিল এতক্ষণ, কুণ্ঠাবশে গলায় গেল আটকে। ফাঁক পেয়ে অনাথই আরম্ভ করে দিল—

“দ্যাবতা······”

“দেবতা !” —বিস্মিতভাবে প্রশান্তর মুখের দিকে চাইলেন লাহিড়ীমশাই। একটু রহস্যের মধ্যে দিয়ে অনাথের গল্পটাই বিবৃত করবার ইচ্ছা ছিল প্রশান্তর, তারপর হাসিচ্ছলে বলত ওরা খুড়ো-ভাইঝিতে যখন দেবতা বলেই চিনেছে, ওদের হেফাজতেই রেখে যাবে ঠিক করেছে। কিন্তু কিছুই মুখ দিয়ে বেরুল না, উনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইতে ওর দৃষ্টিটা বর্ধিত কুণ্ঠায় আরও নতই হয়ে গেল।

অনাথ বলে চলল—“অবিশ্যি শিবঠাকুরও নয়, কেষ্টও নয়, আমাদের দ্যাবতার মতনই দ্যাবতা। তা তবু তো হেনস্তা হতে দেওয়া চলে না—অথচ দেখলুম, হচ্ছে—চাকরবাকর নিয়ে সংসার—ওনারও সময় নেই······তাই বললুম······”

বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, একটু যেন রাগের ভাবই—ভালো হোক মন্দ হোক, দেবতাকে ঠাইনাড়া করার দায়িত্বটা নিজের ঘাড়েই নিতে চায়। প্রশান্ত লজ্জিতভাবেই বলল—“নামাও।”

বারান্দায় উঠে এলেও মাথায় করেই দাঁড়িয়েছিল অনাথ, খুব সন্তর্পণে নামিয়ে মাদুরের ওপর রাখল। অজান্তে যদি কিছু অপরাধ হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে মখমলের ওপর একবার হাতটা চেপে কপালে ঠ্যাকাল। প্রশান্ত কুণ্ঠিত হাসিটা ঠোঁটে নিয়ে মখমলটা তুলে নিল, রহস্যটা যাতে আর এক মুহূর্তও না থাকে সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভও করে দিল, লজ্জিতভাবে মাথাটা হেঁট করেই—“.কাম্পানীর এজেন্ট এসে গছিয়ে দিয়ে গেল একটা—জানেনই তো কি রকম নাছোড়বান্দা ওরা—মাসে মাসে কিছু করে দিয়ে যেতে হবে—মনে করলাম স্বাতিদেবীর দরকারে লাগতে পারে—একলা থাকেন····”

—কে মাসে মাসে শোধ দিয়ে যাবে মূল্যটা সেটা উহ্য রইল। গ্রহণ করেছেন লাহিড়ীমশাই কন্থার হয়ে, মুখের প্রসন্নভাবটি আরও ভালো করে ফুটে উঠেছে। বললেন—"একলা ? একলা থাকবার পাত্রী কিনা সে ! একটু বৃষ্টি ধরেছে, আর গাঁয়ে ঢুকে পড়েছে বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিতে। ·· তা নিয়েছ তো নিয়েছ, কিন্তু একটা খরচের রাস্তা খুলে দিলে যে—আর গাঁয়ে ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি কেউ কি খালি গায়ে থাকতে পাবে ?"

"সে খরচ জোগাবে ঐ চাটুজ্যে ! তানার ঘাড় যোগাবে !"

—অনাথ। দুজনেই চোখ তুলে চাইতে গোঁফ দুটো ফুলিয়ে হন-হন করে ভেতরে চলে গেল। লাহিড়ীমশাই হেঁকে বললেন—"ওরে তোর মা-মণিকে ডেকে আন। বৃষ্টিটা ধরেছে, আমি ভাবছি একটু বেড়িয়ে আসব।

চাটুজ্যের ওপর রাগের সূত্র ধরেই সেলাইকল-দেবতার সমস্ত কাহিনীটা বলে গেল প্রশান্ত, পূর্বাপর মিলিয়ে সেই যে এ-অনর্থের মূলে এটা তো বেশ টের পাওয়া যায়। শেষ হলে বলল—"আপনি যদি একটু ঘুরে আসতে চান তো আমার মনে হয় বেরিয়ে পড়াই ভাল, কখন্ আবার বৃষ্টিটা এসে পড়বে। তা ভিন্ন বেলাও পড়ে আসছে।"

—উনি যে সুযোগটা করে দিচ্ছেন সেটাকে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নেওয়া আর কি।

"মন্দ বলনি। তাহলে হয়েই আসি, কি বলো ?"—উঠতে উঠতেই কথাগুলা বলে লাহিড়ীমশাই ভেতরে চলে গেলেন। কামিজ গায়ে দিয়ে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন—"এতক্ষণ একলাই থাকবে ?"

প্রশান্ত বলল—"কতটুকুই বা ? আমি ততক্ষণ বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি ; পড়া তো হোল না জীবনে।"

"বললাম ক'বার, শিখে নাও। সংস্কৃত হ'ল সব বিদ্যার খনি, ওর ভেতরে কী সম্পদ যে লুকনো আছে !"

"সম্পদলাভের কপালও হওয়া চাই তো।"—হেসে বলল প্রশান্ত।

"বিনা মেহনতেই পাবে ?"—হেসেই জবাবটা দিয়ে, "ঘুরে আসি আমি তাহলে"—ব'লে নেমে গেলেন লাহিড়ীমশাই।

জীবনের সন্ধিক্ষণে এক এক সময় এক একটা কথা অদ্ভুত অর্থ নিয়ে এসে পড়ে। মনে হয় জীবন-নিয়ামক কোন্ এক অদৃশ্য দেবতা উৎকট শ্লেষ হানল একজনকে নিমিত্ত করে।....মেহনতও করতে হোল না প্রশান্তকে সম্পদলাভের জন্য।

একখানা বেশ মোটা সংস্কৃত বই সামনে পড়েছিল। লম্বা-চওড়া, মোটা পিজ্-বোর্ডের মলাট দিয়ে ভালো করে বাঁধানো। এদিকে কিনারায় কাগজের রংটা দেখে মনে হয় খুব পুরানো, কয়েক জায়গায় ক্ষয়েও গেছে। অলস কৌতূহলেই পাতা ওলটাতে গিয়ে এক জায়গায় আপনিই খুলে গেল বইটা; সেকালের একটা ছোট আকারের পোষ্ট কার্ড বুক-মার্ক হিসাবে খানিকটা বের করে গোঁজা আছে। ঠিকানার দিকটাই সামনে পড়ল। লেখা রয়েছে—দারুকেশ্বর লাহিড়ী, তার নীচে গ্রাম, পোষ্টাফিস, জেলা। নামের ওপরেই দৃষ্টিটা আটকে রইল অনেকক্ষণ, প্রথমটা শুধু এই হিসাবেই যে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হোল লাহিড়ীমশাইয়ের নামটা। তারপর একসময় হঠাৎ সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন তড়িৎ-প্রবাহ খেলে গিয়ে মনে হোল মাথার চুলগুলা পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। দারুকেশ্বর প্রশান্তর বাবারও নাম।

এও মুহূর্ত কয়েকের জন্যই। আবার শান্ত হয়ে এল মনটা, অবশ্য আপনি-আপনিই নয়, চেষ্টা করতে হোল। দুটো নাম এক হয়েছে তো কি হয়েছে ? নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার, এর দ্বারা তো কিছুই প্রমাণ হয় না। দৃষ্টিটা ঠিকানার ওপর গিয়ে পড়তে আর একটু শান্ত হয়ে এল মনটা। না, ওদের জেলা নয়, এ গ্রাম, এ পোষ্টাফিসের নামও শোনেনি কখনও প্রশান্ত। বাবার বন্ধু, একেবারে স্যাঙাৎ—তা হলে শুনত না ? এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ যে ছিলেন জীবনে তাও তো শোনেনি।........কি লেখা আছে চিঠিটায় না হয় দেখবে ?

উৎকট কৌতূহলের ঝোঁকে প্রায় উলটেই ফেলেছিল চিঠিটা,

শিক্ষা-সংস্কার বাঁচাল ওকে—এ-কাজ কখনও করেনি, আর, করবে তা একেবারে লাহিড়ীমশাইয়েরই বেলায়! স্বাতির বাবা!

বইটা বেশ শব্দ করেই বন্ধ করে দিল তাড়াতাড়ি, পোষ্ট কার্ডটা ভেতরে ঠেলে প্রায় লুপ্ত করে দিল বইয়ের মধ্যে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন কুলুপের মধ্যে বন্ধ করে একেবারে ঘুরিয়ে নিল মনটা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসা তাইতে।·····কখন্ আসবে স্বাতি? তাকে যে দিতে হবে কলটা—লাহিড়ীমশাইয়ের ফিরে আসবার আগেই দিতে না পারলে দেওয়ার মাধুর্যের অনেকখানিই যে বাদ পড়ে যাবে।···· জুঁই ফুলের গন্ধটা যেন একটা সাড়া জাগিয়ে নাকে এসে ঢুকল হঠাৎ। সামনেই রয়েছে, অথচ এতক্ষণ যেন তার সব গন্ধ গুটিয়ে নিয়ে পড়ে ছিল।·······দেবে কোথায়? এটা যে বড্ড বিরস পরিবেশ। উপহার দেওয়ার নাকি যোগ্য স্থান? অনাথ আসুক, বাগানে নিয়ে যাবে। ······দেরি করেই আসবেন নিশ্চয় লাহিড়ীমশাই, সবই তো বুঝছেন। ·······কিন্তু এ কি?—বড্ড যে দেরি করছে স্বাতি! পাঁচখানা ঘর নিয়ে তো গ্রাম, করছে কি এতক্ষণ ধ'রে?

না হয় দেখবেই একবার চিঠিটা?

[চব্বিশ]

হটাৎ মনটা চিঠিতে ফিরে আসতে সমস্ত শরীরটা আবার যেন ঝনঝন করে উঠল। বাবা তার আত্মহত্যা করে মারা যান। কেন!

অসহ্য বোধ হচ্ছে। স্বাতির জন্য সে-অধৈর্যতা গিয়ে আর যেন এক মুহূর্ত টিকতে পারছে না এখানে। স্বাতি এসেই টের পেয়ে যাবে চিঠির কথা—চিন্তার বিশৃঙ্খলতায় মনে হচ্ছে যেন টের পেয়েই গেছে—টের পেয়েই গেছে সে। প্রশান্ত ওর বাবার স্যাঙাতের ছেলে—যাঁর জন্য ওরা এরকম সর্বস্বান্ত হোল।

বাড়িটা অরক্ষিত থাকবে। কিন্তু অত আর ভাবতে পারছে না।

তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে লিখল—একটা অত্যন্ত জরুরি কাজে হঠাৎ চলে যেতে হোল—গোপেশ্বর ডাকতে এসেছিল।

একটু নিরিবিলিতে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে হবে। আর পারছে না। কলটার কথা মনেও পড়ল না।

বাসায় গিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসল প্রশান্ত; বাবার আত্মহত্যার সূত্র ধ'রে, নিজেদের পারিবারিক জীবনের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগল। একটা কথা পূর্বে এমন-ভাবে চিন্তা করে দেখেনি, আজ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়ই জাগাচ্ছে মনে। ওদের পারিবারিক জীবনের একটা বড় অংশের সম্বন্ধে ও নিজেই বিশেষ কিছু জানে না।

গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরই বাবা ওকে তাঁর এক বন্ধুর হেফাজতে দক্ষিণ ভারতে সুদূর বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে যখন ও বি-এস-সির ছাত্র সে সময় পিতৃবন্ধু বদলি হয়ে যান। প্রশান্ত কিন্তু বাবার নির্দেশে সেখানে হোষ্টেলে থেকে বি-এস-সি পাস করে; তারপর সেইখানেই পাঁচ বছরের ইন্‌জিনিয়ারিং কোর্স শেষ করে। এরপর সেখান থেকেই বম্বে হয়ে বিলাতে চলে যায় পড়ার জন্য। বাঙ্গালোরের এই দীর্ঘ দশ বছরের প্রবাসের মধ্যে খুব বেশী আসেনি দেশে। বাঙ্গালোরের তুলনায় দেশ ভালোও লাগত না তেমন, মনের দিক দিয়ে যেন যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। বাবাও পড়ার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় অল্প কয়েকদিন পরেই ফেরত পাঠিয়ে দিতেন ওকে। ছোট সংসার ওদের—বাবা, মা, প্রশান্ত তাঁদের একমাত্র ছেলে, আর প্রশান্তর বোন উষা।

যখন গেল বাঙ্গালোরে, বাবা তখন কলকাতায় থেকে একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করেন, শনিবারে শনিবারে আসেন বাড়ি, গ্রামের আর সব কলকাতার চাকুরেদের মত; প্রশান্ত যায় একরকম পিতৃবন্ধুর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করেই। উনি বাঙ্গালোর ছেড়ে চলে

যাওয়ার একটু আগে থেকেই প্রশান্তদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম একবার এসে কলকাতাতেই উঠল; ওরা গ্রাম ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গেছে। ভাড়া বাড়ি। দ্বিতীয়বার প্রায় বছর দুই পরে এসে নিজেদের বাড়িতেই উঠল। মাঝারিগোছের নূতন ষ্টাইলে বেশ ভালো বাড়ি। তৃতীয়বার এসে দেখল, মোটর হয়েছে। প্রত্যক্ষ যোগ নেই, সুতরাং উন্নতির কারণটাও একটা সহজ অনাড়ম্বতার সঙ্গে পেয়ে যেতে লাগল—অফিসে ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে বাবার। যোগ্যের চিরকালই হয়ে আসছে, এই জ্ঞানই যথেষ্ট, কৌতূহল এটা ডিঙ্গিয়ে আর ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেনি কখনও। এর পরেই বিলাতে চলে গেল। বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, একমাত্র ছেলেকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—এটা তো প্রশান্তও আশা করে ব'সে ছিল।

আজ মনে হচ্ছে এই যে তাকে বরাবরই বাইরে ঠেলে রাখা—এটা হচ্ছে যেন একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ীই। অবশ্য যদি মেনে নেওয়া যায় বাবাই ছিলেন লাহিড়ীমশাই-এর সেই বন্ধু। মনটাকে কে যেন ওদিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মন যেদিকে চলে, সেই-দিককার যুক্তিও প্রবল হয়ে ওঠে। দারুকেশ্বর নামটা খুবই একটা অসাধারণ নাম, খুবই অল্প শোনা যায়। দুটো দিক যেন বড় বেশি মিলে যাচ্ছে। মিলের ঝোঁকেই একটা কথা মনে হয়ে মনটা অনুশোচনায় ভরে গেল। শুধু সংস্কারের বশে মস্ত বড় একটা ভুল করে বসেছে। পোষ্টকার্ডের ঠিকানাটা টাইপ করা ছিল, নাই পড়ুক সেভাবে, উল্টে দেখলে হাতের লেখাটাও দেখতে পাওয়া যেত, বোঝা যেতো বাবার কি অন্য কারুর। আর কোন উপায় নেই। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে প্রশান্তর। এমন অবস্থাতেও অনুশাসন মেনে চলার এত বাড়াবাড়ি! বাবার সম্বন্ধে এই রকম কুটিল সন্দেহটাও তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারত!

এর সঙ্গে সঙ্গেই, এই পথ ধরেই একটা উজ্জ্বল আলোকরশ্মি এসে পড়ল মনে। এত সহজ, অথচ কোথায় যে ছিল এতক্ষণ।

অনাথ দেখেছে লাহিড়ীমশাই-এর বন্ধুকে। একবার নয়, অনেকবার, নানাভাবে। একেবারে নিঃসংশয়িত প্রমাণ।

প্রশান্ত উঠে সোজা হয়ে বসল, উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। দুটো হাতের আঙুলগুলোই চেয়ারের হাতলের ওপর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গলায় একটু অনাবশ্যক জোর দিয়েই প্রশান্ত হাঁকল—'ঠাকুর! গোপেশ্বর কোথায়? আছে গোপেশ্বর?'

গোপেশ্বরই ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, বলল—"ডাকছেন আমায়?"

"এখুনি গাড়িটা বের করে বেরিয়ে যা তাড়াতাড়ি, অনাথকে নিয়ে আয়।·······কোথায় চললি আবার! এই দ্যাখো!"

অনাথ একটা মস্ত বড় প্রমাণ নষ্ট করে যেন পালাবে কোথায়! গোপেশ্বর বলল—"কোটটা নিয়ে নিচ্ছি।"

—রেলের মনোগ্রাম বসানো খাকি কোট। আজকাল গোপেশ্বরেরও এদিকে খুব লক্ষ্য। একরকম মনিব-পত্নির বাড়িই তো, ঠাটটুকু বজায় রেখেই যাওয়া-আসা করতে চায়।

"আবার কোট!·······বেশ; যা শিগগীর।" অধৈর্যভাবে বলে উঠল প্রশান্ত।

একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার মুখে মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বারান্দাটায় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল প্রশান্ত। কিছুই যেন গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। তারপর আর এক ব্যাপার করে বসল। হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুলের কারখানায় ফোন করল—মালবাহী লরীটা যেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চাটুজ্যেকে ডেকে স্টোভ জ্বেলে কিছু পাউরুটি টোস্ট করে টিফিন-কেরিয়ারে দিয়ে দিতে বলল তাড়াতাড়ি; কিছু ফল থাকে তো, আর কিছু বিস্কুট।

জীপে করে শুধু অনাথই না, লাহিড়ীমশাইও এসেছেন, সঙ্গে স্বাতিও। চাটুজ্যে জানাল, প্রশান্ত সামনের গাড়িতেই কলকাতা চলে গেছে। না, কিছু বলে যায়নি।

হয় নিশ্চিত প্রমাণের সম্মুখীনই হতে পারল না প্রশান্ত, নয়তো এর চেয়েও যদি আরও সুনিশ্চিত প্রমাণ কিছু থাকে—একেবারেই অকাট্য, প্রত্যক্ষ, তো তারই সন্ধানে গেল চলে।

[পঁচিশ]

পাওয়া গেল প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

দেখল এত বড় একটা পারিবারিক রহস্য এতদিন ধ'রে যে অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে তার কাছে, তার কারণও থেকে গেছে।

মায়ের কাছে প্রশ্ন করে এই প্রথম জানল বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বাক্সয় একটা চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিটা বের করেও দিলেন তিনি। তার মধ্যে থেকেই এতদিন না জানবার কারণটাও টের পেল প্রশান্ত, যদিও মা তার ওপরও একটু দেরি করে ফেলেছেন।

মৃত্যুর কারণ বাবা কিছুই লিখে যাননি, শুধু তার মৃত্যুর পর কি অবস্থার মধ্যে কোন সময় কি করতে হবে তার একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তবে কিছু লেখা না থাকলেও ব্যবসায়ে অসাফল্যই যে মৃত্যুর কারণ এটা ভালো রকমই বোঝা যায়। লিখেছেন—বাজারে কিছু ঋণ আছে, তবে বাড়িটা স্ত্রী-ধন, এর দিকে কেউ হাত বাড়াতে পারবে না। না পারলেও প্রশান্ত কোন জায়গায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলেই ওরা এ বাড়ি বিক্রি ক'রে ওর চাকরির স্থলে চলে গিয়ে থাকবে, কিংবা উষার পড়ার অসুবিধা হ'লে কলকাতাতেই বাসা করে থাকবে; শেষের দিকে প্রশান্তর এক দূরসম্পর্কের মামা এসে ওদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরই অভিভাবকত্বে। বাজারে গুটিতিনেক জায়গায় ঋণের নাম করেছেন বাবা। বাড়ি বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে সেটা সেই তিন জায়গায় ভাগ করে দিতে বলেছেন। তার মধ্যে একজন সিনেমা অভিনেত্রী। প্রশান্ত চিনল, আগে ভালোই নামছিল, এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে; আর কিছুই শোনা

যায় না। দ্বিতীয় একজন বাঙালী ব্যবসায়ী, চিনল না প্রশান্ত, তবে ঠিকানা সব ক্ষেত্রেই দেওয়া আছে, বের করে নিতে পারবে। তৃতীয় যে লাহিড়ীমশায় তাতে আর সন্দেহ রইল না। পোস্টকার্ডের নাম-ঠিকানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

বিক্রয়লব্ধ টাকাটা কিভাবে ভাগ করতে হবে তারও একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অর্ধেকটা দেওয়া হবে লাহিড়ীমশাইকে অবশ্য তিনি কে, তাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে কিছুই লেখেননি। প্রশান্ত জিগ্যেস করে দেখল, তার মাও বিশেষ কিছু জানেন না। প্রশান্ত চেহারার বর্ণনা করতে অনেক মিলিয়ে বললেন, যেন বার দুই-তিন দেখেছেন বাড়িতে। অনাথের কথার সঙ্গে বেশ মিলে যায়, বাড়িতে বড়-একটা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন না লাহিড়ীমশাইয়ের স্যাঙাত।

অন্য দুজনের ঋণ সম্বন্ধে লেখা আছে, লাহিড়ীমশাইকে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা ঐ দুজনকে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া।

মা যে কেন এতদিন বলেননি তাও কতকটা টের পাওয়া গেল চিঠি থেকেই। শেষের দিকে নীচে দাগ কেটে লেখা আছে, প্রশান্ত বেশ ভালো ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাড়ি বেচার মতো অবস্থা না হ'লে তাকে যেন এ সম্বন্ধে কিছুই বলা না হয়। তেমনি, অবস্থা হলে যেন বিলম্বও না করা হয়।

কম্পিত হস্তে চিঠিটা পড়ে গেল প্রশান্ত ; সাঙ্গ হ'লে মাকে তার প্রথম কথাই হোল—'তবু দিন কতক আগে তুমি জানাতে পারতে মা।'

চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে কথাটা বলে মুখের দিকে চাইতে দেখল মা যেন এই তিরস্কারটুকু শোনবার ভয়ে একটুজড়োসড়োহ'য়েই ওর দিকে চেয়ে বসে আছেন। একটু চুপ করে থেকে অপ্রতিভভাবে মগ্নকণ্ঠেই বললেন,—'এইবার বলব ঠিক করেছিলাম বাবা।'

অনুশোচনায় মনটা ভরে গেল প্রশান্তর। মনের চঞ্চলতার জন্যেই, আর লাহিড়ীমশাইয়ের ইতিহাস জানে আর দুরবস্থাটা

প্রত্যক্ষ করে এসেছে বলেই কথাটা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝল বড় অন্যায় হয়ে গেছে। অনুশোচনার মধ্যে বুঝতে পারল এতদিন মনটা একটা দিক নিয়ে পড়ে থাকায় তার জীবনের আর একটা দিক, যেটা নিকটতর সেটা অলক্ষিতই থেকে গেছে। প্রায় দেড় বৎসর হোল সে বিদেশ থেকে ফিরেছে। আজ যেন এই প্রথম বুঝল ফিরেই মায়ের যে শোকার্ত মূর্তিটি দেখেছিল সেইটিই স্থায়ী হয়ে গেছে ওঁর জীবনে। বুঝলও, কেন। ছেলে একরকম গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েই দেশে ফিরলেও—সেখান থেকেই এক হিসাবে চাকরিটা পেয়ে এসেছে—এই চিঠিটা, এই রহস্যটা ওঁকে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ করে করে এসেছে এতদিন। কেন পুষে রাখা এই রহস্য তাও তো বুঝল ওঁর উত্তর থেকে। যেমন কণ্ঠস্বরে বলা, দৃষ্টিতে যে কারুণ্য নিয়ে, তাতে যেন আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠল সমস্তটুকু।

বাবা যে ও রকম নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে গেলেন, শুধু তো তাই নয়। একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেলেন। মা যদি প্রশান্তর এ রকম চাকরি পাওয়া যথেষ্ট পাওয়া না মনে করে থাকেন, যদি ছেলের বিবাহ দিয়ে পূর্বাবস্থা খানিকটা ফিরিয়ে আনবার স্বপ্ন দেখে থাকেন তো দোষ দেবে কি করে?

একেবারেই নিঃস্ব পিতার মেয়ে স্বাতির সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনায়, —সুনিশ্চিত সম্ভাবনাই বলা যায়— ওঁর সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তাই এবার বলবেন ঠিক করেছিলেন। দুটি কথায় মা যেন তাঁর সমস্ত আশা, সমস্ত নিরাশা, অধিকন্তু সমস্ত লজ্জা উজাড় করে বের করে দিলেন। লজ্জাটা যেন একটা অসংগত লোভের লজ্জা যা তাঁকে স্বামী আর সন্তান দুজনের কাছেই অপরাধী করে তুলছে।

শ্রাবণশেষের দীর্ঘ দিনটা যে কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল যেন বুঝতেই পারল না প্রশান্ত। ভালোয়-মন্দয় মেশানো এমন পরস্পর-বিরোধী চিন্তার সম্মুখীন আর কখনও হয়েছিল কিনা জীবনে, মনে পড়ে না।······স্বাতি চিরদিনের জন্য গেল জীবন থেকে। কি যে এক সমস্ত-জীবন-শূন্য-করা চিন্তা! কিন্তু কঠোর সত্য। বাবার

কলঙ্কিত জীবনের ছাপ মুখে নিয়ে ঐ সর্বস্বান্ত পরিবারের সামনে আর গিয়ে দাঁড়ানো যাবে না। আগের দিকে এর পাশেই আছে বাবার ঋণশোধের নির্দেশ। যা সর্বনাশ হোল লাহিড়ী-পরিবারের তাদের হতে তার তুলনায় কিছুই নয়; তবু যে অবস্থায় রয়েছেন ওঁরা বর্তমানে, সে-হিসাবে অনেকখানিই বৈকি, কম করে ধরলেও বাড়িটা থেকে কোন্-না হাজার পঞ্চাশেক পাওয়া যাবে? অর্ধেকটা লাহিড়ী-মশাইয়ের। স্বাতির বিয়ে দিয়ে—(উপযুক্ত হাতেই পড়বে স্বাতি এ রকম একটা স্বয়ং বিরোধী মর্ম-নিংড়ানো চিন্তাও রয়েছে) লাহিড়ী-মশাই ত নিজের বাকি জীবনটা সচ্ছলতার মধ্যেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। এর পাশে পাশেই এসে পড়ছে মায়ের মুখখানি!...... আজ এও একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠে মনটাকে স্বাতির সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাটাকে শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে—স্বাতির মায়ের সঙ্গে ওর নিজের মায়ের মিল। দুজনেই নিতান্ত নিরীহ, সংসারে স্বামীর ওপর নির্ভর ছাড়া কিছুই শেখেননি, তাঁদের স্বামীর আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেননি কখনও। যা পেয়েছেন—সুখ হোক, দুঃখ হোক, মাথা পেতে নিয়ে গেছেন। তাইতেই তাঁদের সর্বনাশও ডেকে এনেছেন, অবশ্য দুজনে দুভাবে।......আজ এত মর্মভেদী দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা, মুখখানি ধীরে ধীরে আবার দীপ্ত হয়ে উঠছে। এত দুঃখের মধ্যেও আনন্দ হয় বৈকি।......ওঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে; যে মূল্যই উনি চান তাঁর উপযুক্ত সন্তানের জন্য।... স্বাতির জন্য বেদনা কি তাঁর মনেও জাগবে?

ভালো চিন্তা করতে বেদনা এসে পড়ে; তেমনি বেদনাময় চিন্তার গায়েও তো ভালো চিন্তা এসে পড়ছে; কিন্তু এ কেমন ভালো যাকে মনের সমস্তটুকু দিয়ে গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

অস্থির হয়ে কাটাল দিনটা প্রশান্ত বাড়িতেই এ-ঘর, ও-ঘর, এ-বারান্দা—ও-বারান্দা করে। ওর জীবনের আর-একটা ট্রাজেডী, এখানে ওর বন্ধু নেই, কারুর কাছে গিয়ে বুকটা হালকা করবে, একটা পরামর্শ চাইবে সে উপায় নেই। সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে পড়ে

পার্কে খানিকটা বেড়াল। মনটা একটু শান্ত হয়ে এসেছে। রাত এগুলে পার্ক নিরিবিলি হয়ে আসতে একধারে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে দুদিনের যা অভিজ্ঞতা সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে লাগলো। করলও একটা ঠিক।

একটু রাত করে ফিরল। মা বেশ উদ্বিগ্নই ছিলেন, পোড়-খাওয়া মানুষই তো, ছেলের হঠাৎ ভাব-পরিবর্তনে তার দিনটাও অশান্তিতেই কেটেছে—অফিসের কাজেই দেরি হয়ে গেল বলে যতটা পারল নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করল। তারপর আহার সারা হয়ে গেলে তাকে আর মুকুন্দ-মামাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে আর সব কিছুই বাদ দিয়ে মাত্র দুটি কথা বললো। মা ওর বিবাহের সম্বন্ধ দেখুন, ধীরে-সুস্থে যেমন পছন্দ তাঁর, আর মুকুন্দ-মামাও বাড়িটার জন্যে খদ্দের দেখুন। এটা যত তাড়াতাড়ি পারেন।

আজকের দিনটির ছাপ রয়েছে দুটির ওপর, ভালোয়-মন্দয় পরস্পর-বিরোধী।

উষাকে একেবারে বাদ দিয়ে গেছে, বাইরে রেখে গেছে এ অশান্তির। এবারেও মাকে বলল, তাকে যেন কিছু জানানো না হয়। যথাসময়েই টের পাবে তো।

মা বললেন,—বিয়ের কথাটা বলতে দোষ কি ? খুশীই হবে তো।'

মুহূর্ত কয়েক চোখ তুলে ভাবল প্রশান্ত। বলল,—'থাক না এখন। কোথায় কি ঠিক নেই তো। হুজুগে পড়ে পড়া নষ্ট করবে।'

[ছাব্বিশ]

কলোনিতে ফিরে এসে কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। অবশ্য নিতান্ত যান্ত্রিকভাবেই, এদিক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই। নয়ত মনের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই। সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে খানিকটা রাত হয়ে গেলে।

পরিত্রাণ পেতে চায় প্রশ্ন থেকে। লাহিড়ীমশাই, স্বাতি; তাদের মনের অবস্থা যে কি যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারে। প্রশান্ত স্বয়ং না গেলেও তাঁরা যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারেন; যাচ্ছে না বলেই সম্ভাবনাটা আরও বেশি। চাটুজ্যের কাছে শুনল, দুদিন সে ছিল না, রোজ সকালে একবার ক'রে এসেছেন দুজনে। অনাথ রোজ বিকেলে এসেছে, রাত আটটার গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পরে খানিকটা অপেক্ষা করে তবে ফিরেছে। ওর অবস্থা আরও কাহিল। স্বাতি কাকা বলে, তাই গোড়ায় একদিন চাটুজ্যের কাছে দুঃখ করেছিল—সেলাইকল নিয়ে প্রশান্তের এভাবে ঠাট্টা করায়। নিজেকে বোধহয় খুড়শ্বশুরের পদবীতেই বসিয়ে থাকবে। এদিকে কিন্তু বার বারই চাটুজ্যেকে বলেছে, ইন্‌জিয়ারবাবুকে বলতে যে এ নিয়ে ওর কোন অভিমান নেই, ওরও নয়—লাহিড়ী-মশাই বা স্বাতিরও নয়। সবচেয়ে এড়িয়ে চলেছে বিশাখাকে প্রশান্ত। তাকেই বেশি ভয়, কেননা সে একেবারেই কাছে, যে কোন সময় এসে যেমন খুশি প্রশ্ন করতে পারে, তার নিজের দিক দিয়েও, আবার ওঁদের হয়েও। গোপেশ্বরকে বলা আছে ওকে সকাল সকাল জীপে করে দিয়ে আসবে, তারপর আবার গিয়ে সন্ধ্যার আগেই নিয়ে আসবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে—বিশাখা, অনাথ, স্বাতি কিংবা লাহিড়ীমশাই—যে কেউ হোক, বলবে বর্ষা প্রবলভাবে এসে পড়ায় কাজে কতকগুলো নূতন সমস্যা হঠাৎ দেখা দিয়েছে, সেগুলো সামলাতেই ও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, ডাইনে-বাঁয়ে দেখবার অবসর নেই। বলবে রোজই ওঁদের খোঁজ নেয় ওর কাছে। চাটুজ্যেকেও ওই কথাই বলে দিয়েছে।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। দুদিন সবাইকে এড়িয়ে থেকে তৃতীয় দিনে ধরা পড়ে গেল। ধরাও পড়ল এমন লোকের কাছেই যার সম্বন্ধে ওর কোন আশঙ্কা ছিল না। লোকটা রজত।

একটু কৌতূহল যে দেখিয়েছিল রজত, ও ফিরে আসার সঙ্গে

সঙ্গেই সেটা ঐ ছেঁদো কথা দিয়েই বেশ নিবৃত্ত করে দিয়েছিল প্রশান্ত ; বর্ষা নেমে পর্যন্ত রোগের প্রকোপ বেড়েছে আশপাশের গাঁয়ে ; দু'একটাতে কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারীর আকারে, রজতেরও ফুরসত নেই। জবাবদিহি দিয়েছে প্রশান্ত খুব স্বাভাবিকই, কৌতূহল আর নতুন করে উঁকি মারেনি মনে।

তৃতীয় দিন রাত ন'টার সময় যখন ওরই জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল তখনও কিছু ব'লে গেল না রজত। যখন ফিরে এল তখন সাড়ে এগারোটা। গ্যারাজে গাড়িটা তুলে দিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে প্রশান্তকে ঘুম থেকে ওঠাবেই ঠিক করেছে, ত্মাখে সে জেগেই ব'সে আছে বারান্দায়। বলল—"কি ব্যাপার, এত রাত পর্যন্ত জেগে যে!"

"এত আর কি? আজকালকার রাত।" প্রশান্ত উত্তর করল।

কিছু না বলে ভেতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এল রজত। পাশে বসে বলল—"ভালোই হোল, আমি তোমায় তুলতেই যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ হে, কি ব্যাপার বলো দিকিন?"

"কিসের কি ব্যাপার?"—একটু সতর্ক হয়েই ফিরে চাইল প্রশান্ত।

এসে পর্যন্ত একবারও ওঁদের ওখানে যাওনি।"

"দেখতেই তো পাচ্ছ কি রকম ব্যস্ত রয়েছি।"

একটু চুপ করে থেকে রজত বলল—"ত্মাখো আমি তোমার এই রাতদুপুরে ইজিচেয়ারে পা তুলে দিয়ে চুরুট টানাটাকেও কি রকম ব্যস্ত থাকার প্রমাণ বলে ধরে নিতে রাজি আছি, কিন্তু এমন মানুষও তো থাকতে পারে—অনেকখানি তোমারই সৃষ্টি—যে তোমার চরকির মতন ঘুরে বেড়ানোটাকেও কাজে ব্যস্ত থাকার প্রমাণ বলে মানবে না।"

"কে সে জানতে পারি?"—নির্লিপ্তকণ্ঠেই বলবার চেষ্টা করল প্রশান্ত, নির্লিপ্তভাবে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে।

"কে সে তা টের পেয়েছ, তবু না হয় বলছি।" —রজত বলল—"তার আগে গোড়ার কথাটাও বলে নিই একটু। আজ বিশাখা

আমায় ওখান থেকে এসে বলল—'দাদা তোমরা তো বেশ—গাছে তুলিয়ে মই কেড়ে নিতে পারো'···লক্ষ্য করেছ তো ওটারও বেশ মুখ ফুটেছে আজকাল · জিজ্ঞেস করলাম—'কার মই কেড়ে নিয়েছি বলছিস?—আমি তো মইয়ে তুলে স্বর্গেই পাঠাচ্ছি একটার পর একটাকে দেখছিস্।' বললে—'ঠাট্টা থাক্। স্বাতিদির কথা বলছি —'তোমার বন্ধু'—ভাষাটা লক্ষ্য ক'রে যেও প্রশান্ত "তোমার বন্ধু সেই যে সেলাইএর কল উপহার দিতে গেলেন—দেওয়াও হোল না, রেখে হঠাৎ খালি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন—তারপর একেবারে আর ওমুখো হননি। কাজ ছিল দু'দিন, বাইরে ছিলেন, তারপর এই তিনদিন ধরে তো এখানেই রয়েছেন—এতই কাজ একেবারে যে একটুখানি ফুরসত করে ব'লে আসতে পারলেন না—কি ব্যাপার, কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—ফিরে এসে কেনই বা এ-ভাব······"

"ভাবের কথাটা স্বাতি বলেছে? না বিশাখাই?—মুখ ফুটেছে সেটা তো আমিও দেখছি।"

"হয়তো বিশাখাই, কিংবা স্বাতির কাছেই শুনে বলেছে। কিন্তু কথাটা যে একেবারে স্বাতির মনের কথা এটা জানতে তো আমার বাকি নেই।"

"ব্যস্ত যে আছি বিশ্বাস করেনি তাহলে?"

"বিশ্বাস করবে বলে তুমি আশা কর? দেখো প্রশান্ত, তোমার যা বৃত্তি, যা কাজ, তাতে হৃদয় জিনিসটার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবার নয় স্বীকার করি। আমার সম্বন্ধ আরও কম, আমি আবার ওটাকে আর পাঁচটা জিনিসের মতন চেরাফাঁড়ার জিনিস বলেই জানি। কিন্তু তবু একথাটা সহজভাবেই বুঝতে পারি যে, স্বাতিদেবী তোমার এটাকে কাজের ব্যস্ততা বলে কোন জন্মেই বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

"হেতুটা জানতে পারি?"

"হেতু—স্বাতি তোমায় ভালোবাসেন।"

"আমিও তো বাসি তাকে।"

"তফাত আছে। তোমার অর্থাৎ বেটাছেলেদের ভালোবাসা হোল শখ, মেয়েদের ভালোবাসা তাদের বৃত্তি। ভালোবাসা যেখানে বৃত্তি, মনের একমাত্র সম্বল, উপজীবিকা, সেখানে তা খাঁটি। আর খাঁটি ভালোবাসা অসপত্ন—তার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে, যেখানে সে, সেখানে আর অন্য কিছু থাকতে পারে, কিংবা থাকলেও তাকে সরিয়ে প্রধান হয়ে থাকতে পারে। ভালোবাসা হচ্ছে—যাকে বলা যায়…"

প্রশান্ত মুখটা ঘুরিয়ে অল্প হাসতে থেমে গেল রজত। বলল—"বলবে কাব্যি করছি? বেশ থামলাম। কিন্তু আমি দেখে এলাম স্বাতিদেবী বিশ্বাস করেননি তোমার কাজে…"

"তুমি গিয়েছিলে?"—একটু বিস্মিত হয়ে চাইল প্রশান্ত।

"সেখান থেকেই আসছি। বিশাখা বলবার পর থেকে মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল। কিছুই তো জানতাম না এসব। রাগ ধরেছিল তোমার ওপর, ঠিক করলাম বলব তোমায়, কিন্তু ভেবে দেখলাম—চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন না ক'রে—পরের মনের ঝাল নিজের মনে নিয়ে বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে এমনভাবে যাইনি যাতে মনে হতে পারে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি তোমার হয়ে। ঐ পথেই গেছি—চারিদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে—ওঁদের সাবধান করে দেওয়ার জন্যে যেন নেমে পড়লাম। 'যেন' বলতে যাই কেন?—দরকারও তো, এতদিন যাইনি সেইটেই তো ত্রুটি হয়ে গেছে।"

"কি দেখলে?"—চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশান্তর কণ্ঠে একটু ঔৎসুক্য উঠল ফুটে।

রজত বলল—"একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম আজ। আমরা শরীর নিয়েই চিরকাল ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। মনের দিকে যাওয়ার তেমন অবসর হয়নি, তার ওপর কবি-ঔপন্যাসিক এরা দল বেঁধে রটিয়ে দিয়েছে—মন নাকি নিতান্তই অজ্ঞেয় একটা বস্তু, তাই কথাটাকে মেনে নিয়ে বসে আছি। কিন্তু দেখলাম—এমন কিছু

অজ্ঞেয় বা হেঁয়ালি নয়। সেই যে কথায় বলে হাঁ করলেই বুঝতে পারা—সেটাই খাঁটি সত্যি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য একজন হাঁ করলেন আর একজন মুখ বুজেই রইলেন, কিন্তু বুঝতে দুজনকেই বেশ তো পারা গেল।"

"কি রকম ?"—এগিয়ে দিল প্রশান্ত। "হাঁ-করা অর্থাৎ কথা কইলেন লাহিড়ীমশাই। দেখলাম বেশ বিশ্বাস করে গিয়েছেন তোমার কথা। আমার বিবরণ শুনে—আমি কাজে সঙ্কট-সমস্যার কথাই বললাম—হঠাৎ বর্ষাটা বেড়ে যেতে—তা আমার কথা শুনে বললেন—এ সব কাজে সমস্যা আছেই পদে পদে, যেন বেশ শান্ত মনে দেখে-শুনে কাজ করে যাও। পাছে ওঁদের জন্যে ভেবে ভেবে মাথা ধরে তোমার কাজের ক্ষতি হয়, (প্রশান্ত একটু চেয়ে হাসল), তাই বলে দিলেন তোমার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, বিশাখার মুখে খবর তো পাচ্ছ, উনি অনাথকেও দরকার হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। বললেন,—স্কুলের দিক দিয়েও কোন নূতন কথা নেই। আরও সব অনেক কথা—যা থেকে স্পষ্টই মনে হয় তোমার কাজে ব্যস্ত থাকার কথা তোমার চেয়েও বেশী করে বিশ্বাস করে নিয়ে তোমার চেয়েও বেশী করে চিন্তিত আছেন।"

এই দ্বিতীয় শ্লেষে প্রশান্ত আবার একটু হাসল দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে। রজত বলল—"বাকি থাকে, যে একেবারে মুখ খুলল না তার কথা।"

"কিছু জিজ্ঞেস করলে না স্বাতি ?"

ওপর-পড়া হয়ে খবর নিতে গেছি কেমন আছেন—রাত করেই গেছি, কিছু জিজ্ঞেস না করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবেন এই রকমই কি মেয়ে ? হলে তাঁর কথা নিয়ে রাতদুপুরে আমি কি তোমার শান্তিভঙ্গ করতে আসি ? জিজ্ঞেস করেছেন হঠাৎ এত রাত করে গেছি কেন। চায়ের দরকার নেই বলতে জোর করেই সে আপত্তি বাতিল করে স্টোভ জ্বেলে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এসেছেন। সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার দরকার নেই বলতে একটু কড়া করেই শুনিয়ে দিয়েছেন, আমরা ডাক্তাররা পরকে উপদেশ দিতেই ওস্তাদ,

নিজে যে রুগী ঘেঁটে এলাম সেদিকে খেয়াল নেই। আঁর যা বলবার সবই বলেছেন—ভালো করে মুখ খুলে, মুখ খোলেননি শুধু তোমার কথা নিয়ে। সব কথা বলেছেন বলেই আরও আশ্চর্য, একবার মুখ ফসকে গিয়েও তোমার কথা বলে ফেলেননি……”

“নিশ্চিন্দি আছে বলেই।”—প্রশান্ত মন্তব্য করল।

একটা যে দৃষ্টি নিয়ে চাইল রজত তাতে তিরস্কার তো আছেই, তার সঙ্গে আছে অপরিসীম বেদনা। বলল—“কথাটা বেশ সহজেই তো বের করতে পারলে মুখ দিয়ে। প্রশান্ত, আমি যখন গেলাম—প্রায় সাড়ে দশটা—লাহিড়ীমশাই ভেতরে কি করছিলেন জানি না,—বারান্দায় উঠে দেখি স্বাতিদেবী দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন,—নিশ্চয় জীপের শব্দ শুনে সব কাজ ফেলে বেরিয়ে এসেছেন—কি আশা নিয়ে তা' তুমি বুঝতেই পারছ। কী যে নিরাশা, সেইটেই দেখলাম আমি। বুদ্ধিমতী মেয়ে, তখনই অবশ্য সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাই বা পারলেন কই? ওঁর প্রথম প্রশ্ন—‘খবর ভালো তো ডাক্তারবাবু?’ বুকের মাঝখানটা চেপে ধরেছিলেন একটু সেটাও দৃষ্টি এড়ায়নি আমার—বুঝতেই পারছ কেন, কিসের ভয়ে রাতদুপুরে ডাক্তার দেখে বুকটা ধক-ধক করে উঠেছে। বললাম—‘হ্যাঁ খবর বেশ ভালোই—মানে, আমাদের সবার খবর—প্রশান্তও অফিসের কাজেই বাড়ি গিয়েছিল, ভালোই আছে। তবে গ্রামগুলো একটু বিগড়েছে। আজ গিয়েছিলাম এদিকে, মনে করলাম আপনাদেরও একটু সাবধান করে দিয়ে যাই।’……ঐটুকু ভয়, ঐতে যা প্রকাশ পেল—(তোমার কাছে হয়ত এখনও পায়নি) —তারপর আর তোমার কথা একেবারেই তোলেননি। শুনে গেছেন, আমি তো যতটা পেরেছি বাড়িয়েই বলে গেছি—কাজ থেকে চোখ ফেরাবার অবসর নেই তোমার—শুনছি নাকি পুল আবার ঢেলে সাজাতে হবে—যতটুকু বুদ্ধিতে এল, বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলাম—শুধু মুখ বুজে শুনে গেলেন—একটা মন্তব্য করলেন না কোনখানে।

তোমার উপহারটাও দেখলাম—সবার কাছে যেটা এত হাসির

ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; গল্পটা তো ছড়িয়ে পড়েছে মুখে মুখে। দেখলাম ঘরের কোণে একটা মোড়ার ওপর রাখা রয়েছে সেটা। মখমল সেইরকম ঢাকা—সেই রকম একটা মালা ঝোলানো তার ওপর, যেমন শুনেছি, শুধু মালাটা টাটকা নয়। নিশ্চয় সেই মালাটা, হয়তো তুমিই দিয়েছিলে পরিয়ে। সবার হাসির জিনিস একজনের জমাট কান্না হয়ে পড়ে রয়েছে এক ধারে।”

চুপ করল। ডাক্তার মানুষ একটু ভাবাবেগ এসে গেছে, একটু যেন অপ্রতিভই। তারপর প্রশ্ন করল—“কি হোল বলতো?”

“কিছু যে হয়েছেই ধরে নিচ্ছ কেন? স্বাতির মতন তুমিও বিশ্বাস করছ না?”—প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল রজতের, বলল—“ইনফ্লুএঞ্জা হলে বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে ধরে ফেলা যেত লুকুবার চেষ্টা করছ কিনা। সে উপায় তো নেই। যাই হোক, বলবার হোলে বোল’। এতখানি টেনে তুলেছ পরিবারটাকে তুমিই, আরও গভীর একটা খাদের মধ্যে ফেলে দিও না”।

[সাতাশ]

রজতও অভিমান করেছে।

সে চলে যাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত একভাবে বারান্দাতেই চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইল প্রশান্ত। চিন্তার কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না। রজত এসে আরও যেন স্পষ্ট করে দিয়ে গেল স্বাতিকে। তারও এইভাবেই কাটছে; প্রশান্তর নিরুপায় ভাব, কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না; স্বাতির অভিমান, কিন্তু সে-অভিমান প্রকাশ করবার উপায় নেই, নিজের মনেই গুমরে সারা হচ্ছে।

ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ঘরে গিয়ে শুল’, কিন্তু যেন শয্যা-কণ্টকী হয়েছে। আবার বাইরে এসে বসল। রাত্রিটাও

গুমট, যেন নিজের অন্তরের উত্তাপ নিয়ে স্তব্ধভাবে পড়ে আছে। একেবারে শেষের দিকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া উঠতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রশান্ত, উঠল যখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে, রোদটা পা-দুটার ওপর বেশ কড়া হয়ে লাগছে।

শেষরাত্রে তন্দ্রার ঘোরে কি যেন একটা ঠিক করে ফেলেছিল। ···হ্যাঁ, মনে পড়ে গেছে। ঠিক করেছিল—এভাবে কাটানো সম্ভব নয় বলেই ঠিক ক'রে ফেলেছিল, নিজেদের সব কথা গোপন করে আবার যেমন সব চলছিল চলতে দেবে—রজতের এসে সব বলার পর দেখল—তার একলার জীবন নয়, আর একটা জীবন একেবারেই যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। রজত ঠিকই বলেছে, ভালোবাসাই তার সম্বল, সে, একেবারেই নিরুপায়। দুটো কথা গোপন করলে যদি তাকে বাঁচানো যায় তো করতে হবে বৈকি গোপন!

কথাটা মনে পড়ে যেতে বেশ ব্যস্ত-সমস্ত হয়েই উঠে পড়ল প্রশান্ত। মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে—চা ওখানেই—বলবে —ছুটে আসতে হোল তাকে—বলবে স্বাতি নাকি একেবারেই কিছু বিশ্বাস করেনি, উল্‌টে রাগ ক'রে বসে আছে! অভিমানটাকে রাগ করাতে দাঁড় করাবে আরও কড়া করে দিয়ে।

বেশ তাড়াহুড়ো করেই তোয়ের হয়ে নিয়ে বেরুতে যাওয়ার সময় হঠাৎ অত গোছগাছ-করা মনটা আবার এলিয়ে গেল। কাল রাত্রের নিস্তব্ধতায়, তন্দ্রার কুহেলী-চৈতন্যে যা সম্ভব বোধ হয়েছিল, সহজ বোধ হয়েছিল, আজ দিনের কড়া রোদে, চারিদিকের জাগ্রত বাস্তবে কেমন যেন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে—হীন, স্বার্থগন্ধীই—স্বাতির ভালোর নাম করে।

আরাম-কেদারাটা রোদ থেকে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে আবার গা ছড়িয়ে দিল। চাটুজ্যেকে বলল—চা-টোষ্ট ক'রে আনতে। আফিস যেতে ইচ্ছে করছে না—এদিকে এই রকম ফাঁসির-ব্যস্ততা দেখিয়ে সেখানে সমস্ত দিন চুপচাপ পড়ে থাকা—রাত পর্যন্ত, এও বড় হীন। না, এভাবে চলবে না। জীবনটাকে পৌরুষের সঙ্গে

গ্রহণ করতে হবে। যা হওয়ার নয় তাকে নির্মমভাবেই ছেঁটে দিয়ে দরকার হলে নূতন করে গড়তে হবে জীবনটাকে।

একটা সুযোগও উপস্থিত হোল; অন্ততঃ ওর মনে হয়েছিল তাই—

আফিসে গিয়ে এই সব বিশৃঙ্খল চিন্তা নিয়েই বসেছিল টেবিলের সামনে, ঝনঝন ক'রে ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে প্রশান্ত প্রশ্ন করল—কে?

"আমি বিমান।"

"বিমান!"—একটু ধোঁকায় পড়ে তখনই আবার বলে উঠল,—"ও, বিমান? আমাদের ওভারসিয়ার বাবুর ভাই? কখন এলে তুমি?"

"এই দশটার গাড়িতে।"

"বেশ, আছ তো এখন?"

"থাকব যে, কি এট্র্যাকশন আপনার কলোনীতে প্রশান্তদা?"—

একটু যেন লঘুভাবে হাসল বিমান। কতবড় গুরু আকর্ষণ যে লঘু করবার চেষ্টা তা দেখে প্রশান্তর মুখেও একটা হাসি ফুটল। তবে ছোটদের দলে পড়ে, 'আকর্ষণ'—যে সেও ছোটর দলেই, অনেকটা সম্বন্ধ-বিরুদ্ধই, কিছু আর বলল না। "তা বৈকি। তা'হলে?"—ব'লে একটা প্রশ্নের আকারেই ছেড়ে দিল।

"তাই আমি বলছিলাম প্রশান্তদা, পুলের ওদিকটা একটা ট্রিপের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? সেদিনকার সেই রাতের মতন?"

"খুব ভালো হয়।"—হাসিতে বেশ একটু দুলেই উঠল, অবশ্য আওয়াজটা চেপে রেখে। এর পরই কিন্তু হঠাৎ উৎসাহিতই হয়ে উঠল প্রশান্ত; বলল—"সত্যি ভালো হয় হে। সেই তারপর আর একবার গিয়েছিলাম আমরা। চমৎকার। জ্যোৎস্নাটাও রয়েছে। তবে বর্ষার রাত, বেশি রাত না ক'রে সকাল-সকাল ফিরে আসাই ভালো; এই ধরো নটা, সাড়ে নটার মধ্যে।"

"এসব ট্রিপের রাত্তির যত গভীর ততই—কি যে বলে ভালো,

উপভোগ্য ; নয় কি প্রশান্তদা ? গভীর রাতের একটা সৌন্দর্যই আলাদা তো।”

প্রশান্ত হেসে মনে মনেই বলল—‘আজ্ঞে, তা আর নয় ?’ ফোনে গম্ভীরভাবেই সমর্থন করল—“তা বইকি। আর বৃষ্টি যে বিনা নোটিশেই এসে পড়ছে এমনও তো নয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে। তাহলে যাচ্ছে কে কে ?”

“সেই সেদিনকার দল। আপনি, স্বাতি দেবী, রজতদা, আমি··· আর হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছিলাম, বিশাখা যদি যেতে চান। আরও হোলে তো ভালোই হোত—The more the merrier, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় ?”

“সব ক্ষেত্রে ভ্যাজাল বেশি বাড়ে সেটা আবার ভালোও নয় তো; এই পাঁচজনেই বেশ।”—এবার এটুকু না-ব'লে যেন পারলই না প্রশান্ত। বলল—“তাহলে সবাইকে বলে রাখো। আর, ইয়ে, একবার কাউকে দিয়ে লাহিড়ীমশাইকে বলে পাঠাতে হবে স্বাতির কথা।”

“আমিই যাচ্ছি।”

“না, না, তুমি নিজে যাবে কেন ? এই কড়া রোদ ! এতখানি পথ ! আর, প্রায় সদ্যই তো গাড়ি থেকে নামলে।”

“আমাদের এ-বয়সে অত রোদ-ফোদ গ্রাহ্য করলে চলে ?— আপনিই বলুন না। দুজনকেই বলতে হবে তো।”

“দুজন !·· লাহিড়ীমশাই কি আসতে চাইবেন ?”

“লাহিড়ীমশাই কেন ?—বিশাখাও তো ঐখানেই রয়েছেন।”

“তাই নাকি ? জানি না তো।”

“আপনার জীপে রজতদা কলে যাচ্ছিলেন, উনিও সঙ্গে গেছেন, স্বাতি দেবীদের বাসায় ড্রপ ক'রে দেবেন ওঁকে। এসেই শুনলাম— রজতদার খোঁজ নিতে গিয়ে।”

“এসেই রজতের খোঁজ ! শরীর তোমার ঠিক আছে তো ?”

—এই প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার মিষ্টতাটুকুরও লোভ সামলাতে পারল না।

বিমান বলল—"নাঃ, শরীরের কি হবে?—মানে—এই—ভাবলাম...."

"ঠিক আছে। তুমি একবার পাচক-ঠাকুরকে ডেকে দাও।"—হাসি চেপে আর কথাবার্তা চালানো শক্তও হয়ে পড়েছিল; ওদিকে বিমানের অবস্থাও ভাঁওতা দিতে দিতে শোচনীয় হয়ে আসছে। চাটুজ্জে এলে তাকে সবার জন্য রাত্তিরের খাবার তোয়ের করতে বলে দিল, নদীর ধারেই খাওয়া-দাওয়া হবে। চাটুজ্জে শুনে নিয়ে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, বিমান আবার নিল তার হাত থেকে। বলল—"জীপটাও এসে গেল প্রশান্তদা', রজতদা' ফিরে এসেছেন।"

"তবে আর কি। একটু থেমে যাও; আমি গোপেশ্বরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সাইকেলে করে, সে তোমায় জীপে করেই লাহিড়ীমশাইয়ের বাড়ি নিয়ে যাক।...দেখছি, তোমার যাত্রাটা খুব ভালো।"

"উনি না এসে পড়লেও যেতেই হোত।"

"সে তো বটেই। না গেলে চলত?...বেশ, তাহলে এসো। রজতকেও বলে দাও।"

এও যেন একটা ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনের গুমট কেটে যাওয়া। যৌবন-মনের স্পর্শ, কি মিষ্টি লুকোচুরি! নিজেদের দুটি মন নিয়ে কী মিষ্টি এক শম্বুকবৃত্তি!—পৃথিবীতে আর কিছু নেই, আর কেউ নেই, বিমান-বিশাখা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না, বোঝে না!.... হে ভগবান, এদের ভালোবাসার মাঝখানেও যেন আবার কিছু এসে না দাঁড়ায়।

দাঁড়ালই কিন্তু কোথা দিয়ে কি এসে।

একেবারেই জমল না আজকের নৈশ অভিযান। সবই অনুকূল; ভরা নদী, ভরা জ্যোৎস্না, কিনারায় সেই মিঠে গন্ধের বুনো সাদা ফুলগুলায় যেন বান ডেকেছে; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে রইল। স্বাতি এসেছে, একেবারেই মৌনও নয়, কথাবার্তা হোল। তবে সে একজন পরিচিতা যুবতীর কথাবার্তা মাত্র। সে কথাবার্তা ফুলঝুরি

নয় যে তার ফুলকিতে অন্য মনে আগুন ধরবে। কে এগুলো না ব'লে কে এগুতে পারল না বলা শক্ত, তবে দুজনেই যেন নিজের নিজের মান বাঁচিয়ে শুধু ভদ্রতার গণ্ডির মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। প্রশান্ত আর স্বাতি।

তবে ওদের বিমান আর বিশাখার দিকে খুব লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ, তাদের রাত্রিটুকুও না নিরর্থক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, ওদের উপলক্ষ্য ক'রে নিজেদের আবদ্ধ মনকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও। সে যেন আরও মর্মান্তিক। সক্রিয়ভাবে চেষ্টাও করল—স্বাতি-প্রশান্ত, দুজনেই। বিমানের মনটা সাড়াও দিয়ে উঠল বারকয়েক, তারপর বিশাখার সাড়া না পেয়েই গুটিয়ে গেল নিজের মধ্যে। আজকের এ-রাত্রি তারই তো বেশি করে, ছুটে এসেছে অতদূর থেকে, আয়োজনেরও সবটুকুই তারই, সবাই তো জানেও সে-কথা; এখন ঔদাসীন্যটা এত স্পষ্ট, যেন লজ্জা রাখতে যায়গা পাচ্ছে না বিমান।

একবার বলেও ফেলল—"আপনি বৃষ্টি হ'তে পারে বলে ভয় করছিলেন প্রশান্তদা'। দেখুন, এক ছিটে-ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও!"

—সবারই মনের কথা যেন তাই; একটু মেঘ উঠুক, একটা ছুতো পেয়ে ওরা মুক্তি পাক এই ব্যর্থ অভিসার থেকে। তবু চেষ্টা করল স্বাতি, কিংবা হয়তো সজ্ঞান চেষ্টা নয়, একটা পুরানো অভ্যাসেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"বিশাখা, চাতকের ডাকটা কানে যাচ্ছে না তোমার?"

প্রশ্নটা উলটে নিজের গালেই যেন একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল। বিশাখার মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটল একটু, তবে যেন একেবারেই কিছু বোঝেনি এই ভাব দেখিয়ে খুব সাধারণ একটা ঠাট্টা দিয়েই প্রসঙ্গটাকে শেষ করল, বলল—"এত জলের পরও যে-চাতক মেঘ চায়, তাকে আর কি বলা যাবে?···ঠিক বলছি না বিমানবাবু?" —বলে বিমানকেই সাক্ষী মানল।

দাদা রজতও তো রয়েছে; গা পেতে নেওয়াও যায় না স্বাতির ঠাট্টাটা। রজত যত যাই বলুক, সাধারণভাবে এসব দিকে বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম নয় মোটেই।

স্বাতি এসেছে, প্রশান্ত রয়েছে; কথাও হচ্ছে, পরিবেশটাও অনুকূল, ও এইতেই যেন সন্তুষ্ট। কথার অল্পতার জন্য অবকাশ যা পাচ্ছে সেটা চারদিকের গাঁয়ের রোগের বিবরণ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

খাওয়া-দাওয়াটা ওখানেই সেরে ন'টার আগেই ফিবে এল ওরা।

[আঠাশ]

এ যেন আরও কী একটা হয়ে গেল!

স্বাতির ব্যাপারটার জন্যে মন অনেকখানি প্রস্তুতই ছিল, ওর আরও খারাপ লাগল বিমানের প্রতি বিশাখার আচরণে। স্বাতিকে বোঝা যায়, বরং মনে মনে প্রশংসাই করে। প্রশান্ত নিজে নিরুপায় অবস্থাচক্রে, স্বাতি যে একটা সুযোগ পেয়ে যেচে এগিয়ে আসতে চায় নি এতে তার চরিত্রের দৃঢ়তাটুকুই ফুটিয়ে তুলেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই বেদনামূলক হলেও, স্বাতিকে ভালোবাসে বলেই, যেন একটা সন্ত্বনা রয়েছে এতর মধ্যেও। কিন্তু বিশাখার হঠাৎ এ-ভাব কেন?

চিন্তাটা নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে একটা সংশয় মনটাকে অধিকার ক'রে বসল—একি তার পুরুষদের ভালোবাসার ওপর অবিশ্বাস, স্বাতির দশা দেখে বিশাখা আর এগুতে সাহস করল না? একি প্রশান্তকে তার মৌন ধিক্কার?···আর যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা নিয়ে থাকা। মনটা যেন কঠিন মাটির স্পর্শ চাইছে।

রাত যখন এগারোটা, হঠাৎ রজত এসে উপস্থিত। বাবলা থেকে লোক এসেছে ডাকতে। স্কুলের সেক্রেটারি, সেই উৎসাহী যুবকটি, যে সবাইকে জড়ো ক'রে নিয়ে দাঁড় করাল স্কুলটা, তার অবস্থা সঙ্কটজনক। একটা তীব্র আঘাত পেয়ে উঠে বসল বিছানায় প্রশান্ত। বলল—"সে কি! চলো, আমিও যাব।"

মোটর বের করলও নিজেই। স্টার্টও দিল, সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়ে দিয়ে বলল—"না হে, ঠিক হবে না। একলাই যাও। ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এমন সঙ্কট অবস্থায় রোগীর মনের ওপর খারাপ প্রভাবই পড়তে পারে। মনে করতে পারে শেষ দেখা দেখতে এসেছে। তুমিই যাও। একটু দেখো প্রাণপণে লড়ে।"

হাসপাতাল হ'য়ে ভালোরকম যন্ত্রপাতি নিয়ে আর কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল রজত।

কঠিন মাটি যে এত কঠিন আর রুক্ষ হয়ে ঠেকবে পায়ে তা ভাবতে পারেনি প্রশান্ত। সবই যেন এক মুহূর্তে ফিকে হয়ে গেল। এই সব চুলচেরা বিচার, হৃদয় নিয়ে এত অভিনয় সব হয়ে গেল নিরর্থক। মনে হোল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই জীবনটাকে যত সোজা রেখায় টেনে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিতে পারি ততই যেন মঙ্গল। ভালো-বাসা, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি কতগুলা অবান্তর জিনিস আমদানি করে সেই রেখাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, তার মধ্যে কাটাকুটি করে নিজেরাই যেন জটিল করে তুলি। ওর ইঞ্জিনিয়ার-মন এই রেখার উপমাটা নিয়ে যতই চিন্তা করতে লাগল—একটা পুলের প্ল্যান বা বাড়ির প্ল্যানের মতোই জীবনটা সহজ, পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। রাতটা এগিয়ে যেতে লাগল রজতের প্রতাক্ষায়।

রাত সাড়ে তিনটার সময় রজত যখন ফিরল তখনও প্রশান্ত জেগেই। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, স্যালাইন দিয়ে আরও অন্যান্য উপায়ে অনেকটা সামলে দিয়ে তবে এসেছে। আর ভয়ের কিছু নেই, কম্পাউণ্ডারকেও বসিয়ে এসেছে সেখানে। একটু কিছু খারাপ লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে লোক পাঠিয়ে দেবে।

বলল—"একটু চা করতে বলো চাটুজ্যেকে।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল প্রশান্ত। চাটুজ্যেকে ডেকে তুলে গোপেশ্বরকে তার কোয়াটার্স থেকে ডেকে আনতে বলল। চুপচাপই গেল ততক্ষণ। গোপেশ্বর এলে তাকে জীপটা নিয়ে সেক্রেটারির বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল, কম্পাউণ্ডার দরকার

মনে করলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে রজতকে নিয়ে যাবে। চাটুজ্যেকে চা করে দিতে বলল।

রজত বলল—"ভালোই হোল। তুমি বরাবর জেগেই আছ?"

প্রশান্ত উত্তর করল—"কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ। ও তিনটের একটাও মাথায় ঢুকলে ঘুম আসে?"

"অবস্থাটা সত্যিই খারাপ হয়ে পড়েছিল।"

"সে-ভাবনাটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য ভাবনা নিয়ে ছিলাম। বিয়ের ভাবনা।"

"বিয়ের ভাবনা!"—পাশেই চেয়ারে বসেছিল রজত, অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে ঘুরে চাইল। বলল—'কার'? ....ও বুঝেছি, মিষ্টি ভাবনা দিয়ে এই তেতো ভাবনাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলে? ভালো ভালো। আমি তোমায় জিজ্ঞেস করবই মনে করছিলাম কথাটা আজকে রাত্তিরে......"

"একটা ভুল আন্দাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছ রজত।" —মলিন হাসি নিয়ে বলল প্রশান্ত।—"আজ রাত্তিরেও কি বুঝতে পারলে না আমার পক্ষে ও-চিন্তা এখন কত মিষ্টি?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দুহাতে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলে বলল—"তুমি স্বাতিকে বিবাহ করো রজত। অনেক ভেবে দেখলাম—এইতেই সব দিক রক্ষে হয়।"

"কী বলছ প্রশান্ত! তোমার মাথার ঠিক আছে তো?"

"অন্ততঃ ঠিক জায়গায় আছে, তবে বল তো তোমার পায়ে নামিয়ে দিচ্ছি। এটা তোমায় করতেই হবে রজত; আমি যে কী নরক-যন্ত্রনায় ভুগছি!"

গলাটা ধরে আসতে চুপ করে গেল। সামলে নিয়ে বলল—"বেশ, সবটা শোন, তারপরও রাজি না হও তো কি আর করব? ... আমার জীবনের সবচেয়ে গোপনীয় কথা রজত। শুধু তোমায়ই বলছি। শুধু একটা কথা দাও—যদি কোন কারণে বন্ধুত্বও ভাঙে আমাদের, কথাটা কারুর কাছে ভাঙবে না।"

আবার গলাটা ধরে এল। চাটুজ্যে চা দিয়ে গেল। নীরবেই পান করল দুই বন্ধুতে। রজত বলল—"বড় বিচলিত হয়েছ। দুটোর কোনটাই যে ভাঙবার নয়। ভাঙা এত সহজ ?

ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটল প্রশান্তর মুখে, হয়তো ভাঙন যে কত সহজ সে কথটা মনে পড়ে গিয়েই।

তারপর আস্তে আস্তে একটি একটি করে সব বলে গেল—লাহিড়ীমশাই কোথাকার মানুষ, কি ছিলেন ; প্রশান্তদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ—কী করে প্রশান্তদের দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে আজ তাঁর এই দশা—কি রকম করে কথাটা টের পেল প্রশান্ত, স্বাতিকে উপহার দিতে গিয়েই—নিতান্তই আকস্মিকভাবে দু'জনের অনুপস্থিতিতে অলস কৌতূহলে বইয়ের পাতাটা ওলটাতে গিয়ে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে এল। একটি বেশ হালকা হাওয়া আরম্ভ হোল দক্ষিণ দিক থেকে। জীপটাও ঘুরে এল কম্পাউণ্ডারকে নিয়ে। রোগী বেশ ভালোই আছে। তবু যদি দরকার হয় তো সাইকেল ছুটিয়ে দিতে বলে এসেছে কম্পাউণ্ডার।

রজত বলল—"গোপেশ্বর, জীপটা ঢুকিও না, আমায় পৌঁছে দিয়ে এসো একটু।"

"আবার তুমি চললে ! —এখুনি !"—বেশ চকিতই হয়ে উঠল প্রশান্ত। রজত বলল—"না, বাসায় দিয়ে আসবে।....যখন রয়েছেই গাড়িটা "

মাত্র কয়েক গজ, শদু'য়েকও নয় বোধ হয়। ক্লান্তভাবে উঠল গিয়ে। শুধু রাত জেগে রোগী পরিচর্যার ক্লান্তিই তো নয়।

[উনত্রিশ]

রজতকে সব কথা বলা হয়নি প্রশান্তর। ওর আজকের সঙ্কল্পের মধ্যে, জীবনকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করার মধ্যে আবার একটা কথা ছিল যা তন্দ্রাহীন রাত্রে ও ভেবে ভেবে ঠিক করেছে; বিশাখাকেই বিবাহ করবে। বিবাহটা হঠাৎ ওর কাছে একটা নেহাত প্রয়োজনীয় অথচ বিরস কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেমন অন্ন-সংস্থানের জন্য এই চাকরি; স্বাতির ব্যবস্থার পর ও-হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো। আর ভেবে দেখল বিশাখাকে বিবাহ করাটাই ও-হাঙ্গামাটাকে খুব কমের ওপর দিয়ে কাটিয়ে ওঠা।

টাকা-আনা-পাইয়ের দিক দিয়েও হিসাবটা কষে দেখল—মায়ের সাধ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও দিব্যি মিলে যাচ্ছে। রজতের বাড়ির অবস্থা ভালো, নিজেও উপার্জন করছে; এর ওপর বাড়ি বিক্রয়ের পর প্রশান্তর কাছ থেকে লাহিড়ীমশাই টাকাটা পেলে একটা মোটা রকমই যৌতুক পাচ্ছে রজত; সব মিলিয়ে বিবাহের বাজারে প্রশান্তর মূল্যটাকে মায়ের চাহিদা মতোই সে দিতে পারবে। আরও একটা কথা এর মধ্যে আছে। স্বাতির সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হওয়ার আগে প্রশান্ত এমন প্রমাণ কয়েকবারই পেয়েছিল যাতে মনে হয় বিশাখাকে নিয়ে প্রশান্ত সম্বন্ধে একটা আশা রাখত রজত। খুবই স্বাভাবিক তো; এমন উপযুক্ত পাত্র, এদিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের বন্ধুত্ব বিদেশ থেকে, এখানে এসে আরও বেড়েছে অন্তরঙ্গতা, আশা করা কিছু অন্যায় হয়নি। অন্যায় হয়নি যদি এমন বিশ্বাসও ছিল মনে যে প্রশান্তর মনটাও বোনের দিকেই ঝুঁকে রয়েছে।

মনে পড়ে যে দিন ব্যাঙ্গোটা কিনে দেয় বিশাখাকে, সেদিন পর্যন্ত রজত বলে ফেলেছিল—"দেখো, তুমি ওর খরচের অব্যেস করে দিচ্ছ না তো?"

—অর্থাৎ নিজেকেই তো শেষ পর্যন্ত ভুগতে হবে।

মনের আনন্দে বলে ফেলেছিল। তারপর থেকেই অবশ্য টের পেতে লাগল বন্ধুর মনের গতি কোন্ দিকে।

খুশীই হবে রজত; অবশ্য এই পরিবর্তিত অবস্থায়। ওর বাস্তব দৃষ্টিটা আরও প্রখর।

আর এরই জোরে ওকে রাজী করানও সহজ হবে স্বাতিকে বিবাহ করতে।

তুলত এ কথাটাও; কিন্তু সকাল হয়ে গেল। তা ভিন্ন, এর তত তাড়াহুড়াও তো নেই।

তোয়ের হয়ে গেল প্ল্যানটা; একটা বাড়ির কিংবা পুলের প্ল্যানের মতোই। মায় এস্টিমেট পর্যন্ত; কত খরচ, কি বৃত্তান্ত, সব কিছু। কয়েক দিনের অশান্তিটা কেটে গিয়ে স্বস্তি অনুভব করল প্রশান্ত। গা-ঝাড়া দিয়ে যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে প'ড়ে স্নান প্রাতরাশ পর্যন্ত প্রাতঃকালের যা যা কাজ সব সেরে নিয়ে আফিসে চলে গেল। আর ফাঁকির ব্যস্ততা নয়, অনেক কাজ জমে গেছে ক'দিনে।

একটানা কাজ চলল। আফিস, তারপর পুলে গিয়েও খুঁটিনাটি পর্যন্ত তদারক। কাজ করতে করতে কাজের একটা উন্মাদনা এসে গেছে। কোনও দিন হয়তো এল বাসায় দুপুরের খাওয়াটা সারতে; ফোনে বলে দেয়; নয়তো ঢালা হুকুম, আফিসেই যাবে খাবার। এইভাবে দিন দশেক কাটবার পর একদিন একটু রাত করেই এসে ছাখে—মা মুকুন্দমামাকে সঙ্গে করে উপস্থিত। এসেছেন আটটার গাড়িতে। ফোন করতে যাচ্ছিলেন স্টেশন থেকে, কলোনীর লরিটা পেয়ে চলে এসেছেন। উনি এসেছেন প্রশান্তর বিবাহ ঠিক করতে; বিশাখার সঙ্গেই।

এর আগে একদিন যে উনি আসেন স্বাতিকে দেখতে, সেটা বিশাখার একটা চিঠি পেয়েই। বিশাখা চিঠি দিয়েছিল প্রশান্তর বোন উষাকে। বহুপূর্বে, রেলকলোনীতে আসার গোড়ার দিকে ওদের বন্ধুত্ব হয়, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। বিশাখা উচ্ছ্বসিত হয়ে

লিখেছিল স্বাতির কথা। একটা আশঙ্কাও ছিল, এত ভালো, অথচ নিতান্তই গরিব ঘরের মেয়ে—প্রশান্তদা' আশা জাগাচ্ছেন মনে, ওর কিন্তু ভয় হয়।

ঠিক কতখানি আশা জাগাবার সন্ধান পেয়েছিল বিশাখা, সত্যই কোন রকম আশঙ্কা হয়েছিল কিনা মনে, জানা দুষ্কর। এ-বয়সের মেয়েরা কোথাও ভালোবাসার গন্ধমাত্র পেলেই তাই নিয়ে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়, মনগড়া হাসি-কান্নার সংযোগে একটা রোম্যান্স দাঁড় করিয়ে তৃপ্তি-অতৃপ্তির আস্বাদ পেতে চায়। এও হয়তো তাই।

তবে প্রশান্ত জানত কথাটা, তাই বাড়ি থেকে আসবার সময় মাকে বারণ করে দেয় বাড়ি-বেচা আর বিয়ে—কোনটার কথাই জানিয়ে কাজ নেই উষাকে। মা তাই নিয়েও আসেননি তাকে সঙ্গে ক'রে।

বিশাখার সঙ্গে প্রশান্তর বিবাহ, অবস্থার সঙ্গে একটা রফা ওঁর। প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে এসে দূরত্ব বৃদ্ধির জন্যই যৌবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলা মানুষের কাছে ফিকে হয়ে আসে, আবছা হয়ে আসে; মন নিয়ে হাসি-কান্নার ব্যাপারগুলা আর তেমন তীব্রভাবে প্রতিভাত হয় না তাদের কাছে। স্বাতিকে একদিন ভালো লেগেছিল তাঁর ছেলের, আজ কোনও কারণে লাগছে না—দুটোই অনেকটা গৌণ ওঁর পক্ষে। এতদিন বিয়ে করতে চাইছে না এই কথাটাই হয়ে পড়েছিল মুখ্য, আজ মুখ্য হয়ে পড়েছে, সে চাইছে বিয়ে করতে। বিশাখা মেয়েটি ভালো, স্বাতির চেয়ে রংটা আরও মাজা, যেন মনে পড়ছে চুল আরও একটু ঘন, স্বাতির চেয়ে থাকে কাছে—দৃষ্টির নীচেই একরকম, সুতরাং বিশাখাও যে ছেলের মনে রেখাপাত করেনি কখনও এটা সম্ভব মনে হয় না। তারপর, এই সম্ভাবনাটুকুর ওপরই বেশ দেওয়া যায় বিবাহ। তারপর সময়ে মিলিয়ে যায় মনের খুঁতখুঁতিনি কিছু যদি থাকে। ·· এই তো নিত্য হচ্ছে দুনিয়ায়। দেখে এলেন তো এত বয়স পর্যন্ত।

গিন্নীরা এই লাইন ধরেই ভাবে। কর্তারা তো বটেই; তারা আবার বেটাছেলে। মানদাদেবীর সিদ্ধান্ত, স্বাতির অভাব তবুও বিশাখা খানিকটা মিটিয়ে দেবে। একটা রফা।

টাকার দিকটাও একটা রফাই করলেন। রজত ঠিক তাঁর ছেলের ন্যায্য মূল্য দিতে না পারলেও একেবারে খালি হাতে বিদায় করবে না। বাড়ির অবস্থা ভালো, নিজের উপার্জন আছে, ঐ একটি মাত্র বোন।

এই আপোস-রফার মধ্যেও কোথাও যদি কিছু নৈরাশ্য থেকে গিয়ে থাকে তো একটা মস্ত আশ্বাসও রইল ; উনি ছেলেকেই সবার ওপরে রেখে এসেছেন বরাবর। স্বাতিকে যখন চেয়েছিল, উনি আপত্তি করেননি ; মিলল না যে, সে ওদের নিজেদের মধ্যেকার কথা। উনি নিজে হ'তে বিশাখাকে এনে বসাচ্ছেন, অনেকটা স্বাতির স্থান পূর্ণ করতে পারবে বলেই ; অর্থের কথাও বড় ক'রে ভাবছেন না। নয়তো বিয়ের বাজারে এ-ছেলের মূল্য !

ওর কথাগুলা সবই তো সত্য।

আগে অবশ্য প্রশান্তকেই বললেন। প্রশান্ত আপত্তি তো তুললই না কোন রকম, অধিকন্তু এক কথাতেই আদর্শ ছেলের মতো ঘাড় হেঁট করে একটু লজ্জিতভাবে হেসে এমন মেনে নিল যে নিজের আন্দাজের যথার্থতা দেখে বেশ আত্মপ্রসাদই অনুভব করলেন মানদা-দেবী। অর্থাৎ, তাহলে সত্যই বিশাখা রেখাপাত করেছিল মনে।

পরদিন সকালে প্রশান্ত আফিসে চলে গেলে রজতের কাছেও তুললেন কথাটা, তাকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে। এইখানে একটু ধাক্কা খেলেন। রজতের মুখটা কোথায় উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠবে, তার জায়গায় যেন আরও নিভেই গেল, একটু আমতা আমতা ক'রে বলল—"বিশাখার বিয়ের কথা বলছেন মা ?… …প্রশান্তর সঙ্গে ?"

একটা ধাক্কাই খেলেন মানদাদেবী। ছেলের মা—প্রশান্তর মতো ছেলের মা অনুগ্রহ বিলাতে এসে অনুগ্রহের ভিখারিণীতে পরিণত হয়ে গেছেন। অপ্রতিভ ভাবেই প্রশ্ন করলেন—"কেন বাবা ? ও-কথা বললে যে ?"

"প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ?…আমি নিজেই আপনার কাছে যাব মনে করেছিলাম, মা।"

"জিজ্ঞেস করেছি বৈকি বাবা। সে আমার কথায় রাজি হবে এমন ছেলে ও তো নয়।"

একটু ঘাড় হেঁট করেই রইল রজত, তারপরই তার চৈতন্যটা ফিরে এল—স্বাতির দিকে হঠাৎ মনটা চলে গিয়ে কি ভুলটা হয়ে যাচ্ছে! সামলে নেওয়ার চেষ্টা ক'রে বলল—"তাহলেই নিশ্চিন্দি। আমি আপনার কাছে যে যাব-যাব করছিলাম মা, সে এই জন্যেই—অসুখ-বিসুখের এমন হিড়িক পড়ে গেছে যে কোন মতেই হয়ে উঠছিল না। বিশাখা আপনার পায়ে জায়গা পাবে, এ তো কল্পনাতেও আসে না—নেহাৎ আপনার নাকি দয়া আমাদের ওপর, তাই......."

কথার রাশি দিয়ে ভুলটা ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল। সফলও হোল। হয়তো একটু খুঁত কোথাও আটকে রইল মানদাদেবীর মনে, তবে সেটাও আস্তে আস্তে মিলিয়েই এল। সরল প্রকৃতির মানুষ, গোড়ায় একটু ধোঁকায় পড়ে যাওয়ার জন্য চাটুবাদটুকু আরও বরং মিষ্টই লাগল, বললেন—"যাক্, আমার যেন মনে হয়েছিল আপত্তি আছে তোমার। বিশাখা মেয়েটিকে আমার পছন্দ বাবা। তবে, উপযুক্ত ছেলে, জোর করে নিজের পছন্দ চালাব, তা কেন করতে যাব বলো?"

স্বাতির কথাও এনে ফেললেন। বললেন—"লাহিড়ীমশাইয়ের মেয়ের কথা শুনছিলাম—কৈ, তখনও তো আপত্তি করিনি। এবার দেখলাম মত বদলেছে, নিজে হ'তেই বলে এল···"

"বললে প্রশান্ত?"

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল রজত। তবে এবার সতর্ক ছিল বলে এমন সংযত হয়ে যে মানদাদেবী অতটা ধরতে পারলেন না। মনটা প্রসন্ন রয়েছে, রজতকেও প্রশান্তর সঙ্গে এক ক'রে নিয়ে একটু হেসেই বললেন—"আজকালকার ছেলে হ'লেও মুখ ফুটে বলবে সে-ধরনের ছেলে তো তোমরা নও। তবে, তাতে কি আটকায় আমাদের বুঝে নিতে বাবা? বললে—চাও তো দেখতে পার বিয়ের সন্ধান।···কেন রে বাপু! এক জায়গায় তো করছিলিই নিজে ঠিক, আপত্তি তো

করিনি। তারপর নিজেই ভেবে ভেবে এই আন্দাজটা মনে এল। তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। আবার কথায় কথায় মত বদলায়, এও তো ঠিক নয়।···তোমাকেই কথাটা বলছি বাবা—মায়ের মন, বুঝতেই পার। যতক্ষণ না দু'হাত এক হচ্ছে, ধুকপুকুনি থাকবেই লেগে।" আবার একটু হাসলেন। অন্যমনস্কতার মধ্যেও সতর্ক ছিল রজত, বলল,—"আজ্ঞে, সে আর বুঝছি না।"

"আর, ভুলও তো করিনি বাবা, কেন করব বলো, মা-ই তো ওর। কথাটা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তো টের পেলাম—আন্দাজটা মোটেই ভুল হয়নি আমার।····যাক্, তাহলে তোমারও অমত নেই। এবার তাহলে তোমার পিসির কাছে পাড়তে পারব কথাটা। বিকেলবেলায় যেন বাসাতেই থাকেন তিনি। আর, যাবেনই বা কোথায়? এই তো জায়গা।"

"আপনি কেন যাবেন মা? একে তো একটা চিঠি দিয়ে তলব না ক'রে নিজে হ'তে ছুটে এসেছেন, এর লজ্জাই রাখবার জায়গা নেই আমার। পিসিমাকে পাঠিয়ে দোব। এমনি অবশ্য পায়ের ধুলো যত পড়ে ততই ভালো। তবে তার তো ঢের সময় আছে।"

বিশাখাও জানল। মানদাদেবী এসেছেন শুনে ও যখন তোয়ের হয়ে নিয়ে দেখা করতে এল, রজত তখন বেরিয়ে গেছে, উনি মুকুন্দ-দাদার সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়েই গল্প করছেন। বিশাখা ওঁকে প্রণাম করবার জন্যে এগুতে বললেন—"আগে ওঁকে করো মা, আমার দাদা।···তোমার মামা হ'ন।" তারপর ওঁকেও প্রণাম করা শেষ হ'লে পাশে বসিয়ে, বুকের সঙ্গে একটু জড়িয়ে ধরেই বললেন—"এই আমার নতুন মেয়ে হলো দাদা।" আঙুলে চিবুকটা একটু তুলে ধরে বললেন—"কেমনটি হবে বলো? তুমি হয়তো দেখওনি আগে।"

ওখান থেকে তাড়াতাড়িই ফিরে এল বিশাখা একটা ছুতো ক'রে। কিছুই সন্দেহ নেই, তবু পিসিমাকে প্রশ্ন করল—"হঠাৎ প্রশান্তদা'র মা কেন এসেছেন জান পিসিমা?"

উনি উত্তর করলেন—"এসেছেন তোমার ভাগ্যি নিয়ে মা। রজু

সেই কথাই তো ব'লে বেরিয়ে গেল এইমাত্র। আমিও যাচ্ছি নেয়ে পুজোটুকু সেরে নিয়ে। সকাল হতেই একটা এত ভালো খবর—ওপর-পড়া হয়ে এসে বলছেন গিন্নি, বিশ্বাস করাও তো শক্ত। তাই বলছিলাম রজুকে—হ্যাঁরে, থাঁই-টাঁই সম্বন্ধে কিছু পেলি আঁচ কথাবার্তায়?....ছেলে তো নয়, হীরের টুকরো—মাঝ কলকাতার ভেতর থেকে ও-ছেলেকে লুফে নেওয়া—ঐ তো লাহিড়ীমশাইও চেষ্টা করেছিলেন যেমন শুনতে পাই...”

বয়েস হয়েছে, বকা অভ্যাস, ব'কে চললেন।

রজত একটু দেরি ক'রে ফিরল হাসপাতাল থেকে। প্রশ্ন করল “হ্যাঁরে বিশা, শুনেছিস কথাটা—প্রশান্তদা'র মা কেন এসেছেন?”

“শুনেছি।”—ওর খাওয়ার জোগাড় করতে করতে বলল বিশাখা।

“তাহলে? আজকাল তো তোদের মতও জানতে হচ্ছে। আমরাই শুধু যেখানে পড়েছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম।”

“আমাদের মত নেওয়াও যা, না নেওয়াও তা—তাই জিজ্ঞেস করে।”—

অন্তু বারান্দা থেকে কথা কইছিল; বলতে বলতে সমানে এসে দাঁড়াল। বলল—“আমি একবার বাড়ি যাব দাদা, অনেকদিন যাইনি।”

“বাড়ি যাবি কি! খুব ছুটি দেখেছিস আমার?”

“কেন, প্রশান্তদা'র মা তো যাচ্ছেন। আজই যাচ্ছেন ওঁরা। ওঁদের সঙ্গেই যাব আমি, শুনব না।”

“লোকে বলবে কি!—শাশুড়ী না হ'তে হ'তে....এত স্ফূর্তি...”

“হয়েছে, থামো। লোকের বলার ভয় করতে গেলে তো বিয়েও পণ্ড হয়।”

—বলতে বলতে পেছন ফিরে এগিয়ে যেতে যেতে ও-বারান্দায় গিয়ে বলল,—“যাবই আমি দাদা। মত না দিলে আমারও মত নেই—এই ব'লে দিলাম কিন্তু।”

[ত্রিশ]

অনাথ আসে না আর।

একটা যে কিছু হয়েছে এটা তো খুবই স্পষ্ট, শুধু কি থেকে কি হয়েছে, সেইটেই পারছে না বুঝতে। খুবই অশান্তিতে কাটছে। এলে কিছু হদিশ পাবে, গোপেশ্বর রয়েছে, চাটুজ্যে রয়েছে। গোড়ায় গোড়ায় ক'দিন গিয়ে যে টের পায়নি কিছু, তখন ওরাও কিছু জানত না বলেই। এতদিনে আর নিশ্চয় বাকি নেই ওদের জানতে, কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। একদিন হঠাৎ দিব্যি দিয়ে বসল স্বাতি।

বিশাখা রোজই নিয়মিতভাবে আসে, আজকাল যেন আরও ঘড়ির কাঁটা ধ'রেই। সাধ্যমতো কাছাকাছিই ঘেরাঘুরি করে অনাথ, কিন্তু পুল-কলোনীর দিকের কথা নিয়ে এমনই নীরবতা যে ওরও মুখও যেন কে শপথ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে—যে-বিশাখা নাকি একটু সুবিধা পেলেই প্রশান্তকে টেনে স্বাতিকে কুটুস-কুটুস ক'রে কামড় দিতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল, স'রে স'রে থাকতে হোত অনাথ-কাকাকে।

মনের অশান্তিতে কাটছিল, নিরুপায় ভাবে, তারপর আজ বিশাখাও না যাওয়ায় বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে লাহিড়ীমশাই ওকে ডেকে একবার দেখতে বললেন। ওঁর বিশেষ কিছু ভাবান্তর নেই। ওদিকে স্কুল আর এদিকে বাড়ির দুটি ছাত্রী নিয়ে জ্ঞান-চর্চায় গা ঢেলে দিয়েছেন। প্রশান্ত কাজের মানুষ, কাজের চাপে পড়ে আসতে পারছে না—এই পূর্ণ-বিশ্বাসে ওদিকটায় দিব্য নিশ্চিন্ত আছেন।

অনাথকে বলতে সে একটু চটেই উঠল। এতদিনের আক্রোশ মিটিয়ে গোঁফজোড়াটা ফুলিয়ে বলল—"তা পায়ের শেকল খোলা হবে তবে তো যাব—সেটা খোলার ব্যবস্থা করো আগে।"

"তোর পায়ে শেকল!—এ তো প্রথম শুনলাম। সারা দুনিয়া এক করে বেড়াচ্ছিস।"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে কথাটাকে আর এগুতে দিল না স্বাতি, বলল ঃ

—"ও বাবা, আমি কবে রাগের মাথায় দিব্যি দিয়েছিলাম, সেই কথা বলছে অনাথ-কাকা। দেখছই তো, গেলে আর হুঁস থাকে ?"

আজ আর দেরি হোল না অনাথের ; যেতে-আসতে যতটা লাগে তার ওপর মাত্র আরও কিছুক্ষণ।

ও চলে গেলে, লাহিড়ীমশাইয়ের মনটা চঞ্চল লক্ষ্য ক'রে স্বাতি বলল—"তুমি তাহলে আজ না হয় একটু সকাল সকালই বেড়ানোটা সেরে আসবে বাবা ? তাই এসো বরং। অনাথকাকার দেরি হবেই ; সন্ধ্যের পর ক্ষীরির দিদিমা থাকলেও কেমন যেন ভয়-ভয় করে।"

লাহিড়ীমশাই বললেন—"বেশ তা' হলে হয়েই আসি, বাবলাতে একটু কাজও আছে। তাড়াতাড়িই ফিরব। ডেকে দিয়ে যাই ওকে।"

"না বাবা, থাক।"—যেন ভয় পেয়ে একটু হেসেই বলল স্বাতি। —"এখন ওকেই ভয়, যা গজর-গজর করে বুড়ী। এখন তো দরকারও নেই, বেশ বেলা রয়েছে। দরকার হয়, নিজেই ডেকে নোবখন।"

ওঁর সঙ্গে পড়ছিলই, উনি চলে গেলে বই তুলে এদিক-ওদিক ক'রে কাটল খানিকটা ; পরিষ্কার আসবাবপত্রগুলো আবার ঝেড়ে-ঝুড়ে,—গোছানো জিনিসগুলো আবার গুছিয়ে। আজ বইয়ের দিকে মনটা যেন যাচ্ছেও না ওর।

বিশাখা না-আসার জন্য নয়। ওটাকে ও তেমন বড় করে দেখতে পারছে না—একদিন না-আসা, নিত্যান্তই কোন একটা সহজ স্বাভাবিক কারণে হয়েছে নিশ্চয়। ওর মনটা বরং হালকাই আছে আজ। একটা মানুষ রোজ আসছে, তার সঙ্গে এত কথা, তার কাছে এত জানবার, অথচ দুজনের কেউই মুখ খুলতে পারছে না—একটা পাষাণ-ভারই বুকের ওপর চেপে থাকে তো ; সেটা নেই আজ।

তার ওপর এও একটা নূতন জিনিস হোল ; অনাথ গেল খবর

নিতে ; নিশ্চয় ছুটো বাড়িরই খবর নিয়ে আসবে। শপথ দিয়ে তুলে নিতেও তো পারছিল না।

হালকা মনে এটা ঝেড়ে ওটা গুছিয়ে হালকাভাবেই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আজ অনেকদিন পরে ঘরের কোণে সেলাইয়ের কলটার ওপর নূতন ক'রে নজর পড়ল। বিশেষ কিছু ভাবল না স্বাতি, মনটাকে ভালোমন্দ ভাবনা থেকে টেনে রাখলই বলা ঠিক। শুধু শুকনো মালাটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিল, মখমলের ঢাকনাটা তুলে, ঝেড়ে আবার পরিয়ে দিল। শুধু একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল।

বাগানে গিয়ে কিছু ফুল তুলে এনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটার চারদিকে গুছিয়ে রাখল। তাঁরই একটা গান নিয়ে গুনগুন করছে। এরপর আলমারি থেকে ব্যাঞ্জোটা বের করল।

অনেকদিন হাত দেয়নি ব্যাঞ্জোটাতে। আলমারির মধ্যে থেকেও ঢাকনাটাতে ধুলো জমে উঠেছে। খুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে বাগানের দিকে এগিয়েছে—আজ একটু বাজাবে—অনাথ এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল—"মা-মণি!"

কালো মুখটা তামাটে হয়ে উঠেছে, থমথম করছে, গোঁফজোড়া উঠেছে ফুলে। সমস্ত পথটা শুধু রাগ জমাতে জমাতে এসেছে অনাথ।

"কি আনাথকাকা?" ভীতভাবে প্রশ্ন করল স্বাতি।—"বিশাখা…"

রক্তবর্ণ চক্ষু থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল অনাথের। স্বাতি আর্তভাবে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল—"কি অনাথকাকা?—বিশাখার! ··ওঁদের···!"

"ও মা-মণি, তানার ভালোই হয়েছে"—হাউহাউ করে কেঁদে উঠে পায়ের কাছে আছড়ে অনাথ বলল—"ইনজিয়ারদাদাবাবু বিয়ে করছে তানাকেই—একি হোল!—আমরা কি করলুম যে এমন সব্বনাশ! ··"

"চুপ ক'রো অনাথকাকা—তুমি এর জন্যেই এত ··"

সহজ কণ্ঠেই, তবু কথাটা আটকে গেল, যেন সমস্ত শরীরটা কাঠ

হয়ে গেছে বলেই। তাইতেই হাত থেকে ব্যাঞ্জোটাও গেল পড়ে। গলাটা আবার তখনই ঠিক ক'রে নিয়ে বলল—ঠোঁটে একটু হাসি টেনে নিয়ে এনেই বলল—"ওঠ, বাঃ! অথচ এত ভালোবাস ওঁদের দুজনকে—লোকে শুনলে বলবে কি!..."

ঠাণ্ডা করল আনাথকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে। কিংবা ওর মুখে এ-ধরণের কথা শুনে স্তব্ধবাকই হয়ে গেল অনাথ, বলা যায় না। এরপর ব্যাঞ্জোটা নিয়ে বাগানে গিয়ে বসল।...যেন লড়াই চলেছে ওতে আর ব্যাঞ্জোতে, কোনমতে সুরে বাঁধা পড়তে দেবে না নিজেকে। কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে স্বাতি তন্ত্রীর ওপর প্লেকট্রামের ঘা দিতে আবিষ্কার করল তখন পড়ে গিয়ে চামড়ার একটা জায়গায় ছেঁদা হয়ে গেছে। অথচ এতক্ষণ যে এটুকু কেন বুঝে উঠতে পারেনি ভেবে পেল না!

এরপর কোলের ব্যাঞ্জোর দিকে চেয়ে চেয়ে ওর চোখেও জল নামল।

লাহিড়ীমশাই বেড়িয়ে এসে বাইরেই অনাথের মুখে শুনলেন কথাটা। অনাথ রাস্তার দিকে বাগানটায় এটা-ওটা করে মন বসাবার চেষ্টা করছিল। বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে খানিকটা দেরি হোল তাঁর। কিন্তু মন্তব্য করলেন না; একটু যেন টলতে টলতে গিয়ে বারান্দার সিঁড়িটায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

তারপরও বিশেষ কোনও প্রশ্ন-মন্তব্য নেই। শুধু মাঝে মাঝে —"এ কি ক'রে হতে পারে! এ কী হোল!"

কাকে করবেন প্রশ্ন যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজের মনেই করে ওঠেন, অনাথকেও করেন। তারপর এক সময় স্বাতিকেও করে বসলেন। সেদিন নয়। সেদিন শুধু বার দুই নিজেকে, একবার অনাথকে। বাকি সময়টা চুপচাপই কাটল। মাঝে মাঝে দৃষ্টি গিয়ে স্বাতিরই ওপর পড়েছে, চোখাচোখিও হয়ে গেল তার সঙ্গে। রাতটা এই করে কাটল।

স্বাতি ঘাবড়ে গেছে। নিজের চিন্তাটা একেবারে নেই আর। আড়ালে পেলেই অনাথকে বলছে—"কি হবে অনাথকাকা? আবার সেই ভাবটা ফিরে আসছে যে বাবার! কেন বলতে গেলে তুমি!"

সামনে মুখটা প্রসন্ন ক'রে কাজ দেখিয়ে ঘোরঘুরি করছে। বই নামিয়ে পড়ায় বসবার চেষ্টা করছে ওঁর সঙ্গে—বসছেনও; শুধু মন বসছে না বেশিক্ষণ।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে স্বাতিকে পড়াতে ব'সে হঠাৎ বললেন—"আজও বিশাখা আসবে না মা।···ওদের কথাটা শুনেছ বোধহয় অনাথের কাছে? কি হবে বলো তো?"

মুখের পানে চেয়ে রইলেন যেন মনের ভেতরটা খুঁজছেন। স্বাতি বেশ সহজভাবেই হেসে বলল—"শুনেছি বাবা। ভালোই তো হচ্ছে; দুজনেই কত ভালো, বুঝে দেখো না।"

আরও হাসিটাকে বাড়িয়ে বলল—"আমার শুধু ভাবনা, এখানে হবে না, কলকাতায় গিয়ে। ভোজটা মারা যায় তাহলে।

প্রাণপাণে চারদিকে হাসি ঝরিয়ে চলেছে। ওর চোখের জল ঝরে বাগানের নিভৃতে।

এর পর আরও চরমেই ঠেলে উঠল ব্যাপারটা হঠাৎ।

[একত্রিশ]

বিশাখা যে গেল, নিশ্চয় একটা সুবিধে পেয়ে এ-পরিবেশ থেকে আপাততঃ পালিয়ে বাঁচবার জন্যই; তবে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল আবছা গোছের। সেটা অবশ্য রজতের জানবার কথা নয়, তবে পালিয়ে বাঁচবার জন্য যে গেল সেটুকু বুঝতে বাকী রইল না ওর।

বাড়ির সঙ্গে ওদের সম্বন্ধটা যে বেদনাময় একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রজত বুঝল কেন বিশাখা এই বেদনার আশ্রয় চাইছে, তাই দু' একটা ঠাট্টা করল, কিন্তু বাধা দিল না কোনরকম। অবস্থা-গতিকে

হতেই চলেছে বিবাহটা, হবেও। এ বিবাহের যে একটা বিষাদময় দিক আছে, স্বাতিকে নিয়ে, সেটাকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে চায় তো কিছু বলা যায় না নিশ্চয়। পরে এও ভেবে দেখল, বিবাহ হলে কলকাতায় গিয়েই দিতে হবে। বিশাখা যদি সে সময় পর্যন্তই ওখানে থেকে যায়, সেটা হবে আরও ভালো এই পরিস্থিতির মধ্যে।

বিশাখার মন কিন্তু একটা অন্য রাস্তা ধরে চলেছে। একটা আবছা গোছের উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করল; তারপর যতই এগিয়ে যাচ্ছে, দৃষ্টি হচ্ছে স্বচ্ছ, পদক্ষেপ হচ্ছে দৃঢ়তর।···রজত ভাবছে, ভালো হোক, মন্দ হোক, এ বিবাহ হতেই চলেছে—নিতান্ত অবস্থাগতিকেই; বিশাখা জানে এ বিবাহ হবে না। স্বাতি মাঝে রয়েছে—যেমন এও একটা বড় কথা যার জন্যে এ বিবাহ অসম্ভব, তেমনি আরও একটা বড় কথা আছে যার মূল্য পুল-কলোনীতে স্বাতি ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না। স্বাতি গেল, সে ছাড়া আর একটিমাত্র লোক যে বুঝবে, তার কাছে ছুটে এসেছে বিশাখা। বাড়ী আসার ছুতো করে, বিয়ের আগেই শ্বশুরবাড়ি ছুটে আসবার লজ্জাটা ঘাড়ে করে।

ওরা সন্ধ্যার একটু আগে পৌঁছাল। বাড়ি পাচকঠাকুর আর চাকরের হেফাজতে। পাশেই এক প্রফেসর বাড়ি ভাড়া করে আছেন। বহুদিনের প্রতিবেশী, তারপর তাঁর একটি মেয়ে স্কুলের নীচু ক্লাস থেকেই উষার সহপাঠিনী হওয়ায় দুটি পরিবারে খুব অন্তরঙ্গতা। মায়ের অনুপস্থিতিতে উষা মাত্র সকালে এসে খানিকটা থাকে বাড়িতে, তারপর কলেজ, তারপর থেকে সমস্ত সময়টুকুই ওখানে থাকে, রাত্রিকাল পর্যন্ত। এঁরা এলে ও-ও এসে উপস্থিত হোল।

বিশাখাকে দেখে বিস্ময়-পুলকে বলে উঠল—"তুমি · ···!"

মানদা দেবী বললেন—"আমাদের বিশাখা তো। ভুলে গেলি এর মধ্যে? অবিশ্যি হোলোও সে অনেকদিন।"

"ভুলব মানে! জিজ্ঞেস করছি, হঠাৎ এত দয়া? আমি তো এক বছর ধরে এসো এসো ক'রে হয়রান হয়ে গেলাম।"

"ডাকলেই আসতে পারে কেউ?······নাও, ঠাকুর একটু শীগ্‌গীর

চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে ফেলো···এসো মা, আগে মুখ হাত ধুয়ে গাড়ির কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলো ·····"

এগিয়ে গেছেন উনি। বিশাখা একটু গলা নামিয়ে বলল—"এক বছর ধরে তপস্যার ফলও পেয়ে গেছ তো।"

"মানে !"

"শুনবেখন, ওঁর কাছেই ·····"

"বিশাখা-মা !" —আবার একটা হাঁক দিলেন মানদা দেবী; একটু ওদিক থেকে। "এই যে জ্যাঠাইমা !" বলে উত্তরটা দিয়ে বিশাখা বলল—"এবার আদরের ঘটা দেখেও কিছু বুঝতে পারছ না?"

"তার মানে !"

—ওর কথার একটা মুদ্রাদোষই, আরও ওদিক থেকে হাঁক দিলেন এবার। মানে খুঁজে খুঁজেই ··"

"কৈগো মা, বিশাখা—আগে······" আরও ওদিক থেকে হাঁক দিলেন এবার।

বিশাখা বলল—"আগে উষাকে ডেকে নিন জ্যাঠাইমা, এতকথার মানে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করছে······"

"ওর ওই এক রোগ।" একটু হাসির সঙ্গে কথা কটা ভেসে এল ওদিক থেকে। উষা—হ্যাঁ মা !" —বলে ওঁর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল বিশাখা—"এই !"—বলে একটা চাপা ডাক দিয়ে নিজের ঠোঁটের ওপর বারণের ভঙ্গিতে আঙুল চেপে ধরল। মানদা দেবী বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন—"কোথায় সাবান তোয়ালে দেবে, মুখ হাত ধুয়ে নেবে বিশাখা, না ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করল! · ঠাকুর এসো ভাঁড়ার ঘরের দিকে।"

"বেশ বাবা, দুজনেরই যখন এত পায়াভারি, এই চুপ করলাম।" —কপট রাগের সঙ্গে মৌনাবলম্বন করেই বাথরুম পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করে দিল উষা। বিশাখাও চুপ করেই রইল, মুখ টিপে হাসির মধ্যে কপট অভিনয়ের ভাবটা যা বজায় রইল।

এরপর হঠাৎ ওপর থেকে উষার সুতীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

"ওমা, তাই নাকি !!" মুখে সাবান মাখছিল বিশাখা, হাত থামিয়ে একটু হেসে কান পেতে রইল। খবরটা আদায় করে নিয়েছে উষা মায়ের কাছ থেকে। তবে যেমন ঐটুকুর পরই হঠাৎ থেমে গেল, বুঝল—ও লজ্জিত হয়ে পড়বে বলে ও-প্রসঙ্গটা তুলতে আপাততঃ যেন বারণ করেই দিলেন মানদা দেবী। বিশাখা বাথরুম থেকে যখন বেরুল, একটু আড়াল হয়ে যেন প্রতীক্ষা করেই দাঁড়িয়ে ছিল উষা, ওকে দেখে আড়চোখে চেয়ে একগাল হাসল। বিশাখা হাসল একটু চোখ রাঙিয়েই। মাও এসে গেছেন নীচে, এইটুকুতেই যা একটু মন জানাজানি হয়ে রইল আপাততঃ।

চায়ের টেবিলে কথা রইল সংক্ষিপ্ত। যেটুকু হোল তাও মানদা দেবী আর বিশাখার মধ্যে প্রধানতঃ আবদ্ধ রইল—বিশাখার বাবাকে আজ ফোন করলেন না—করলেই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন—এলই যখন, থাক্ না ছুটো দিন, তাড়া কিসের এত ? ছুটো দিনকে একটা দিন করবার চেষ্টা করল বিশাখা।·····চায়ে আর একটু চিনি দেবে ? ······আর একটা সন্দেশ নিক বিশাখা······

উষা হঠাৎ বলে উঠল—"আমি এমন করে মুখ বুজে ব'সে থাকতে পারবনা কিন্তু !"

এমনভাবে জ্বালাতন হয়ে খানিকটা গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল যে, বিশাখার সঙ্গে মানদা দেবীও ফুক'রে হেসে উঠলেন। বললেন—"ছাখো কাণ্ড! তা ক'না কথা কত কইবি, মানা করছে কে ?"

"তা'বলে ঐ নিয়ে ?·······টেলিফোন···সন্দেশ খাও···?"

আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল ছুজনের হাসি। বিশাখা বলল—"নিজে তো মুখ ফুটে বলতে পারলে না ; জ্যাঠাইমা খেতে বলছেন, তাও পছন্দ নয়। ওদিকে—'এক বছর থেকে ভেবে হয়রান হচ্ছি !'··· বলুন জ্যাঠাইমা ? ···বেশতো, জ্যাঠাইমা ছু'দিন ছিলেন না—কেমন পড়াশোনা করলে হিসেব দাও।"

"তার মানে ? তোমার কাছে হিসেব দিতে হবে ?"

উঠে পড়েছেন মানদা দেবী। বিশাখা একটু গলা বাড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল—"কেন, গুরুজন হলুম তো।"

"ইস্, ভারি আমার।……"

—আর সম্ভব নয় রাশ টেনে রাখা, দরকারও নেই। মানদা দেবী ওদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই বললেন—"তা কর না কত গল্প করবি বাপু—না হয় ছাতেই চলে যা না—খোলা হাওয়ায়—তখন বারণ করেছি, আমার সঙ্গেই কোথায় একটু জিরিয়ে নেবে, না—"

"মানে—মানে করে জ্বালাতন করবি—কি বলুন জ্যাঠাইমা?"

"মা, ছ্যাখো আবার! ……ইস্! ওই মুখে আবার সন্দেশ গুঁজে গুঁজে দিতে হবে ওঁকে?"

"তাহলে যাবে ওপরে?" প্রশ্ন করল বিশাখা। বলল—"তাই চলো বরং, বড্ড গুমোটও নীচেটা।"

উষা উঠে পড়েই বলল—"ওমা যাব না? 'মানে' জিজ্ঞেস করবার ছাড়পত্র পেয়েছি। তাহলে একটু বোস' ভাই, একেবারে গা'টা ধুয়েই আসি! তুমি ততক্ষণ কি করবে? না হয় আর এক কাপ চা দিয়েই যাক না।"

"না, আর চা নয়।" উঠেই পড়ল বিশাখা। বলল—"আমি ততক্ষণ ওপরেই চলে যাচ্ছি বরং।"

"তাই যাও তাহলে। আমি পাশের বাড়ি থেকে দোষাকে ডেকে নিয়ে আসছি।"

"না, না, আর কাউকে নয়!" সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল বিশাখা। উষা বলল—"কেন! বেশ ভালো মেয়ে তো। ওর নাম বিদিশা—তাই থেকে দিশা—আমি শুধু ডাকি দোষা বলে।"

ও ঐরকম খাপছাড়া। এমনভাবে ভ্রূ-কুঁচকে গম্ভীরভাবে বলে গেল, বিশাখা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল—"কী জ্বালা বলো তো! মন্দ হতে যাবে কেন? করব আলাপ এর পরে। আমি যাই, এসো শীগগীর। একলাই। একজন ভালোকেই আগে সামলাই।"

—বেশ ছিল ওপরে গিয়ে দোতলার ছাতে পায়চারি করতে করতে

মনটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল। একটা দমকা হাওয়ার মতো স্বাতিদের বাড়ির সঙ্গে পুল-কলোনীটা এসে পড়েছে সামনে। …ক'দিন আগে, প্রায় এই সময়ের কথা। তখনও বিয়ের এই নূতন কথাটা ওঠেনি, অন্ততঃ বিশাখা জানত না। প্রশান্ত হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিয়েছে, এইতেই একটা বিষণ্নতা ছেয়ে আছে স্বাতিদের বাড়িতে। ওরা দুজনে বাগানে বসে ছিল। জীপ আসতে বিলম্ব হচ্ছে—সেইকথাটাই টেনে টেনে বাড়িয়ে চলছিল। হঠাৎ বিশাখার কি খেয়াল হোল—দুর্বুদ্ধিই বলতে হয়,—ভেতরে গিয়ে ব্যাঞ্জোটা নিয়ে এসে একেবারে স্বাতির কোলে তুলে দিল, বলল—"ভালোই হোল স্বাতিদি, যখন আসবার আসবে জীপ, ততক্ষণ তুমি একটু বাজাও। জং ধরে গেছে ঘাটগুলোয়।"

হঠাৎ এনে বসিয়ে দেওয়ায় কোনও কথা খুঁজে পেল না স্বাতি—মুখটাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—শেষে ওর কথার মধ্যেই যেন একটা অবলম্বন পেয়ে, ব্যাঞ্জোটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—"তা-ই হয়েছে ·····দেখছি। ঠিক ক'রে নিলে···"

এই সময় জীপের হর্ণ বেজে উঠল বাইরে, স্বাতি প্রায় উল্লসিত হয়েই বলে উঠল—"ঐ নাও, এসে গেল তোমার জীপ!"

ঐ কটা কথাই বোধ হয় ওদের জীবনে শেষ কথা হয়ে রইল,—ভাবছে বিশাখা—স্বাতির ঐ চিত্রটিই বোধ হয় শেষ চিত্র—ব্যাঞ্জো কোলে, মুখে সেই বিব্রত কী-যে-করবে ভাব। ····আশ্চর্য! প্রশান্তদা নাকি নিজেই বলেছে বিশাখাকে বিয়ে করবার কথা! হয় কি ক'রে এটা! প্রশান্তদা-স্বাতি, দুজনকে আলাদা ক'রে ভাবতে যেন হয়রান হয়ে যায় বিশাখা। অথচ হবেই তো। নিরুপায় স্বাতিদির মুখখানা মনে পড়ছে। কি ক'রে মনে হচ্ছে নীরব ব্যাঞ্জোটা কোলে করে এখনও যেন শূন্য দৃষ্টি সামনে ফেলে বসে আছে। চোখ দুটো ভিজে আসছে বিশাখার।

[বত্রিশ]

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে উষা, মাঝ পথ থেকে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—"ছাখো আমার আন্দাজ ঠিক কিনা!"

তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিল বিশাখা, গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—"ইস্। মোটেই না।"

"তার মানে!" —ভ্রূ কুঁচকে কাছে এসে উষা বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—"ওকি, তুমি নাকি কাঁদছিলে বিশাখা!"

"যাঃ, কই? যাঃ—বলতে বলতেই বিশাখা উলটে ওরই ঘাড়ে মুখটা লুকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে উষা। খানিকক্ষণ তো কিছুই বেরুল না মুখ দিয়ে, তারপর মাথায় ডান হাতটা টেনে দিতে দিতে আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলে চলল —"চুপ করো—ভাই—চুপ করো—কিছু যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে, মাফ করো—হঠাৎ কি হোল?......"

কেঁদেই চলল বিশাখা; শুধু আজকের আর কালকের কান্নাই তো নয়, কতদিন থেকে জমে আসছে। অনেকক্ষণ পরে মাথাটা তুলে বাইরের দিকেই চেয়ে রইল, মুখোমুখি হতে পারছে না উষার সঙ্গে। উষাও যেন কি বলে ফেলবে এই ভয়েই মুখ খুলতে পারছে না। অনেকক্ষণ এইভাবেই কাটল। একসময় উষাই আলগা হাত কাঁধে দিয়ে বলল—"কি হোল ভাই হঠাৎ? কিছু বুঝতে পারছি না ব'লে মনটা এমন......"

ওর গলাটাও ধরে আসতে বিশাখা ঘুরে ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে একটা হাসি টেনে বলল—"এই ছাখো! ......অথচ আমি ওর কাছেই এলাম ছুটে তাড়াতাড়ি!"

"আমার কাছে!" —বিস্ময়ের জন্যই আবার ও-ভাবটা সামলে গেল উষার। মুখের দিকে চেয়ে রইল। বিশাখাকে নিরুত্তর দেখেই

বলল—"ও, হ্যাঁ, আমার আন্দাজ ভুল বলছিলে—মা যা বললেন তা সত্যি নয় ?"

"হতে পারে ?" বিশাখা প্রশ্ন করল।

"কেন হবে না ?"

"স্বাতিদিকে মনে আছে।"

ঊষা নিরুত্তর হয়েই মুখের দিকে চেয়ে রইল। মানেটা যেন একটু একটু ধরতে পারছে এতক্ষণে। বলল—"কেন থাকবে না মনে ? তাঁর সঙ্গে দাদার বিয়ে হওয়ার কথাও হচ্ছিল তো।"

"তারপর হোল না, সুতরাং আর সম্বন্ধ কি ? এই তো ?"

ঊষা দু'হাতে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলল, কাতর কণ্ঠে বলল—"ঠাট্টা করছ ভাই ? আমি কি ক'রে বুঝব কি হয়েছে ! বিয়ের কথা হয়ে যায় না ভেঙ্গে এমন ? না ভাই, বলো।"

"কি বলব ? আমি নিজেই জানি না।"—কাতরভাবেই আবার একটু হাসল বিশাখা, বলল—"শুধু এইটুকুই বুঝছি মস্ত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে। হয়তো ভুলই একটা ; কি করে অন্যায়ই এ-কথা জোর ক'রে বলব ? শুধু দেখছি স্বাতিদি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। পরশু পর্যন্ত এই কথা, তারপর শুনবেন আমি রয়েছি এর মধ্যে।"

"আর দাদা ?"—ভেঙে পড়বার কথা ধরেই প্রশ্ন করল ঊষা। বিশাখা বলল—"বেটাছেলেরা ভেঙে পড়েছে একথা কখনও শুনেছ ? একটা হোল না, আর একটা। প্রশান্তদাও তাই করতে যাচ্ছেন।"

একটু বেশিক্ষণই চুপচাপ গেল এবার। তারপর ঊষাই যেমন ঝোঁকের উপর বলে সেইভাবে ব'লে উঠল—"না ভাই, তা'বলে আমি তোমার মায়া ছাড়তে পারব না। কি জানো, স্বাতিদিকে মাত্র একবার দেখেছি। আর, হ্যাঁ, তুমিও তো ভালোবাস দাদাকে।"

"তুমিও তো বাস।"

"বিয়ের আগেই ঠাট্টা !"—চোখ পাকিয়ে উঠল ঊষা।

"ঠাট্টা মোটেই নয়।" বিশাখা বলল—"তোমার মতন ক'রে ভালোবাসা যায় না ?"

"তার মানে বোনের মতন?

বেশ একটু নিরাশ হোল যেন উষা। টেনে টেনে একটু মগ্নস্বরেই বলল—"তাহলে আর কি হোল?—দাদা অত অন্য রকম ক'রে ভালোবাসবার মতন—অত ভালো পাত্র—তোমার নিজের ভাইও নয়।"

একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল বিশাখা। উষা বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে বলল—"হাসছি তোমার ভালোবাসার অঙ্ককষা দেখে। মস্ত বড় হিসেবে ভুল হয়ে গেছে বড় ভাই-এর মতন ভালোবেসে, নয়? তুমি এত ছেলেমানুষের মতন কথা বল—কেন যে ছুটে এলাম তোমার কাছে!"

একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল উষা, বলল—"না ভাই এবার বুঝতে পেরেছি, বলো।"

"তুমি আসল কথাটাই এখনও বুঝতে পারনি।"

"কি কথা? কার কথা? ঐ যা বললে?"

হ্যাঁ, তারই কথা যে ভালোবেসে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। তুমি দেখোনি, তাই বুঝতে পারছ না, আমি একটু একটু করে দিনের পর দিন দেখে এসেছি, উষা। যখন গড়ে উঠছে তখনও দেখেছি, যখন ভাঙন ধরল তখনও দেখেছি। দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি ভাই..."

"ভয়!"

হ্যাঁ, ভয় এই জন্যে যে দেখলাম—ভাঙন একদিকেই ধরে শুধু। কি জানি, দুদিক থেকে ভাঙন ধরলে সে বোধহয় মন্দ নয়। তাতে ভালো করে গড়বার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাতো হয় না। একজন ভাঙে নূতন গড়বার জন্যে, বোঝে না, যার গড়বার উপায় নেই, সে কি ক'রে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। স্বাতিদির অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি। আমি সাবধান হয়ে গেছি—তোমায় সত্যি কথা বলতে কি।"

"সাবধান!....কিসের? মানে.."—একটু সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়েই প্রশ্ন করল উষা।

"বিশাখা বাইরের দিকে চেয়ে অনেকটা আত্মগতভাবে বলল—

"জানি না সেটা আর এখন সম্ভব কিনা—তবে একথা তো হয়ই মনে—স্বাতিদির অবস্থাটা দেখে যে, জেনেশুনে এ-পথে পা-বাড়ানো...."

"তাহলে বাড়িয়েছিল পা। আর তাহলে নিশ্চয় দাদার দিকেই; সেই আমার কথাই তো এল।

"তুমি সত্যিই বড় ছেলেমানুষ।—একটু হাসল বিশাখা।

"বেশ তাহলে বলো, অন্য কে সে?"

একটু ভাবল বিশাখা চোখ তুলে। বলল—"সাবধান হয়ে গেছি, এইটিই আমার জীবনে এখন বড় কথা ভাই। কার থেকে সাবধান হলাম সে-কথার আর দাম নেই, কেন সাবধান হলাম সেই কথাটাই আসল।...হয়েতো তোমাদের বাড়িতেই আসতে হবে আমায়, সুতরাং ও কথাটা বাদ থাকাই ভালো নয়?"

চোখ দুটো হঠাৎ ছল ছল করে এল। মুছেই নিতে হোল বিশাখাকে। ওর হাতটা ধরাই ছিল ডান হাতে, চাপ দিয়ে একটু বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল—"হ্যাঁ বাদ থাকতে দাও, লক্ষ্মীটি। এখন আমি যার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি তাইতে আমায় একটু সাহায্য করো, করতেই হবে ভাই।"

"কি করে করতে হবে বলো?"

একটু আবার ভাবল বিশাখা, বলল—"তার আগে বলো—বুঝেছ যে কাজটা অন্যায় হচ্ছে?"

"তুমি যখন বলছ..."

আমি বলছি বলেই কি?..."বেশ, তাহলে আগাগোড়াই সব বলি তোমায়।" আগাগোড়াই সব বলে গেল বিশাখা; সেই দুর্যোগের রাত্রের প্রথম দেখা থেকে সেলাইয়ের কল উপহার দিতে গিয়ে দেখা পর্যন্ত না করেই অন্তর্ধান। এর মধ্যেকার সমস্ত ইতিহাস—যা নিজে জানে, যা গল্পের মধ্যে দিয়ে স্বাতির কাছে শুনেছে—কি রকম করে দারুণ দুর্দশার মধ্যে থেকে ওদের টেনে তুলল প্রশান্ত, কি রকম করে আশা জাগাল স্বাতির মনে—কতদিনের কত মেলামেশার মধ্যে, টুকরো টুকরো কথা, খণ্ড খণ্ড হাসি-পরিহাসের মধ্যে যা দিন দিনই

স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, সংশয় ছাড়িয়ে সুনিশ্চিতের রূপ নিয়ে উঠেছে। তিন জায়গাতেই প্রীতিভোজ, প্রথম রাত্রে নদী-তীরের অভিযান।...তারপর দ্বিতীয় রাতের অভিযানের কথাও বলল—কি ক'রে দুজনের মন একটু কাছাকাছি আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে শেষ পর্যন্ত বিশাখার মনে এই কথাই হয়েছিল—একটু মেঘ উঠুক, পালিয়ে বাঁচা যাক।

শেষের দিকে বলতে কথা আটকে যাচ্ছিল বিশাখার, চোখে জল নেমেছে, মুছে মুছে যাচ্ছে ; ওর হাতটা আবার দুহাতে চেপে বলল—"এর পরেও আমায় যেতে হয়েছে উষা। সে যে কী গেছে আমার কটা দিন! কিছু বলতে পারি না, স্বাতিদি ওদিকে মুখের হাসি দিয়ে বুকের কথা চেপে যাচ্ছে—কী যে কেটেছে আমার! গায়ের জ্বালায় একদিন দাদাকেও সব বললাম—তাঁর বন্ধুকে বলতে। তারপরই এই কোপটা এসে পড়ল উষা—প্রশান্তদার এই নতুন প্রস্তব—আমি বাঁচলাম ভাই—সত্যিই বাঁচলাম—কেন জান?—স্বাতিদির বাড়ি আর যেতে হবে না আমায়। আমি আর পেরে উঠছিলাম না ভাই...ওর হাতে মুখটা চেপে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল।

উষারও চোখ আর শুষ্ক নেই। ধরা গলাতেই বলল—"চুপ করো ভাই। আমায় মাফ করো, ঠিক বুঝতে পারিনি। বলো, কি করতে হবে, করব আমি। সত্যি বুঝতে পারিনি।"

[তেত্রিশ]

কথাগুলো গোপন রাখারই ইচ্ছা ছিল প্রশান্তর, কিন্তু রইল না।

মা আসতে তবু যা হোক কিছু একটা হচ্ছিল, সময়টা খালি থাকছিল না। উনি চলে যেতে যেন অসহ্য হয়ে উঠল। দুটো যে দিন কাটল তাতে কয়েকবারই মনে হোল, না-হয় বাড়ি থেকেই একটু ঘুরে আসুক, কিন্তু মস্ত বড় অন্তরায় হয়েছে বিশাখা। লোকে মনে

করবে তারই টানে বুঝি ছুটে গেল। অথচ আসল কথা হোল কনোলী যেন বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে।

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না দু'দিন থেকে। ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাব, বিছানাতেই এলোমেলো চিন্তা নিয়ে পড়ে আছে। নানা রকম সংকল্পও করছে, অনেক সংকল্প আবার শিথিল হয়ে যাচ্ছে নানা রকম বিরুদ্ধ যুক্তির আঘাতে। তার মধ্যে একটায় এসে মনটা একেবারে বজ্রের মতো কঠিন হয়ে উঠল। প্রশান্ত উঠে লেখবার টেবিলে বসে একটা ফুলস্কেপ কাগজ টেনে নিয়ে একটা লম্বা দরখাস্ত লিখে শেষ করল। বক্তব্য—এখানে আর একেবারেই স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে না, অন্য কোথাও বদলি হতে চায়। শেষ করে একবার চোখ বুলিয়ে গেল, তারপর পাছে আবার দুর্বলতা এসে পড়ে এই জন্যেই খামে পুরে ঠিকানা লিখে পোষ্টাফিসে গিয়ে রেজিষ্টারি করে আসবার জন্যে গোপেশ্বরকে ডাকতে যাবে, "কেমন আছ হে?"—ব'লে রজত এসে বারান্দায় উঠল, টেবিলে দেখে বলল—"শুয়ে থাকলেই ভালো হয় না?"

প্রশান্ত বলল—"শুয়েই ছিলাম, একখানা দরকারি চিঠি ছিল। এসো।"—আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল, রজত ঐ চেয়ারটাই টেনে নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল। প্রশ্ন করল—"আছ কেমন?"

"ভালোই তো। তুমি এই জিজ্ঞেস করতে দুপুরের রোদ মাথায় করে এলে?"

ঠিক তোমার কাছে আসিনি। জীপটা বের করব একবার।.... বলছ ভালো আছ, কিন্তু......"

"এমন সময় আবার কোথায় চললে? কল?" —ওর ওই কথাটা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"যাচ্ছি স্বাতি দেবীর ওখানে..."

ছেড়ে দিয়ে, প্রশান্তর কুতূহলী দৃষ্টির উত্তরে অল্প একটু ব্যাঙ্গের টোনেই হেসে বলল—"না, না, অত উঠে-প'ড়ে' লাগিনি। দু'দিন থেকে যাব যাব করছি, অথচ হয়ে উঠছে না। মরা সামলাই কি আধমরা সামলাই?"

প্রশান্ত বিষন্নভাবে হেসে বলল—"যখন যেতেই বলেছি, দুপুরের রোদ মাথায় করে যাওয়া তো ভালো লক্ষণই আমার কাছে। কিন্তু, সে যাক। তা যখন নয়, কেন যাচ্ছ এসময়?"

"একটা কথা প্রশান্ত; একটা মেয়ে, নিঃসঙ্গই বলা চলে—মনের উপর কতগুলা চাপ সে একসঙ্গে সহ্য করবে? তুমি যাচ্ছ না—এখানে থেকেও, এই যথেষ্ট, তারপর বিশাখার যাওয়া বন্ধ হয়েছে—কিভাবে কাটছে তার, কতখানি বরদাস্ত করতে পেরেছে একটু খোঁজ নেওয়াও তো দরকার। মনের ব্যাপার আমরা অতটা বুঝি না, কিন্তু নিতান্ত শরীরের দিক থেকেও তো ভেবে দেখবার কথা—একটা কঠিন অসুখও তো হয়ে পড়তে পারে। আর এইখানেই তো শেষও নয়—এরপর শুনবে আমি তোমার স্থান অধিকার করবার ষড়যন্ত্র লাগিয়েছি; তারপর—তার সঙ্গে সঙ্গেই শুনবে…"

"আমি যাচ্ছি বিশাখাকে বিয়ে করতে।"—বাইরের দিকে চেয়েছিল প্রশান্ত, ঘুরে পূরণ করে দিল ওর কথাটা, তারপর বলল—"আমি চাপ একে একে কমিয়ে আনছি রজত…"

"করবে বিয়ে স্বাতি দেবীকে!" আশা এল তো একেবারে চরম হয়েই এসে পড়ল। প্রশান্ত একটু হেসে বলল—"সেটা, উল্টে দুজনের ওপরই কত উগ্র একটা চাপ হবে বলেই যে আমি এগুলাম না, তুমি কি জান না?"

"তবে?"

"ঐ খামটার মধ্যে একটা দরখাস্ত আছে, পড়ো।"

বের ক'রে নিয়ে পড়া শেষ করে রজত একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল—"বদলি চাইছ এখান থেকে?"

"অনেকটা চাপ কমবে না? অবশ্য নিঃস্বার্থ নয়, আমারও ক'মবে। আপাততঃ গোপন রাখব ভেবেছিলাম। যখন টের পেয়েই গেলে, তোমারও একটা সার্টিফিকেট দাও, জুড়ে দিই। বরঞ্চ আর একখানা!"

রজত প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতে বলল—"বদলি চাইলেই তো বদলি

পাচ্ছি না, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আশা—চোপরার কলকাতার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না, সরতে চায়, ওর সঙ্গে মিউচুয়াল হতে পারে। কিন্তু সেও তো একদিনে হওয়ার নয়। তাই মাসখানেকের একটা ছুটির দরখাস্ত করব, শরীরেরই ওজুহাতে ...”

“পুল-কলোনীর সব যেন ভেঙে গেল!”—বাইরের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল রজত।

প্রশান্ত বলল—“পুল-কলোনীর কিছুই তো স্থায়ী নয়।’ তবু পুল-কলোনীকে পেয়ে দু’একটা জিনিস হতে পারত অবশ্য স্থায়ী।” ওরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বলল—“হোল না, কি আর করা যাবে! যাক, কমাবার আর একটা উপায় যা ঠাউরেছি।....”

“হ্যাঁ, সেটা কি?”—উৎসুক দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল রজত।

প্রশান্ত বলল—“অবশ্য সেটা হয়তো চেপে বসতে পারেনি মনের ওপর এখনও, যদিই ইতিমধ্যে কোনোরকমে কানে না গিয়ে থেকে থাকে। বিশাখাকে আমি বিয়ে করছি না...”

“করছ না!!”—চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রজত।

প্রশান্ত বলল—“আশ্চর্য হচ্ছ? আমি আশ্চর্য হচ্ছি এ কথাটা কি করে এক সময় ভাবতে পেরেছিলাম। সেন্টিমেণ্টের কথা বাদই দিলাম—বিশাখাকে কি ভাবে দেখে এসেছি বরাবর, তার সঙ্গে বিবাহ! সে কথা বাদ দিলেও এটা আমি কি ক’রে ভুলে বসেছিলাম যে এইটিই হবে স্বাতির ওপর সবচেয়ে রূঢ় আঘাত।”

একটু চুপ করল প্রশান্ত। রজতও কিছু বলল না, যা সব শুনল বুঝে ওঠা যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। একটু পরে প্রশান্তই আবার বলল—“এই—যা ছিল আমার নিজের হাতে। এর পর যা সেটা তোমার হাতে রজত।”

“আমার হাতে!”

“হ্যাঁ, তুমি স্বাতিকে বিবাহ কোর না।”

“করবই যে এটা সম্ভব মনে করেছিলে কি করে প্রশান্ত?” একটু হাসল রজত, বলল—“যাক্, আমি একটা ঐ রকম পশু, বিলাত

ফেরৎ ডাক্তার, বেশ লোভ দেখানো যেত স্বাতিদেবীকে, কিন্তু লুব্ধ হ'ত বলে বিশ্বাস করো তুমি? এতদিন ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করে তুমি এই বিশ্বাসটাই দাঁড় করালে মনে? তাহলে আমি তো তোমার চেয়ে ঢের সমঝদার—না মেলামেশা করেও—শুধু তোমার মুখে বিশাখার মুখে শুনে, আর একবার পুলের দিকে রাত্রির ট্রিপে দেখে বুঝেছি তিনি কি ধরণের মেয়ে।"

"তাহলে? স্বাতির কি হবে রজত?"

"যাই হোক, এ যা হতে যাচ্ছিল তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না? কি হবে—সে ভাবনা [illegible] আর তোমার-আমার রইল না।"

"আমি আর ভাবতেই পারি না স্বাতির কথা! কী বলছ তুমি রজত!"

[চৌত্রিশ]

রজত গেল না স্বাতিদের বাড়ি।

প্রশান্তর শেষ কথাগুলো শুনে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে একটু বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটা উত্তর দেওয়া হিসাবেই একটু হাসল মুখটা ঘুরিয়ে। এরপরই বলল—"উঠি এখন।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তও এল বেরিয়ে। জীপ না বের করে গেটের দিকেই এগুতে দেখে বলল—"কৈ যাচ্ছ না?"

"আর দরকার কি তেমন? কয়েকটা চাপ তো কমল।"

"একবার যাও রজত। গিয়ে কি করবে কি বলবে বুঝতে পারছি না—তবু একবার...."....

—থামের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বাঁ হাতে থামটা ধরে ডান হাতে তাড়াতাড়ি রুমালটা বের করে চোখে চেপে ধরল প্রশান্ত।

রজত ঘুরে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলল—"এত উতলা হচ্ছ ভাই? বড্ড ডেলিকেট্ ব্যাপার, একটু ভেবে দেখতে দেবে না?"

ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরছিল রজত। ওঠবার আগে প্রশান্তর মুখে সে শুনল—"আমি আর ভাবতেই পারব না স্বাতির কথা?"—চোখে যে ভয় যে নৈরাশ্য দেখল, তার থেকেই নূতন ভাবনার ঢেউ উঠেছে; তারপর অশ্রুজলেও আরও খানিকটা দেখল মনের ভেতরটা, বুঝল কি ক্ষত-বিক্ষতই না হয়ে পড়েছে!

তবু, যেমন এসেছিল তার থেকে মনটা অনেক হালকা হয়েছে, শুধু এই জন্যই যে অনেকগুলো সমস্যা মিটে যাচ্ছে। আরও মিটবে। প্রশান্ত চলে গেলে রজতও চলেই যাবে এখান থেকে। বিশাখাকে প্রশান্তর বিবাহ করার কথাটা রইল না—কি অন্যায়ই যে হোত ওটা, দুজনের ওপরই!—ও-ও প্রশান্তকে জানিয়ে দিল স্বাতিকে বিবাহ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, যেমন স্বাতির সম্ভব নয় রাজি হওয়া।

মন অনেকটা শান্ত রয়েছে বলেই হঠাৎ একটা উপায়ের কথা মনে পড়ে গেল, নিতান্ত সহজ হলেও যা এতদিন পড়েনি। কথাটা একবার প্রশান্তর মনেও উঠেছিল—সবটা লুকিয়ে যেমন চলছিল তেমনি চলতে দেওয়া। ক্ষতি কি?

এত বড় একটা সোজা রাস্তা হয়েছে, অথচ ক্রমাগতই পাক খেয়ে খেয়ে সারা হচ্ছে সবাই। কথাটা মনে হতে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল রজত যে, থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে প্রশান্তকে গিয়ে তখনই বলে। তারপর অবশ্য এগিয়েই চলল বাসার দিকে, মনটাকে সংযত করে নিয়ে। আরও একটু ভেবেই দেখা যাক না।

যতই ভাবতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল সমস্ত সমস্যা মিলে গিয়ে যেন আবার সব কিছু নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। মন্থরপদে বাসায় যেতে যেতে খানিকটা খসড়াও ঠিক করে নিল মনে মনে—কিভাবে কি করতে হবে—সমস্ত ব্যাপারটুকুতে ওর অংশ কতটা থাকবে এবং কিভাবে।

বাড়ি আসতেই পিসিমা বললেন—"তোর একখানা চিঠি আছে রে। এইমাত্র দিয়ে গেল, টেবিলে রেখে দিয়েছি।"

কলকাতার মোহর দেওয়া চিঠি দেখে একটু ত্রস্ত হস্তেই খামটা

ছিঁড়ে ফেলল রজত। বিশাখা গেছে, যদিও বিশাখার হাতের লেখা ঠিকানা নয়। গোড়ার এক-আধটা কথা পড়েই উল্‌টে আগে নামটা দেখে নিল—'সেবিকা উষা।'

উষা লিখেছে—

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমায় আপনি চেনেন, যদিও খুব বেশি দেখেননি। আমি প্রশান্তদাদার ভগ্নী, সেই জোরে আপনারও। এবং সেই দাবীতেই চিঠিখানি লিখতে বসেছি। অবশ্য প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিলুম, কেননা ছোট বনের কিছু ধৃষ্টতা প্রকাশ পাবে। জানিয়ে রাখি, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই লিখছি চিঠিটা, সুতরাং আশা আছে পাবই মার্জনা।

বিশাখা কাল এখানে এসেছে মার সঙ্গে। আমাদের এখানেই উঠেছে, এবং আছেও। ওর মুখে সব শুনলাম। শুনে আনন্দে আত্মহারাই হয়ে পড়ি। তারপর ওর মুখেই শুনলাম স্বাতিদিদির সংক্রান্ত সমস্ত কথা। শুনে অবধি আমার মনটা এমনি হরিষে-বিষাদে ভরে গেছে যে, তখুনি-তখুনি আপনাকে একটা চিঠি লিখতে বসেছি।

দাদা, আমরা অসহায়, যে-ঠাকুরের কাছে বলি দেবেন, তাঁর কাছেই মাথা নীচু করে দেবতা জ্ঞানেই বলি পড়বার জন্যে প্রস্তুত থাকব। এই আমাদের অদৃষ্ট, যুগ যুগ ধরে যেমন দেখে আসছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এক্ষেত্রে একটি বলি দেওয়ার নামে একসঙ্গে দুটি বলি পড়ছে না কি? আমি বিশাখার কথা ভাবছি না। সে আপনার ভগ্নী, আপনি আপনার বন্ধুর চরণে বলি দিতে চাইছেন, তার কিছুই বলবার নেই। হাসি মুখেই সে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু স্বাতিদিদি কি অপরাধ করল? সে আপনার দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে এক ধারে পড়েছিল—শিবতুল্য বাপ, কিছুই জানেন না, বোঝেন না,—ছল ক'রে তার চোখের সামনে এ-সুখের স্বপ্ন তুলে ধরতে গেলেন কেন আপনার বন্ধু, তুলে ধরলেন তো পূর্ণ করলেন না কেন সে স্বপ্ন—পূর্ণ করলেন না তো তারই এক হতভাগিনী বন্ধুকে

তার স্থানে বসিয়ে এভাবে পরিহাস করতে যাচ্ছেন কেন তাকে? এ-পরিহাসের কাঁটা যে তার বুকটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলছে দাদা। যাকে সে দেবতা বলেই জেনেছিল সেই যখন বিরূপ তখন আর কার কাছে দাঁড়াবে সে বিচারের জন্যে? আপনার বন্ধুর পরিহাসটা কি শুরুও করতে হয় উপহার দিয়েই? সেলাইকলের সব ইতিহাসটা নিশ্চয় জানেন আপনি। স্বাতিদিদি এত সত্ত্বেও সেটাকে এখনও চোখের সামনে থেকে সরাতে পারেনি। মেয়েছেলে তো এমনি অসহায়, একজনকে যদি মনে স্থান দিল তো সে এমনি করেই তার আশা ধরে থেকে নিঃশেষ করে চলল নিজেকে। একথা আপনার বন্ধুকে কে বোঝাবে? দাদা, মনের দুঃখে অনেক কথাই লিখে ফেললুম, আবার ছোট বোন ক্ষমা চাইছে। অনেক কথাই বলুলম বটে, কিন্তু তবুও কিছুই বলা হোল না। আপনি মহাপ্রাণ, বুঝে নেবেন। বুঝে নিয়ে একটা বিহিত করতেই হবে আপনাকে। এত বড় সর্বনাশ, যাতে দুইটি নিরীহ হতভাগিনী বলি পড়ছে তা কোন মতেই হতে দেবেন না।

বিশাখা এইখানে রয়েছে। মৃতকল্পই হয়ে রয়েছে। মাকে অবশ্য কিছু বলেনি। তার অদৃষ্টে যা আছে তা তো মেনে নিতেই হবে।

আমি দাদাকে চিঠি দিলুম না। তাঁর যেমন নতুন মতিগতি হয়েছে তাতে দিয়ে যে কোন ফল হবে এমন আশা নেই। শেষে কি করব, কোথায় যাব, কাকে বলব সমস্ত রাত ভেবে ভেবে তোমারই আশ্রয় নিলুম। তুমি যেমন অভিরুচি হয় করবে, রক্ষা কিম্বা বলি।

ছোট বোনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবে।—ইতি সেবিকা উষা।

একবার, দুবার, তিনবার পড়ে গেল রজত। লেখটা বিশাখার। ভাষায় ভঙ্গিতে খুব সুসঙ্গত নয়, তাহলেও উষাকে কিছু কিছু জানে, সে বড় ছেলেমানুষ, এতটা গুছিয়েও লেখা সাধ্য নয় তার। বিশাখা পাশে বসে লিখিয়েছে। আরও একটা কথা স্পষ্ট হল রজতের কাছে; বিশাখা হঠাৎ কেন অমন করে চলে গেল বাড়ি যাওয়ার নাম করে। চিঠির—"কি করব, কোথায় যাব, কাকে বলব"—এ একেবারে

বিশাখার মনের প্রতিচ্ছায়া। লেখায় খুব বাঁধুনি নেই,—তখুনি তখুনি লিখতে বসেছে'র পরে সমস্ত রাত ভেবে ঠিক করেছে—'আপনার' দিয়ে শুরু, 'তোমারই' দিয়ে শেষ করা আছে—এও আছে—কিন্তু মনের আসল কথাটা খুব পরিষ্কার। বিশাখা চায় না এ বিবাহ, আর বিশাখা চায়, আবার স্বাতি-প্রশান্ত একত্র হোক। শুধু ইচ্ছাই নয়, স্বাতিকে জানে বলেই, কি সর্বনাশ তার হতে চলেছে বোঝে বলেই চায়। মূল কথাটায় ভাষা সাধ্যমত জোরালো করবার চেষ্টা করেছে, বঙ্কিমের ভঙ্গি পর্যন্ত খানিক এনে ফেলে। সত্যই তো, বিশাখার মতো স্বাতির এত অন্তরঙ্গ আছেই বা কে? একটু যে ইতস্ততঃ করছিল, সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে মনস্থির করে ফেলল রজত। বারান্দায় পায়চারি করছিল চিঠিটা হাতে করে, সেইভাবেই বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলল—"আমি একটু আসছি পিসিমা, যদি দেরি হয়তো সোজা হাসপাতালেই চলে যাব। কেউ এলে সেখানেই যেতে বোল।"

প্রশান্তর ওখানে যাচ্ছে। চিঠিটা দেখাবে। পথে যেতে যেতে কি ভেবে পকেটে রেখেই দিল চিঠিটা। থাক, দেখাবে না।

প্রশান্ত শুয়েই ছিল বিছানায়, ওকে দেখে বিশেষ করে ওর মুখের উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে উঠে বসল, প্রশ্ন করল—"কি, আবার ফিরে এলে যে?"

"ফিরে এলাম,"—পকেটে চিঠিটার ওপর ডান হাতটা গিয়ে পড়ল, ছেড়ে দিয়ে রজত বলল—"ফিরে এলাম—হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল প্রশান্ত, ভেবে দেখলাম এদিককার কোন কথা যদি না বের করা যায়, যেমন চলছিল তেমনি চলে তো·······"

"ভেবেছিলাম সে কথা আমিও রজত।"

"তারপর"—আগ্রহের সঙ্গে মুখটা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল রজত। বসেনি এখনও। প্রশান্ত বলল—"বোস, দাঁড়িয়ে রয়েছ।·······বড্ড নীচ, স্বার্থপরের মতন কাজ হয় রজত।"

—মুখটা বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। রজতের চোখের দৃষ্টি

হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠল, বলল—"এসব মনের বিলাস ছাড়ো প্রশান্ত। একজনের প্রাণ যাচ্ছে, তুমি ভাবছ তোমার নৈতিক পতনের কথা, একটা কথা গোপন রাখলে—সৎ উদ্দেশ্যে গোপন রাখলে যেন সত্যি মস্ত বড় একটা নৈতিক পতন ঘটল! তা যদি বললে তো আমি এইটেকেই বলব স্বার্থপর। বেশ তো, চুলচেরা যুক্তির দিকেই এসো। নয় কি তাই?"

"বোস। হঠাৎ এমন বিচলিত হয়ে উঠলে কেন বুঝছি না তো!"

"অন্যায় হচ্ছে প্রশান্ত। বিয়ে তোমায় করতেই হবে ওখানে। একথাটা অটল, অনড় রেখে, এখন কিভাবে করবে সেইটুকুই ভাবো। পরামর্শ করি এসো।"

"বোস। তবে তো পরামর্শ।"

"দাঁড়াও, আমি আগে একবার হয়েই আসি……"

"কোথা থেকে?"

"ওদের বাড়ি থেকে। যদি সুযোগ পাই তো কিছু একটা হিণ্ট দিয়ে আসব যে সব শেষ হয়ে যায়নি। অন্ততঃ এই যে ওখানকার সঙ্গে যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেছে—তুমি যাচ্ছ না, বিশাখারও যাওয়া বন্ধ—এর জন্যে কিছু একটা মনগড়া কারণ দেখিয়ে—তাতে যত নৈতিক অধঃপতনই হোক আমার—ওঁদের মনে একটা ভরসা জাগিয়ে আসি। যাই আমি।"

[পঁয়ত্রিশ]

জীপটা বের করে জোরেই হাঁকিয়ে ছিল, তারপর আপনিই কখন গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। চিন্তার আবার মোড় ফিরেছে; প্রশান্তর কাতর মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। ও আপত্তি তোলায় চটেই উঠল রজত, কিন্তু বেচারির দোষটা কি? এতবড় একটা কথা

গোপন করে, এইরকম কলুষিত বিবেক নিয়ে একজনের চিরটা জীবন কাটানো, যে হবে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে আপন—এ কি সম্ভব, না, উচিত? যে-কোন লোকের পক্ষেই; তারপর প্রশান্তর পক্ষে তো বটেই। নীতির কথা ছেড়ে অন্য দিক দিয়ে দেখলেও পরিণামটা ভয়াবহ নয়কি? দীর্ঘ জীবন সামনে পড়ে রয়েছে—যদি কোন রকমে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে ভবিষ্যতে—প্রশান্তর কাছেও তো নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রকাশ হোল—তা'হলে ওদের দাম্পত্য জীবন কি রকম বিষময় হয়ে উঠবে। এই স্বাতির জীবনই কি দুর্বহ হয়ে উঠবে। আজকের চেয়ে কি কম দুর্বহ তা? তার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে প্রশান্তর জীবনও। অথচ আজ সাবধান হয়ে গেলে অন্ততঃ ওর দিকটা সামলে যায়; পুরুষের কর্মময় জীবন, অত দাগ বসাতে পারে না তো। অবিচার করে এসেছে প্রশান্তর ওপর। ওরও যখন অবস্থা—কী করে, কোথায় যায়, কাকে বলে।

সামনে একটা তেমাথা; একটা মেটে রাস্তা বাদিকে চলে গেছে। ঠিক করল জীপটা ঐখানে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরেই যাবে। কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে আগের চেয়েও উত্তেজিত হয়ে উঠল রজতের মনটা।......শুধু স্বাতি আর প্রশান্ত নিয়েই ভাবছে, আর একজনকে ভুলে যাচ্ছে, যে এ-নাট্যের একজন কোনরকমেই কম অংশীদার নয়; লাহিড়ীমশাই-এর কথা। ওঁর দিকটাও তো ভাবতে হয়, ওঁর মনটাও তো জানতে হয়। ওঁর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল আর-একটা উপায়ও যেন থাকতে পারে। কিন্তু সে আর একমাত্র উপায়। আর, শেষ উপায়। বুকটা ধড়ফড় করছে। পাছে আবার দ্বিধা এসে পড়ে, মত বদলে যায়, সেই ভয়ে আগের চেয়েও জোরে ছেড়ে দিল জীপটাকে।

যখন দাঁড় করাল, ছাখে, স্বাতি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। যেন রাস্তার দিকে অষ্টপ্রহর কান খাড়া করে রেখেছিল।

নেমে এগুতে এগুতে রজত প্রশ্ন করল—"লাহিড়ীমশাই আছেন তো?"

"তাঁর তো স্কুল খুলে গেছে অনেকদিন—থাকেন না তো এ-সময় —কেন বলুন তো ?"—মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে স্বাতির ; এই-টুকু বলতেই কয়েকবার ঢোঁক গিলল।

"না, এমনি একটু কাজ ছিল। কখন ফিরবেন ?" —একটা সঙ্কট অবস্থার মধ্যে যেন পড়ে গেছে রজত। দাঁড়িয়েও পড়েছে।

স্বাতি এগিয়ে সিঁড়িতে নেমে দাঁড়িয়েছে, বলল—"একটু পরেই, আজ শনিবার তো। বসবেন ততক্ষণ ?······ আচ্ছা, বিশাখা আসা বন্ধ মানে······মানে বিশাখা আসছে না কেন ?

দ্বিধাগ্রস্থভাবে বাড়িয়েই ছিল পা রজত, যেন আপনিই থেমে গেল পা দুটো !

স্খলিত কণ্ঠে বলল—"বিশা হঠাৎ বাড়ি গেল, প্রশান্তর মা এসেছিলেন, তার সঙ্গে।"

অদ্ভুতভাবে একটু হাসল স্বাতি। তাতে ব্যঙ্গ, বেদনা, অনুযোগ সবই আছে।

বলল—"একটা খবরও তো দিতে হয়। আমার মুশকিল হয়েছে, অনাথকাকা পড়ে গেছে অসুখে। যাক্ ভালো আছে তাহলে ?······ বসবেন না এসে ? বাবা আসছেনই তো এক্ষুনি।"

পা উঠেছিল, আবার টেনে নিল রজত। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কোনরকমে বলল—"না, বিশেষ দরকার—আমি স্কুলেই চলে যাই—ওদিকে একটা কল্‌ও আছে।"

শেষেরটুকু মিথ্যা কথা, আগেরটুকুতে জোর দেওয়ার জন্যই। একটা দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কোনরকমে বেরিয়ে আসা। জীপটা একটু এগিয়ে যেতে একটু অনুশোচনাও হোল একটা কথা মনে পড়ে যেতে—অনাথের অসুখের কথা বলল স্বাতি, অথচ দিব্যি চলে এল রজত। বন্ধু তো বটেই, তার ওপর একজন ডাক্তার। আসলে এত চারিদিকে মনটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে মনে হচ্ছে যে তখনকার কথাটা যেন এইমাত্র কানে গেল। কিন্তু ভালোই হোল। বিব্রত ভাবটা কেটে গিয়ে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসতে টের পেল,

ওর লাহিড়ীমশাই-এর সঙ্গে যা কাজ সেটা এখানে ঠিক হোতও না।

আরও একটু ভালো হোল। শরৎকাল প্রায় এসে গেছে, আকাশ হয়ে উঠেছে খামখেয়ালী। পরিষ্কারই ছিল, লক্ষ্য করেনি, একটা গুরু গুরু ডাক শুনে দেখল পশ্চিমে, ওর পেছন দিকে কখন মেঘ জমা হয়েছিল, মাথার ওপর এগিয়েও এসেছে। তাড়াতাড়ি জীপটা চালিয়ে দিল, হাতঘড়ি উল্‌টে দেখল—লাহিড়ীমশাই হয়তো বেরিয়েও পড়ে থাকতে পারেন।

ও স্কুলের কাছে আসতে আসতেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। গিয়ে ছাখে লাহিড়ীমশাই আর দুজন শিক্ষকের সঙ্গে আফিস থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হোল বেরুতেই গিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে ইতস্ততঃ করছিলেন। ওকে দেখে বললেন—"এই যে আপনিও এসে গেছেন। আমার কপাল জোর আজকে।······দাঁড়ান, আমি তাহলে খানকতক বইও নিয়ে নিই আলমারি থেকে।"

"আমরা তাহলে যাই স্যার।"—বলে শিক্ষক দুজন ছাতা খুলে নেমে গেলেন। এঁদের কিন্তু যাওয়া হোল না। বইগুলো নিয়ে উনি যতক্ষণে বেরিয়েছেন, জোরে বৃষ্টি নামল। হাওয়াটাও হঠাৎ জোর হয়ে উঠল। উনি তবু বেরিয়ে পড়বার কথাই বললেন। রজতই আপত্তি করল, বলল—"হাওয়াটা মুখের ওপরই পড়ছে। ভিজে লাভ কি মিছিমিছি?"

—ও যা করতে এসেছে তাতে এটাও অনুকূলই ওর পক্ষে। লাহিড়ীমশাই প্রশ্ন করলেন—"কোনও কলে এসেছেন তো, দেরি হয়ে যাবে না?"

রজত জানাল—না, দেরি হবে না। ও কলেও আসেনি, ওঁর কাছেই এসেছে।

"আমার কাছে!" এই দুর্যোগ মাথায় করে!"— অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে উঠলেন লাহিড়ীমশাই।

"দুর্যোগটা তো ছিল না। থাকলেও আসতে হোত আমায়। চলুন, আফিসে গিয়ে বসা যাক।

আরম্ভ করবার একটা ভালো খেইও পাওয়া গেল। উনি বসলে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল—"দুর্যোগের কথায় মনে পড়ে গেল। এমনি একটা—এমনি বলি কেন ?—এর চেয়েও অনেক বড় একটা দুর্যোগ যে চারিদিকে ঘনিয়ে উঠেছে আপনার চোখ এ্যাড়ায়নি বোধহয়।"

খুব বড় একটা ভুল করে বসল খুব গুছিয়ে উপযুক্ত ভাষা দিয়ে আরম্ভ করতে গিয়ে। অতিরিক্ত ভীত হয়ে উঠেছেন লাহিড়ীমশাই। বড় বড় চোখ দুটো আরও আয়ত হয়ে গিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গলা গেছে এমন শুকিয়ে যে যেন কথা বের হচ্ছে না; যেন অনেক চেষ্টা করে প্রশ্ন করলেন—"দুর্যোগ ! এর চেয়ে বড় !"

"আপনি কিন্তু বড় উতলা হয়ে পড়লেন একেবারে। একটু······"

"এর চেয়ে বড় দুর্যোগ বলছেন !" —বলেই চললেন লাহিড়ামশাই, রজতের কথাগুলো যেন কানেই যায়নি। —"এর চেয়ে বড় দুর্যোগ—প্রশান্তর কিছু হয়নি তো ! —তার শরীর—অনেকদিন থেকে আসছে না সে—তার চাকরির কিছু—শুনছি বড় বর্ষাটায় পুলের নাকি ক্ষতি হয়েছে—ওদের চাকরি—রেলের—বলে, এক পা রেলে, এক পা জেলে—কি হয়েছে তার ?—কেন আসে না ?

"আমি তার হয়ে এসেছি, ক্ষমা চাইতে।"

"ক্ষমা ! কিসের ক্ষমা ?·······ও। বুঝেছি। শুনেছি অনাথের মুখে বিয়ে করতে চায় না এখানে কিন্তু সে এমন কী একটা দোষ, যে···"

"দোষ বৈকি।"—এ সুযোগটাও বেরিয়ে যেতে দিল না রজত। বলল—"তার দোষ বলে বুঝেছি বলেই তার হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসেছি আমি।"

"—বুঝছি না তো।"—উৎকণ্ঠিত কৌতূহলে চেয়ে রইলেন। রজত বলল—"সে যা করছে তাতে—নিরুপায়। দোষটা গোড়ায়

আসলে ওর নয়, ওর বাবার। প্রশান্ত হচ্ছে আপনার বন্ধু দারুকেশ্বর রায় মশাই-এর ছেলে।”

“কে, দারুকেশ্বরের ছেলে!!”—একেবারে চিৎকার করে উঠলেন।

—ডাক্তার মানুষ, লক্ষ্য করল প্রায় উন্মাদের লক্ষণ দৃষ্টিতে। ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু আর পশ্চাদচারণের উপায় নেই, বলল—“প্রশান্ত। তার নিজের দোষ না হলেও সে খুবই·······”

“কোন্ প্রশান্ত?

“····যার কথা আপনি এক্ষুনি বলছিলেন। পুল-কলোনীর ইন্‌জি-নিয়ার।”

“পুল-কলোনীর ইন্‌জিনিয়ার প্রশান্ত রায়? বলছেন দারুকেশের ছেলে·······কি করে হবে? সেদিন পর্যন্ত এসেছে আমাদের বাড়ি—স্বাতি-মার জন্যে একটা সেলাই-কল পর্যন্ত রেখে গেল···সে কি করে স্যাঙাতের ছেলে হতে পারে?”

সবগুলো আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে টেনে এনে একটা সামঞ্জস্য বের করবার চেষ্টা।

একেবারে উল্ট উৎপত্তি। রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে রজত, ওঁর এ লক্ষণের কথা শুনেছিল প্রশান্তর কাছে। বৎসর খানেক আগেকার কথা, এর মধ্যে বরাবরই সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কেটেছে—পরিচয়ও পেয়েছে একজন শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, সুরুচিসম্পন্ন মানুষ বলেই, তাই কথাটা মনে ছিল না একেবারে, নয়তো হঠাৎ মস্তিষ্কের এমন একটা চাপ দিতে সাহস করত না। ভয় পেয়ে গেছে; সামলাবে কি করে ভেবে পাচ্ছে না। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে উপায় হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ বুদ্ধিটা যুগিয়ে গেলে ওঁর প্রশ্নটা ধরেই। একেবারে উল্‌টে গেল রজত, বলল—“তাহলে বোধহয়,—মানে, নিশ্চয় ভুলই হয়েছে আমার।”

কথাটা কানে গেল বলে মনে হোল না। সোজা বসেছিলেন, হেঁট হয়ে টেবিলে কনুই দিয়ে নিজের সামনের চুলগুলো খামচে ধরলেন।

একটু পরেই মুখটা তুলে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন—"কী দুর্যোগ! এই-রকম চলবে নাকি?"

তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল রজত, কতকটা মনের চঞ্চলতাতেও। বেশ ভালো করে আকাশটা দেখে নিয়ে ফিরে এসে বলল—"নাঃ এক্ষুণি পাশ অফ্ করবে। শরতের মেঘ তো, গোড়া কেটেই গেছে।"

আপনি আমার স্যাঙাতকে জানতেন?"—ওর কথায় কান না দিয়ে প্রশ্নটা করলেন লাহিড়ীমশাই। রজত আর-একটু বুদ্ধি খাটাল—"দ্বারিকানাথ, আমি যাঁর কথা বলছি।"

"দ্বারিকানাথ?"—মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বোঝবার চেষ্টা করছেন। ধীরে ধীরে বললেন—"দয়ে বয়ে আকার রয়ে হ্রস্ব-ই··· ·"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের নামের সঙ্গে প্রভেদটা বের করবার চেষ্টা করছেন। একটু যেন কাজ হয়েছে; একটা সন্দেহ; দুটো নামে গোলমাল। "আমি শুনলাম যেন······" মুখের দিকে চেয়ে কথাটা বলতে গিয়ে আবার চুপ খামচে সেইভাবে বসে রইলেন।

এরপর কথা বেরুল একেবারে বাড়িতে গিয়ে।

দমকা ঝড়-বৃষ্টি, আকাশটা মিনিট পনেরো পরেই একরকম পরিষ্কার হয়ে গেল। স্কুলের চাকরটা ওদিক'কার সব ঘর বন্ধ করে এসে ওঁকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে ভীত হয়ে এগিয়ে আসছিল, তাকে ইংগিতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, চুপ করে বসেই রইল রজত। তারপর বৃষ্টি ধরে গেলে ওঁকে ডেকে নিয়ে জীপে গিয়ে উঠল। অনেক-কিছুই ভয় করে নিজের পাশেই বসিয়ে রাখল ওঁকে। পথ পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে, ধীরে ধীরে চালিয়ে আসতে দেরিও হোল বেশ। কোন কথা নেই আর। রজতও আর ঢুকতে গেল না। এরপর একেবারে বাড়ির বারান্দায় উঠে উনি হাঁক দিলেন—"স্বাতি-মা, শোন!!"

স্বরটা একটু উঁচু পর্দায়, বিকৃতও একটু। স্বাতি উৎকণ্ঠিত ছিল, —কী দরকারি কথা কইতে গেছে রজত?—একটু হন্তদন্ত হয়েই

উঠানের দিক থেকে বেরিয়ে এসে, ওঁর চেহারা দেখে চেঁচিয়েই উঠল —"বাবা ! !"

"প্রশান্ত হচ্ছে স্যাঙাতের ছেলে—দারুকেশের ! !"—বলতে বলতেই টলে গিয়ে চৌকির ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

[ছত্রিশ]

"বাবা গো ! ! কি হোল ! !—ব'লে শেষ জেনেই স্বাতি গায়ের ওপরই আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল, রজত সতর্কই ছিল, দু-হাতে ওর বাহুদুটো ধরে ফেলল পাশ থেকে, বলল—"স্থির হোন, মাথাটা শুধু একটু ঘুরে গেছে, ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুনি।"

অনাথ টলতে টলতেই এসে দরজা ধরে দাঁড়াল। মুখটা একেবারে থমথমে। দৃষ্টি উগ্র, রজতকে উদ্দেশ্য করে বলল—"বেশ তো ছেল এনারা, আবার কেন আপনারা……"

"……ও অনাথ-কাকা ! যাও তুমি কিছু হয়নি, শুয়ে থাকোগে।"—ওকে সামলাতেই স্বাতি নিজেও খানিকটা সামলে গেল। হাওয়া করে মুখে জলের ঝাপটা দিতে চৈতন্য ফিরে এল লাহিড়ীমশাই-এর।

সন্ধ্যা উতরে গেছে, তখনও রজত এখানেই। উঠানে চেয়ারে বসে বিস্মিত হয়ে দেখে যাচ্ছে সব ; ভাবছে।

শক্ত মেয়ে স্বাতি। চাপা, সংযত ; এমনটা আর দেখেনি কোথাও। জীপ থেকে ওষুধের ব্যাগটা আনিয়ে একটা ইন্‌জেকশন দিয়েছে লাহিড়ীমশাইকে, খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পরই। উনি এখন ঘুমুচ্ছেন। যেন কিছু হয়নি বাড়িতে। ঘুরে ঘুরে স্বাতি সংসারের সমস্ত পাট করে যাচ্ছে একা। ওরই মাঝে কয়েকবার অনাথকে ধমক দিয়ে শুইয়ে রাখাও আছে। তাকে ওষুধ দিয়েছে রজত। অনুযোগও করছে রজতের কাছে—সাক্ষী মানছে—"ছটফট করে ঘুরে বেড়ালে

ওষুধে কাজ হবে? বলুন তো?" সবচেয়ে আশ্চর্য—যে কথা মুখে করে লাহিড়ীমশাই প্রবেশ করলেন, যা নিয়ে এত কাণ্ড, সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করল না। অথচ কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে গল্পও করেছে —এ ইনজেকশনে কতক্ষণ ঘুমুবেন, আর লাগবে কিনা; জিজ্ঞেস করেছে বিশাখার কথা। তাও, কবে ফিরবে সে। কেন গেছে, মা কেন এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু নয়। অনুরোধের মধ্যে করেছে খানিকটা রাত পর্যন্ত থেকে যেতে ওঁকে।.......থেকে যাবে রজত। বলেছে গিয়ে জীপ নিয়ে গোপেশ্বরকে এখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। কোনই দরকার নেই, তবুও সতর্ক থাকা, কিছু হলেই সে জীপে করে নিয়ে আসবে রজতকে। তা' ভিন্ন আজ একরকম একাই স্বাতি, একটা লোক থাকাও প্রয়োজন। খুব শক্ত, সংযত। বুদ্ধিমতী তো বটেই। বুঝে নিয়েছে এইজন্যেই প্রশান্ত আসা বন্ধ করেছে। একটা স্বাভাবিক কৌতূহল থাকলেও সেটাকে দমন করেই আছে।

কিন্তু এ সংযম কি ভালো? মনের ওপর একটা অসম্ভব চাপই যাচ্ছে তো। এই বাইরের ঔদাসীন্যে ভেতরে কতটা আলোড়ন জাগিয়েছে, বুঝতে তো পারা যাচ্ছে না। এর প্রতিক্রিয়াও তো এই ধরনেরই, অনেক সময় বরং আরও স্থায়ী, আরও বিপদজ্জনক।

রাতও হয়ে আসছে। রজত একবার উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে এল লাহিড়ীমশাইকে। দরকার ছিল না তেমন, কতকটা স্বাতির সান্ত্বনার জন্যই। ঘুরে এসে হাতঘড়িটা দেখে বলল—"রাত আটটা হয়ে গেল। ভালোই আছেন। আমি বোধহয় এবার যেতে পারি। একটা অনুরোধ—স্বাতি দেবী, রান্নার হাঙ্গামা করতে যাবেন না। ওখান থেকেই পাঠিয়ে দোব। গোপেশ্বরকে অবশ্য আগেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, গিয়েই। অনাথ আজ বার্লি খাক; ওখান থেকেই আসবে। আর একটা কথা।"

"কি বলুন।"

রজত একবার ঘরের দিকে চাইল। বলল—"ভালো হয় যদি বাগানেই চলেন একটু।"

"অনাথ-কাকা ?·······বেশ চলুন।"—মোড়াটা তুলে নিল হাতে। রজতও বেতের চেয়ারটা তুলে নিল। বাগানে গিয়ে বসল দুজনে। রজত প্রশ্ন করল—"একটা কথা কৈ আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন না।"

"কি কথা ?"—বুঝেছে বলেই নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন করল স্বাতি।

"যা নিয়ে একটা ব্যাপার হোল।······প্রশান্ত যে আপনার বাবার বন্ধুর ছেলে—যাঁর জন্যে শুনি আপনারা সর্বস্বান্ত হয়েছেন।"

"উনি জানতেন এ কথাটা বরাবর ?"—বেশ একটু চুপ করে থাকার পর প্রশ্নটা করল স্বাতি।

রজত বলল—"একেবারেই নয়। হঠাৎ এই ক'দিন আগে টের পেল।" তারপর কবে কি ভাবে টের পেল, বই-এর পাতা খুলতে গিয়ে, তারপর থেকেই কি অবস্থা যাচ্ছে প্রশান্তর—সেলাই-কল ছেড়ে চলে যাওয়া—কলকাতায় গিয়ে খোঁজ নেওয়া—সব এক এক করে বলে গেল, যতটা জানে; শুধু স্বাতির সঙ্গে নিজের বিবাহের কথাটা বাদ দিল।······মুখ নত করে শুনে যাচ্ছে স্বাতি, দরদর করে জল পড়ে যাচ্ছে চোখ দিয়ে, মুছলে মানছে না বলে মোছা ছেড়ে দিয়েছে।

শেষ হলে একটা কিছু মন্তব্যের সময় দিয়ে রজত প্রশ্ন করল—"কৈ, কিছু বললেন না তো।"

অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে ধরল স্বাতি, প্রশ্ন করল—"কি বলব ?"

"শত্রুর ছেলে তো আপনাদের।"

"আর-একটা দিকও তো আছে। তিনি কত বড় তাই তো স্বীকার করলেন—বলে পাঠাতে পারলেন······"

তারপরেই দু'হাতে মুখটা ঢেকে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারই ফাঁকে ফাঁকে বলে চলল—"কিন্তু তবুও এ কি করলেন ?—আমাদের সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন সেই তো যথেষ্ট—কেন জানাতে গেলেন বাবাকে ? আমাকে যে তাঁকেও হারাতে হবে এবার—সবহারা হয়ে আমি এখন কোথায় দাঁড়াই বলুন—একি করলেন আপনারা ?—আমার কি হবে ?······

[সাঁইত্রিশ]

পরদিন, সমস্ত দিনটাই নিঝুম হয়ে কাটল লাহিড়ীমশাইয়ের। বেশ গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারছেন না, বা বলতে পারছেন না। বিশেষ ক'রে স্মৃতির দিকটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে। ছাড়া-ছাড়া এক-আধটা কথা বলেন, মনে করবার চেষ্টা করেন, তারপর হার মেনে ছেড়ে দেন। বেশ বেলা পর্যন্তই পড়ে রইলেন। উঠে অনেক পরে আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কেটে এলে বললেন—

"কাল প্রশান্তর বন্ধু রজত এসেছিল—কী বলতে ভুলে গেলাম—স্কুলের ইনস্‌পেকটার আসছে সেই ভাবনায় এমন মাথাটা হয়ে রয়েছে! তোমায় কিছু বলে গেছে না?"

সমস্ত চৈতন্যটা ওঁর দিকে জড়ো করে রেখেছে স্বাতি, সামলে যাচ্ছে, বলল—"বললেন না? বললেন—ঐ সব ভেবে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন—একেবারে কোন ভাবনার দিকেই যেন না যান দুদিন।···স্কুলের ইনস্‌পেকটার আসছে—এ আর কী এমন বড় কথা বাবা?"

খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঘুমুলেন, উঠলেন যখন, বিকেল গড়িয়ে গিয়ে বেশ রোদ পড়ে এসেছে। তখন এক আধটা যা প্রশ্ন করলেন, কালকের ঘটনার অনেকটা কাছাকাছি। একবার বললেন—প্রশান্ত অনেকদিনই যেন আসেনি। কোন বিপদ-আপদ ঘটল কিনা কে জানে।"

স্বাতি অবহেলা ভরে একটু হেসেই বলল—"কী যে বলছ বাবা! বিপদ-আপদ হ'লে টের পাওয়া যেত না? এই তো পুল-কলোনী, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়। মিছিমিছি ওসব ভেবো না। বরং তোমাদের ইনস্‌পেকশনের কথা একটু ভাবো, সে তবু একরকম ভালো। স্কুলের কাগজপত্রগুলো বের করে দোব? তাও না হয় থাকই—ডাক্তারবাবু মানা করে গেছেন যখন।"

—নিজেই ব'কে যায় বেশি, মনটা টেনে রাখবার জন্যে।

একবার বললেন—"জান মা, প্রশান্তর বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ—কাল ডাক্তারবাবু বলছিলেন।"

বুকটা ধক্ করে উঠল স্বাতির। অমানুষিক চেষ্টায় সহজভাব বজায় রেখে বলল—"শ্রীকৃষ্ণের নাম।"

একটু হেসে বলল—"শুনলেই আমার কীর্তনের মাথুরের কথা মনে পড়ে যায় বাবা—বিশেষ করে যেখানটা দূতীরা গিয়ে ওঁকে গঞ্জনা দিচ্ছে। দ্বারকারও তো রাজা। সত্যি কথা বলতে কি বাবা—কৃষ্ণলীলার মধ্যে ঐখেনটা বড় ভালো লাগে—রাজা হয়ে বৃন্দাবনের সব কথা ভুলেছ—বাল্যসখা, সুবল, সুদাম, মা-যশোদা যমুনার তীর—এখন শোন মিষ্টি মিষ্টি—বড় শক্ত ঠাঁই, ওদের কাছে জারিজুরি খাটবে না কোন রকম—তা সে যত বড়ই রাজা হও না কেন।" হাসি ফুটল লাহিড়ীমশাইএর মুখেও। ভাগবত থেকে একটা প্রাসঙ্গিক শ্লোকও উধৃত করলেন। সামলে যাচ্ছে এই ক'রে ক'রে।

কিন্তু হামেসার জন্যে সামলাবার জিনিস তো নয়। বড় অসহায় বোধ হচ্ছে—কী হবে।

এক এক সময় মনের অস্থিরতায় এতদূর পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে, ইচ্ছা করছে—অনাথকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে নিক পুল-কলোনী থেকে ওদের একজনকে। পূর্বেকার সব কথা ভুলে একবার এ বিপদে পাশে এসে দাঁড়াক। একটু সামলে দিক, তারপর যেমন চলছে, চলবে। অনেক কষ্টে সংযত করে রেখেছে নিজেকে।

দুর্বল হয়ে পড়েছে এটা জেনেও যে, ওদের এ-অবস্থায় আসা, সম্ভব নয়। নিরাপদ নয় বলেই সম্ভব নয়। সে-কথা কাল বলেই গিয়েছিল রজত। ও-ও এইজন্যে আজ নিজে আসেনি, ওকে দেখলেই সব মনে পড়ে যাবে আবার। প্রশান্তকে দেখলে তো কথাই নেই। কথাপ্রসঙ্গে কাল রজত একথাও বলেছিল যে, প্রশান্তকে এ সম্বন্ধে কিছু বলা চলবে না ওর। বলেছিল—সেও ওদিকে সসোমরে হয়ে রয়েছে, মিথ্যা বলে সামলাতে হবে তাকে। নয়তো ছুটে এসে একটা অনর্থই বাধাবে।

এদিকটা সামলে দিয়ে অনাথের কাছে গিয়ে চাপা গলায় পরামর্শ করছে, চোখের জল ফেলছে। অনাথ একটু যে ভালো আছে সেই সুযোগে সামনের বাগানে গিয়ে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ওলটাচ্ছে। এক-একবার রাগে গোঁফ জোড়াটা উঠছে ফুলে, এক-একবার দুশ্চিন্তায় ঠোঁটের সঙ্গে একেবারে যাচ্ছে মিশে।

এদিকে থাকার উদ্দেশ্য বোধহয় ওদের পথ আগলানো, প্রশান্ত, রজত যেই যাক।

এই করে সমস্ত দিনটা গেল একরকম ক'রে কেটে। সন্ধ্যা হয়ে যেতে আলো জ্বেলে স্বাতি লাহিড়ীমশাইকে শুইয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসল। কেউ কাউকে বলেনি, তবু ওর মনের মগ্ন-চৈতন্যেও যেন ঐ রকম একটা আশা রয়েছে—যদি ওদের কেউ এই রাস্তায় যায়। মুখোমুখি হয়ে বসেছিল অনাথের সঙ্গে, খুব দূরে গুড় গুড় করে একটা আওয়াজ শুনে দু'জনেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। অনাথ বলল—"মোটর নাকি ?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বাতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"মেঘ নয় তো অনাথকাকা ?"

—আতঙ্কে মুখটা শুকিয়ে গেছে। বলল—"চলো তো আকাশের অবস্থাটা একবার দেখি—কাল একবার যখন আরম্ভ হয়েছে—এই অবস্থায় যদি আবার—"

সামনেটা গাছপালায় আকাশ ঢাকা। ওরা একেবারে রাস্তার ধারে চলে গেল। মাথার ওপরটায় তারা জ্বলছে, তবে খুব দূরে আর একটা গুরু গুরু ডাক শুনে ওরা পশ্চিম আকাশের দিকে ঘুরে চেয়েছে, বারান্দা থেকে লাহিড়ীমশাইএর বিকৃত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"স্বাতি মা—একটা কথা শুনেছ !..."—ওরা শুনতে শুনতেই ছুটল—"প্রশান্ত স্যাণ্ডাতের ছেলে ! —আমার স্যাণ্ডাত গো—দারুকেশ !!..."

—বারান্দার খুঁটি ধরে একটু একটু দুলছেন, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। "ও বাবা, তুমি উঠে এলে কেন !!—ব'লে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে ধরে ফেলে বিছানায় শুইয়ে দিল স্বাতি। অনাথও একটু

ধমক দিয়েই উঠল—"বলছে সবাই কাহিল শরীর—তা কারুর কথা তা শুনবেনি!"

ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। আর কিন্তু সামলানো গেল না। অনাথের কথাতেই ঠেলে উঠলেন লাহিড়ীমশাই, চোখ দুটো পাকিয়ে বললেন—"তুই কী জানিস—কী জানিস তুই যে মুড়ুলি করতে এসেছিস? স্যাঙাতের ছেলে—মনে আছে কি রকম দুর্যোগের মধ্যে যুত বুঝে বাড়ি ঢুকে আরম্ভ করেছে আমার সর্বনাশ—একটু একটু করে মাথা গলিয়ে ছুঁচ সে হয়ে উঠেছে ফাল—ঠিক ওর বাপের মতন—মিলিয়ে দেখ হতভাগা, ঠিক ওর বাপের পথ ধরেছে কিনা—যাওয়া-আসা, মিষ্টিকথা, আত্মীয়তা—দেখেছিস্ তো ওর বাপকে, না, আজ এসেছিস?……"

এক রাশ বকে গিয়ে, নিজের উত্তেজনাতেই ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়লেন বিছানায়। চোখের ইশারাতে অনাথকে সরে যেতে বলে হাতটা একটু চেপেই আস্তে আস্তে মাথার ওপর বুলিয়ে যেতে লাগল স্বাতি। স্থির হয়ে পড়ে রইলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আবার তেড়ে উঠে ঐ রকম—পুরানো কথা টেনে এনে প্রশান্তর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। কাল শুনে পর্যন্ত বাইরের স্তব্ধতার অন্তরালে মনটা ছুটাছুটি করে জমাই করছিল তো সব!

এর সঙ্গে, রাত্রি একটু এগুতে আবার দুর্যোগ নামল। কালকের মত অল্প সময় নিয়ে নয়। কালকেরটা ছিল যেন এক ঝোঁক নূতন ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির পূর্বাভাস—ঋতুর শেষ পর্যায়। আজ দিনের বেলাও ছোট-খাট দু'-তিনটা পশলা হয়ে গেছে, তারপর এই। গতিক দেখে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অনাথকে পুল-কলোনীতে পাঠাতেই যাচ্ছিল স্বাতি, একেবারে যেন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল মাথার ওপর—ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, অশনি। অনাথ তবুও লাঠি নিয়ে বেরুবে—ও-ও কিরকম হয়ে গেছে, স্বাতি পা দুটো জাপটে ধরে তাকে নিরস্ত করল, বলল—"ও অনাথ-কাকা, তোমাকেও হারালে আমার কি দশা হবে? এখনও দেহে অসুখ তোমার!"

বাইরে প্রলয়, ভেতরে প্রলয়, স্বাতিও বুঝি আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারছে না। মনে হচ্ছে ছুটে পালাই, মিশে যাই এই দুর্যোগের সঙ্গে। ...রজত কয়েকটা ওষুধ রেখে গিয়েছিল কাল, আজ দুপুরেও গোপেশ্বর এসে কয়েকটা রেখে গেছে। একটা খাওয়াবার জন্যে চেষ্টা করতে আরও উগ্র হয়ে উঠলেন লাহিড়ীমশাই। হাতে নিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে।

"আমায় বিষ খাওয়াবে এবার—স্যাণ্ডাতের ছেলের বন্ধু—ও আমায় বিষ খাওয়াবে—দাঁড়া, বুঝেছি, চাকরি নয়—ও-ও একটা বিষ হয়তো—আমি নেব না, আমি রাখব না—দাঁড়া......"

বাক্স খুলে সমস্ত কাগজপত্র বের করলেন। ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে যেন স্বাতি। হাতে মুড়ে বাইরে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন —"ও বাবা! স্কুল কি করেছে?" বলে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থেমে গেলেন। ওর হাতেই আস্তে আস্তে তুলে দিয়ে বললেন— "ঠিক তো, স্কুল কি করেছে?......একখানা কাগজ দে তো আমায় মা।"

স্বাতি এনেই দিল। সেইখানে বসেই খসখস করে একটা ইস্তিফা লিখে ওর হাতেই তুলে দিয়ে বললেন—"চুকে গেল স্যাণ্ডাতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ। ছেড়ে দিলাম ওর ছেলের এই চাকরির-দান। কাল পাঠিয়ে দিবি। দিবি তো, তিন সত্যি গাল্। আমার মেয়ে!"

হাঁক দিলেন—"অনাথ! কোথায় গিয়ে বসে রইলি হারামজাদা।"

অনাথ এসে দাঁড়াল।

"তোল্।" সেলাই-কলটা দেখিয়ে বললেন—"একেবারে পুকুরের মধ্যে......আমাদের পুকুরে নয়।...না, না! ফিরিয়ে দিয়ে আসবি কাল—আমি কবে অন্যায় করেছি, আমি কবে প্রতিশোধ নিয়েছি?......উঃ, আর পারছি না! একটু জল দে তো মা স্বাতি।"

[আটত্রিশ]

স্বাতি যতক্ষণ জেগে রইল দুর্যোগটা লেগেই ছিল। লাহিড়ীমশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জলের সঙ্গে ওষুধটা গুলে খাইয়ে দিয়েছিল স্বাতি। উনি যখন জেগে উঠলেন, ভোর হয়েছে, আকাশও পরিষ্কার। যেন কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন সম্পূর্ণ এক অন্য লোকে। একটা অভঙ্গ শান্তি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছে বাইরে থেকে। অনেক পরে একদিন এই রাতের আলোচনা প্রসঙ্গে রজত বলেছিল—"ওটা দরকার ছিল, সেই উগ্র বিতৃষ্ণা, সেই কাজে ইস্তফা দেওয়া, সেই সেলাই-কল প্রত্যাখ্যান—মনের গ্লানি আর আক্রোশের স্রোতটা বয়ে যাওয়া দরকার ছিল একটা তোড়ের সঙ্গেই, ওটুকু না হ'লে কী যে হোত কিছু বলা যায় না।" তোড়েই ভেসে গেছে সব।

তবু, কিছু না থাকলেও স্মৃতি তো থাকেই। সেইটেই আসছিল ঘুরে—দুর্যোগের সঙ্গে সর্বনাশা বন্ধুত্বের স্মৃতি, কবেকার সেই প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে। এই সময় পাশ ফিরতে গিয়ে স্বাতির ওপর দৃষ্টি পড়ে গেল, জড়োসড়ো হয়ে পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে বসলেন লাহিড়ীমশাই।

জানলা গলে ভোরের এক ফালি কাঁচা রোদ স্বাতির মুখের ওপর এসে পড়ে গালের কয়েকটা শুষ্ক অশ্রুরেখাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

বুকের ভেতরটা অসহ্য রকম মোচড় দিয়ে উঠল লাহিড়ীমশাইএর, মনে পড়ে না, এমনটা আর কখনও হয়েছে। উনি এক হিসাবে বইএর সাহচর্যে চিরকাল দুঃখ-কষ্টকে ভুলেই আছেন বলা যায়। এক-একবার ক্ষণিক নিরাশা, ক্ষণিক বিদ্বেষের কথা বাদ দিলে। আজ যেন ওঁর এই প্রথম চৈতন্য হোল, দুঃখকে ভোলার সঙ্গে উনি স্বাতিকেও ছিলেন ভুলে।.......স্বাতি ওঁর কন্যা-শিষ্যা। এতদিন শুধু শিষ্যা ওঁর সঙ্গিনী হয়ে ঘুরেছে ওঁর জ্ঞানচর্চার কল্পলোকে। আজ এই প্রথম ওঁর কন্যা

হয়ে যেন দেখা দিল। চোখের জলে। ও-র চোখের জল এর আগে, কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। ওঁকে আগলাতে ওঁর চোখের জল নিবারণ করতেই ওর নিজের চোখের জল আর বেরুবার অবসর পায়নি।

আজ যেন এ-চৈতন্যটাও এই প্রথম হোল যে, ওঁর কন্যা মাতৃ-হারা; নিজে মায়ের রূপ ধরে, এ-রূপটাও লুকিয়ে রেখেছিল তাঁর কাছ থেকে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন লাহিড়ীমশাই ওর দিকে। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে ওঠাতে যাচ্ছিলেন, টেনে নিলেন হাতটা। ঘুমুক; ভুলে থাকুক যতক্ষণ পারে।

এই ভুলে থাকার কথা থেকে মনটা হঠাৎ একটা নূতন পথে ছুটল। একটা মস্তবড় আবিষ্কার! ভুলে থাকতে হবে! কলকাতা পর্যন্ত যা জীবন সেটাকে ভুলেই না এখানে এসে একটা শান্তি-নীড় রচনা করতে পেরেছিলেন। এখানেও যা ঘটল সেটাকে ভুলবেন দুজনে, একেবারে মুছে ফেলবেন মন থেকে। আবার অন্য কোথাও গিয়ে ওঠা; নূতন করে নীড় রচনা। মনে পড়ে গেল, কালকে স্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। স্কুল ছেড়ে দেওয়া এখানকার বদ্ধ ঘরের দরজা খুলে ফেলা। আবার বেরুতে হবে; দূরে গিয়ে, ভুলে গিয়ে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে স্বাতিকে।

এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন যে ভুলতেই যাচ্ছিলেন আবার ইস্তফার চিঠিটার জন্যে। এই সময় ঘুমের ঘোরেই একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে স্বাতির চোখ বেয়ে দু'বিন্দু জল গড়িয়ে পড়তে চিন্তার স্রোতটা আবার ঘুরে গেল। নিশ্চয় কোনও একটা কান্নার স্বপ্ন দেখছে স্বাতি।

ওর জীবনের একটার পর একটা বঞ্চনা যেন ভিড় করে আসতে লাগল মনে; সব বঞ্চনার পরিণাম হিসাবেই শেষতম বঞ্চনা, মাকে হারানো।·· ···কিন্তু এইটেই কি শেষতম, নারী হিসাবে যা একেবারে চরম বঞ্চনা? স্ফুটনোন্মুখ জীবনের যা চরম নৈরাশ্য তারই সামনে উপস্থিত হয়নি কি তাঁর অভাগিনী কন্যা?

ওঁর বিদ্বেষটা কি মেয়ের মনে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব? যে মেয়ে

ভালবাসল? ভুরি ভুরি কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত তো খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও।

আর, যদি হয়েই থাকে সঞ্চারিত, সে-বিদ্বেষ ওর পক্ষে যে আরও কতগুণ যন্ত্রণার—তা কি কল্পনা করতে পারেন? দুটো বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বে ও যে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।······চিন্তাটা এবার একেবার প্রশান্তর ওপর গিয়ে পড়ল। তার ওপরও এত বিদ্বেষের কারণই বা কি ওঁর?

এই প্রশ্নটা নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। উঠানে; শেষে আরও ভালো লাগছে বলে, বাগানে। আজ বিরাট সমারোহ বাইরে। একটা দিন যেন একটা দুর্যোগের যুগকেই পেছনে করে নূতন রূপে বেরিয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন আবার ফিরে এলেন ঘরে তখন ঐ প্রশ্নটাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা অন্য আকার নিয়েছে—বন্ধু দারুকেশেরই কথা ধরা যাক্, তার ওপরই বা আর বিদ্বেষের অবসর কোথায়? সে যা মূল্য নিল তার পরিবর্তে যা অমূল্য তাই কি রেখে যায়নি তাঁর জন্যে? লাহিড়ীমশাই এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তুললেন কন্যাকে।

অনাথ ঠিক করেছে আজ একবার যাবেই রেল-কলোনীতে; শুধু গিয়ে কি করবে সেটা এখন পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি। ক'দিন বেরোয়নি ব'লে লাঠিটার দিকে চাওয়াও হয়নি। বেশ ভালো করে তেল লাগিয়ে মুছে-মুছে আমরুলের পাতা দিয়ে পেতলগুলো পরিষ্কার করছিল বাইরের বারান্দায় ব'সে, লাহিড়ীমশাই একটু যেন কুণ্ঠিত স্বরেই বললেন—"শুনছিস্ রে? প্রশান্তর বন্ধু—মানে তোদের ডাক্তারবাবু আর কি—সে বলছিল, কী যেন সব করেছে তার জন্যে তাদের নাকি মাফ করতে হবে, তাই····"

"তা, তানাদের অপরাধটা কি?" বাড়ির দিকে পেছন ফিরেই বসেছিল, গোঁফজোড়া ফুলিয়ে, একবার দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল অনাথ।

পেতল মাজতে মাজতেই বলল—"একজন হোল ছাওয়াল রায়মশাই-এর, তা' তিনি তো আর তপিস্যে করে হতে যায়নি ছাওয়াল। একজন হোল বন্ধু ; বেচারিই বলতে হবে......"

"আমিও তো সেই কথাই বলি"—যেন একটু ভরসা পেলেন লাহিড়ীমশাই, বললেন—"তা কথাটা তো বলতে হবে তাকে। তাই বলছিলাম একবার না হয় ডেকে নিয়ে আসবি গিয়ে?"

"এ আর শক্ত কথা কি? কও তো হুজনারেই ঘেরে নে'সি। তাঁনারা মাফ চায় তো পাবে'খনি—এই বা কোন্ বেশি কথা লাহিড়ী-বাড়ির পক্ষে? ক্ষ্যামা চেয়ে কে কবে না পেয়েছে ক্ষ্যামা?"

—হুমকিও নয়, অসম্মানও নয়। একটা অভ্যাস, কথা বলার একটা রীতি—যে নাকি চারপুরুষ ধরে জমিদারের সঙ্গে ঘর করছে। পেতলগুলা আরও দ্রুত পরিষ্কার করতে লেগে গেল।